মধ্যযুগের কবি ও কাব্য

প্রথম খণ্ড

বৈষ্ণব কবি ও কাব্য

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু



জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

১লা বৈশাখ, ১৩৬২

মূল্য ছয় টাকা



তাপসী প্রেস, ৩০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে
শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৺পিতৃদেবের পুণ্য স্মৃতির
উদ্দেশে

ভূমিকা

'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বৈষ্ণব কবি ও কাব্য প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় খণ্ডে মধ্যযুগের অপরাপর শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি ও তাঁহাদের কাব্যের আলোচনা থাকিবে।

আমার উদ্দেশ্য কাব্য-সমালোচনা—সাহিত্যের ইতিহাস রচনা নয়। সে-কারণে সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাধান্য পাইয়াছেন এমন অনেক কবি আমার আলোচনার বাহিরে আছেন। তথাপি আলোচনাযোগ্য দু'একজন কবি হয়ত বাদ পড়িয়াছেন। ব্যক্তিগত রসবুদ্ধি সে জন্য দায়ী। কিন্তু কোন রসবুদ্ধিই যাঁহাকে অস্বীকার করিতে পারে না, সেই শ্রেষ্ঠ কবি পদাবলীর চণ্ডীদাসের নামে পৃথক প্রবন্ধ না থাকা বিস্ময়কর। তাহার কারণ আছে। চণ্ডীদাস কেবল একজন বিশিষ্ট কবি নহেন, তিনি একই সঙ্গে যেন সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবমণ্ডল। তাঁহার কথা সর্ব্বত্র এত বেশী বলিতে হইয়াছে যে, পৃথক প্রবন্ধ লিখিবার প্রয়োজন অনুভব করি নাই। এসব সত্ত্বেও কাজটা সঙ্গত হইয়াছে কি না সে বিষয়ে পাঠকদের সঙ্গে লেখকেরও সংশয় রহিয়া গেল।

কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের—আমার অধ্যাপকদেরও—মতের প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে। নির্ব্বিচার মতানুগত্যকে আমি ভক্তির নিদর্শন মনে করি না।

বর্ত্তমান গ্রন্থরচনা প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথম স্মরণীয় আমার পিতৃপ্রতিম পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী। মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ 'শ্রদ্ধা' তাঁহারই নিকট লাভ করিয়াছি। ঋণগ্রহণের ছাত্রকৃত্যে আমার চেষ্টার অভাব ঘটে নাই, এবং ঋণশোধের অসাধ্য প্রয়াস বুদ্ধিমানের মত ত্যাগ করিয়াছি। অন্যান্য বহুজনের নিকটও নানাভাবে উপকৃত হইয়াছি ; তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—অধ্যাপক শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী, সাহিত্যিক শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীবিভূতি চৌধুরী,

অধ্যাপক শ্রীক্ষুদিরাম দাশ, অধ্যাপক শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ ও শ্রীরমেন্দ্রনাথ মিত্র। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাসের অকুণ্ঠ উৎসাহে এই পুস্তক প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে।

বলরামদাস ও রায়শেখর ছাড়া অন্য প্রবন্ধগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে লেখা। তাই কিছু কিছু পুনরুক্তি থাকিতে পারে। অন্যান্য ত্রুটিও আছে, তাহার মধ্যে দু'একটি বিভ্রান্তিকর; যথা—১১ পৃষ্ঠায় 'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-গীতগোবিন্দের' পরিবর্ত্তে 'বিষ্ণুপুরাণ-ভাগবতের' এবং ২২ পৃষ্ঠায় 'মাগুনিকতার' পরিবর্ত্তে 'আধুনিকতা' হইয়াছে।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যকে সাহিত্যরূপে বিচারের বিস্তৃত চেষ্টা প্রায় হয় নাই। এই শূন্য-পূরণের কাজে ভবিষ্যতে অনেকে আগাইয়া আসিবেন; বর্ত্তমানের জন্য সেই কঠিন কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ত্রস্ত আনন্দবোধ করিয়াছি।

বাংলাদেশের সহৃদয় পাঠকের প্রশ্রয় কামনা করি।

সিটি কলেজ,
আমহার্ষ্ট স্ট্রীট,
কলিকাতা

গ্রন্থকার

সূচী

পাঁচ

ছয়

সাত

মধ্যযুগের কবি ও কাব্য

বিদ্যাপতি ৮

(১)

পূর্ব্ব-ভারতের মধ্যযুগের কবি-সার্ব্বভৌম বলিয়া যদি বিদ্যাপতিকে অভিহিত করা যায়, তবে আপত্তি ওঠে কিনা জানি না, কিন্তু ঐ দাবীর পিছনে যুক্তি আছে। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে বিদ্যাপতির সঙ্গে চণ্ডীদাসের নামও একবৃন্তে ফুটিয়া আছে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কবি মাহাত্ম্য ভারতের এই প্রান্তীয় প্রদেশে এমনই স্বতঃস্বীকৃত যে, মনে হয় উভয় কবি একই ব্যক্তিত্বের দুই রূপ। এই বিশিষ্ট মনোভাব কতখানি যুক্তি-নির্ভর এবং কতখানি পূর্ব্বাগত ধারণা-অনুসারী তাহা একবার তথ্যের আলোকে যাচাই করিলে ভালো হয়। ইহাও দেখিতে হইবে, কবি-সার্ব্বভৌম উপাধিতে বিদ্যাপতির অধিকার কতখানি।

বিদ্যাপতির কাব্যসাধনায় অনেকেই দুইটি বিভিন্ন ভাব-অঙ্গীকৃত স্তর-পর্য্যায় স্বীকার করেন। প্রথম স্তরে কবি যে-সুরে কাব্যরচনা করিয়াছেন, দ্বিতীয় স্তরে তাহা হইতে পৃথক তাঁহার কবিভঙ্গি। অথবা এমনও বলা যায়, প্রথম স্তরে কবি-কৃতিতে একটি মনোভঙ্গি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, দ্বিতীয় স্তরে প্রাণভঙ্গি। সুতরাং স্বভাবতঃই আধুনিক 'প্রাণ'-মুগ্ধ সমালোচক-দৃষ্টিতে প্রথম স্তরের বিদ্যাপতি ধিক্কৃত, এবং দ্বিতীয় স্তরের বিদ্যাপতি অর্চ্চিত। এই ধিক্কার ও অর্চ্চনার মধ্য হইতে বিদ্যাপতির যে সামগ্রিক কবি-পরিচয় তাহাই আবিষ্কার করিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে দ্বিতীয় যুগের বিদ্যাপতির সঙ্গে প্রথম যুগের বিদ্যাপতির কোনো ভাবগত নিগূঢ় সংযোগ আছে কিনা; অথবা দ্বিতীয় যুগের বিদ্যাপতি প্রথম যুগের বিদ্যাপতির সম্ভাব্য পরিণতি কিনা। ভক্ত চণ্ডীদাসের সঙ্গে সাক্ষাতের ফলেই মাত্র বিদগ্ধ বিদ্যাপতির অন্তরে রসের ঢল নামিল—ইহা নির্দ্দেশ করিলে কাব্য-বিচারে আকস্মিকের অতিপ্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। তাহাতে কবি-প্রতিভার বিচার থাকে না ও স্পষ্টই তাহা কবির প্রতি অবিচার। প্রথম স্তরের কবির বাণী-ভঙ্গির পরিচয় গ্রহণ করা যাক।

প্রথম স্তরে বিদ্যাপতির মধ্যে ভঙ্গি-প্রাধান্য—ইহাই কথিত এবং বাস্তবিক তাই। এই বিভাগে যে-সকল কাব্য-পর্য্যায় সন্নিবেশ করিতে হয়, যথা—বয়ঃসন্ধি, পূর্ব্বরাগ, মিলন, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য ইত্যাদি—ইহাদের মধ্যে কবির বলিবার একটি বিশেষ রীতিই রূপময় হইয়া উঠিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কবি তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টির

আলোকে নানাভঙ্গিতে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিরীক্ষণ করিয়াছেন; সে-দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক সুর-আবেশ অল্প এবং কবি-কথনের কৌশল অধিক বলিয়া তাহা ভক্তি-পদাবলী না হইয়া প্রেমকাব্য হইয়া উঠিয়াছে। (এখন প্রশ্ন, ইহা যথার্থ কাব্য হইয়াছে কিনা।)

কাব্যত্ব যে আসলে কি, তাহা বোধকরি নির্দ্দেশ করার মত সুকঠিন বস্তু অল্পই আছে। আত্ম-দর্শনের মত কাব্য-দর্শনও নিতান্ত দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। অন্য দেশের কথা বাদ দিলেও আমাদের দেশেই সুপ্রাচীন কাল হইতে বহু কাগজ-কালি ব্যয় হইয়াছে কাব্যের কাব্যত্ব নির্দ্ধারণে। নির্দ্ধারিত হইয়াছে এমন বলি না। রস না রূপ, ভাব না অর্থ, প্রাণ না ভঙ্গি—কোন্‌টি যে যথার্থ কাব্য-সত্য তাহা এখনও অমীমাংসিত। ইহার মধ্য হইতে অন্ততঃ একটি জিনিস স্পষ্ট হয়, কাব্যসৃষ্টিতে ঐ দুই বস্তু—রস এবং রূপ,—ইহার কোনো একটিকে অস্বীকার করা যায় না। (রস-প্রধান কাব্যও কাব্য, রূপ-প্রধান কাব্যও কাব্য। রস ও রূপের যুগপৎ প্রাধান্য যেখানে তাহাতো নিশ্চয়ই। বিদ্যাপতির প্রথম স্তরের কাব্যে রূপের প্রাধান্য। সেখানে একটা form,—আমি শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রেরণাগত, অনায়াস-আবির্ভূত form-এর কথা বলিতেছি না,—একটা সচেতন রীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই রীতিকে কাব্য-জগৎ হইতে নির্ব্বাসন দেওয়া চলে না। গভীরতর ভাব-আবেদন না থাকা সত্ত্বেও এই রীতি-চাতুর্য্যের দৌলতে অনেকে কবি-পদবী অধিকার করিয়াছেন। বিদ্যাপতির মধ্যে আমরা ঐ দুই শ্রেণীর রীতি-অনুসৃতিই দেখিতে পাইব।

*(বিদ্যাপতির অনেক পদেই কবি-কৌশল চাতুর্য্যের 'সীমা-স্বর্গ'কে বরণ করিয়া আছে। এবং তাহার মধ্যেই কি কবির সৃষ্টি-নৈপুণ্যের একটি বিশেষ দিক প্রকটিত হইয়া ওঠে নাই? বক্রোক্তি বিশিষ্ট কবিভঙ্গি বলিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে স্বীকৃত) কিন্তু প্রাদেশিক সাহিত্যে, বিশেষতঃ বাংলা সাহিত্যের প্রভাব-পরিমণ্ডলে এই বক্রোক্তি কোন্ কবির মধ্যে গৌরবলাভ করিয়াছে? আমাদের স্বীকার করিতে হইবে বহুক্ষেত্রেই বহু সাহিত্যিকের প্রতিভার যে সম্মান আমরা করিয়া থাকি, তাহা এই বক্রোক্তি-নিপুণতা লক্ষ্য করিয়াই। আধুনিক কালে প্রমথ চৌধুরীর রচনা হইতে বক্রোক্তিটুকু মুছিয়া ফেলিলে কী থাকিবে তাহাই ভাবি। সে-হিসাবে, সার্ব্বজনীন সাহিত্য-সংস্কার বা রস-সংস্কারের দিক হইতে না হউক, সাধারণভাবে একটা দেশের একটা কালের বিশেষ চিন্তা ও ভাবনাকে একটা বিশিষ্ট মনোভঙ্গির মধ্যে ধরিয়া রাখার যে প্রচেষ্টা, তাহাকে সাহিত্য বলিতে আপত্তি করিতে পারি না। মধ্যযুগের পূর্ব্ব-ভারতের মনোভঙ্গি রূপ ধরিয়াছে বিদ্যাপতির বক্রোক্তি-বিদগ্ধ রচনার মধ্যে এবং সেই চতুর্দ্দশ-পঞ্চদশ শতক হইতে একেবারে আধুনিক কালে চলিয়া আসিলেও কাব্যের এই বিশিষ্ট

পদ্ধতিটুকুর অনুবর্ত্তী হিসাবে একমাত্র ভারতচন্দ্র (অংশবিশেষে গোবিন্দদাসও) ছাড়া আর কাহাকেও পাই না। আর্ট যেখানে আজিকার দিনে একটা ভঙ্গি-সর্ব্বস্বতার দিকে ঝুঁকিয়াছে, সেযুগে ভারতচন্দ্রকে কবি না বলিলে পাতক হইবে, বিদ্যাপতিকে না বলিলে তো নিশ্চয়ই। সে-হিসাবে কাব্যের চিরন্তন রস-গৌরবের প্রশ্ন বাদ দিয়াও আমরা এই বক্রোক্তির ক্ষেত্রে বিদ্যাপতির জন্য একটি নির্দিষ্ট আসন ও বিশেষ গৌরব দাবী করিতেছি।

বিদ্যাপতির পদে এই বক্রোক্তি বা চাতুর্য্যের উদাহরণ বিশেষ করিয়া প্রদর্শন করার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। মান বা দূতী, কৌতুক বা মিলন,—ইত্যাদি যে কোন পর্য্যায়ের পদে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মিলিবে। ইহার মধ্যে প্রবচন বা প্রৌঢ়োক্তির অজস্র ব্যবহার লক্ষণীয়। এখানে কবি রীতিমত সমাজ-সচেতন। প্রবচন সৃষ্টি অথবা ব্যবহার করার পিছনে সামাজিক অভিজ্ঞতা আত্মসাৎ করিবার প্রবণতা দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাদের অনেকগুলিই সার্থক; অসার্থকও যে নাই তাহা নয়। সমগ্র পদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কয়েকটি তুলিয়া দিতেছি—

১) কুলবতী ধরম কাঁচ সমতূল (২৯)

২) কউড়ি পঠাওলে পাব নহি যোর।
ঘীব উধার মাঁগ মতি ভোর॥
বাস ন পাবএ মাঁগ উপাতি।
লোভক রাশি পুরুখ থিক জাতি॥ (২১৮)

৩) আএল বইসল পাব পোআর।
সেজক কহিনী পূছএ বিচার॥ (ঐ)

৪) যে পতিপালক সে ভেল পাবক। (২১৬)

৫) পিপড়ী কা জঞো পাখি জনমএ
অনল করএ ঝপান।
ছোটা পানী চহ চহ কর পোঠা
কে নহি জান॥ (২১৭)

৬) জইও জকর মুহ পেচ সন
দূসএ চাহএ আন।
হম তহ কে বিসহু আগর
ঢোঁড়লু কা থিক ভান॥ (ঐ)

৭) অপনে রসে উকট কুসিয়ার। (৫২৬)

৮) পএর পখাল রোসে নাহি খাএ।
অন্ধরা হাথ ভেটল হর জাএ॥ (ঐ)

৯) লিহলে উধলল অবইত ভার।
ভেটলে মেটত অছ পরকার॥ (২৪৭)

১০) চিটিগুড় চুপড়লি রাড়ক প্লোরি।
লওলে লোথ বেকত ভেল চোরি॥ (৩৩৩)

১১) তেলি বড়দ থান ভল দেখিঅ।
পালঁব নহি উজিআই॥ (৩৮৭)

১২) তোড়ি জড়িঅ জহাঁ গাঁঠ পড়এ তহাঁ। (৪২৪)

১৩) ভল কএ পুছলএ ঘুরি সঁসার।
তর স্হতে গঢ়ি কাট কুম্ভার॥ (৪৫২)

১৪) পুরুষ-হৃদয় জল দুঅও সহজে চল
অনুবন্ধে বাঁধ থিরাই।
সে যদি ফুটল রহ সহস ধারে বহ
উঁচেও নীচে পথ ষাই॥ (৪৯৮)

১৫) খোজল সকল মহীতল গেহ।
খীর নীর সম ন হেরল নেহ॥
জব কোই বেরি আনল মুখ আনি।
খীর দগু দেই নিরসত পানি॥
তবহু খীর উছলি পড় তাপে।
বিরহ বিয়োগ আগি দেই ঝাপে॥
জব কৈ পানি আনি তাহি দেল।
বিরহ বিয়োগ তবহি দূর গেল॥ (৫৫৮)

১৬) আগিল দূর কর গাহিল চিত ধর।
জইসন বড়ি কুসিয়ারে॥ (৬৮৪)

(উদাহরণগুলি সাহিত্যপরিষদের বিদ্যাপতি পদাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে গৃহীত)

উপরিউদ্ধৃত স্থলগুলিতে কবির চাতুর্য্যের যে পরিচয় মিলে তাহা যে সর্ব্বাংশে কাব্যোৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা নহে। তথাপি কবি যে জীবনরসিক এবং তাঁহার

কাব্যধারার নির্দ্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যেও তিনি যে বহির্জীবনের প্রাণোত্তাপ আহ্বান করিতে চাহিয়াছেন তাহা অনুভব করা যায়।) কবির যে বুদ্ধি-কুশলতা এই সকল স্থানে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই যথার্থ রস-সিঞ্চিত কাব্যের রূপ ধারণ করিলে এক নূতন কবি-গৌরবের আবির্ভাব ঘটিবে। ইতিপূর্ব্বে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি কাব্য যদিচ সাধারণভাবে ভাবমূলক, তথাপি তাহাতে অর্থের পরিসর নিতান্ত সঙ্কীর্ণ নয়। সাধারণ অর্থকে কবিকুল যখন রম্যার্থ করিয়া তোলেন, তখন তাহার মধ্যে স্বর লাগে। সেই রমনীয়ত্ব অথবা চারুত্ব সম্পাদনের মধ্যে কবি-কৌশলের অনেকখানি কৃতিত্ব প্রচ্ছন্ন আছে। আসলে কাব্যের প্রাথমিক উপাদান কিনা শব্দ ও অর্থ। এই দুইয়ের সহযোগে কবি-বাঙ্-নির্ম্মিতি। স্মরণ রাখিতে হইবে—'বাঙ্-নির্ম্মিতি'। কাব্য হইল ভাবের রূপ-নির্ম্মাণ। সেই রূপের প্রাসাদ গড়িতে যে প্রতিভার প্রয়োজন, তাহা যদি স্বয়ং স্রষ্টিকর্ত্তার প্রতিস্পর্দ্ধী মহাকবির হয়, তাহা হইলে ঐ ক্ষেত্রে রূপ ও রস, শব্দ ও অর্থ অপৃথগ্যত্নে হরগৌরীর মত পরস্পরের রূপ বিভোর হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই মহত্তম আবেগের আধারীভূত কবি-প্রতিভা চিরকালই দুর্লভ। অথচ কাব্য-পিপাসা,—কোন না কোন দিক হইতে,—সুলভ। সুতরাং আসে অর্থের সম্মান, বুদ্ধির গৌরব, অলঙ্কারের প্রসঙ্গ। যে কবি সেই বুদ্ধির অথবা অর্থদীপ্তির সম্পদ তাঁহার কাব্যের মধ্যে গাঁথিয়া দিতে পারেন, তিনিও কবি এবং নিতান্ত সুলভ কবি নন। এখন তো দেখিতেছি নব্য সমালোচনা শাস্ত্রে বুদ্ধির জয়ঘোষণা চলিতেছে। রসই আর কাব্যের পরম পুরুষার্থ থাকিতেছে না,—তাহা 'আনন্দ'। এবং এই 'আনন্দ' কেবল 'ভাব'-পথে নয়, 'অর্থ'-পথেও লভ্য। বলা বাহুল্য সেই অর্থ রম্যার্থ। (কাব্য-জগতে বুদ্ধি ও অর্থের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার এই মুহূর্ত্তে নূতন করিয়া রীতিবাদের সম্মান করিতেছি, অলঙ্কার-নৈপুণ্যকে শিরোপা দিতেছি। সুতরাং বিদ্যাপতিও মর্য্যাদা দাবী করিতে পারেন,—সেই বিদ্যাপতি যিনি শব্দ ও অর্থের বিদ্যুৎ-চমকে আমাদের চোখ ঝলসাইয়া দিয়াছেন।)

(রম্যবোধ ও রম্যার্থের পথে বিদ্যাপতির কাব্যে অত্যুৎকৃষ্ট কবি-কৃতির দুর্লভ অবসর আসিয়াছে।) সেই সকল স্থান বিচার করিব। তৎপূর্ব্বে বিদ্যাপতির একটি কবি-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন, অন্ততঃ আমার তো তাই মনে হয়। (বিদ্যাপতি মনোধর্ম্মী কবি। এইখানে তাঁহার কবি-প্রতিভার একটি মূলসূত্র বিধৃত।) ইতিপূর্ব্বে বহুস্থলে বিদ্যাপতির কাব্যে অর্থগৌরবের উল্লেখ করিয়াছি। তাহার সহিত মনোধর্ম্মিত্বের কি কোন পার্থক্য আছে? পার্থক্য প্রকারের নয় পরিমাণের। বুদ্ধি-ধর্ম্ম মনোধর্ম্মের একটা অংশ হইতে পারে। এবং একথাও বলিব, মধ্যযুগের

অন্য-কোনো কবির কাব্যেই এই মনোধর্ম্ম এত অধিক পরিমাণে সক্রিয় নয়। প্রতিবাদ-স্বরূপ গোবিন্দদাসের নামোল্লেখ হইতে পারে। আমার নিজের মনে হয় গোবিন্দদাস intellectual নন। তাঁহার কাব্যপ্রেরণার উৎসমূলে আছে ভক্তিপ্রাণতা, এবং সেই ভক্তিপ্রাণতাকে কাব্যগত করিতে তিনি মণ্ডনকলার আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহার কাব্যের যে চাতুর্য্য, তাহা কোনো বিশিষ্ট মনোধর্ম্ম হইতে আসে নাই, তাহার উদ্ভব মণ্ডনকলার অনুসরণে। মনোধর্ম্ম বলিতে আমরা জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে কবির একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি,- অবশ্য কাব্য-রীতির সীমাবদ্ধ অবসরে যতটুকু সম্ভব,—বুঝিয়া থাকি। এই যে দৃষ্টিভঙ্গি, ইহা গড়িয়া ওঠে কবির পরিপার্শ্বিক এবং শিক্ষাদীক্ষা হইতে—তাঁহার বিদ্যা ও বৈদগ্ধ্য সহায়ে। বিদ্যাপতি শিক্ষিত কবি, বিদগ্ধ কবি এবং রাজসভার কবি। তাঁহার কাব্যে কেবল বুদ্ধির কসরৎ নয়, মননের অনস্বীকার্য্য রীতি-অঙ্গীকার ঘটিয়াছে। ইহারই ফলে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গিতে রস-পিপাসার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলও যুক্ত হইয়াছে। সেই পিপাসা এবং সেই কৌতূহল,—উভয় মিলিয়া তাঁহার বয়ঃসন্ধির পদগুলিকে এমন উৎকৃষ্ট করিয়াছে। বয়ঃসন্ধিতে বিদ্যাপতির কবি-ব্যক্তিত্বের যে পরিচয়, তাহার মাহাত্ম্য নানা দিক হইতে। প্রথমতঃ এই যে-রাধাকে তিনি নিরীক্ষণ করিতেছেন, এ রাধা কোনো বৃন্দাবন হইতে আসে নাই, মানস-বৃন্দাবনও নয়। কবির দৃষ্টিতে মানবিকতা অকুণ্ঠ আনন্দে প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যাপতি যে এই রাধাকে দর্শন করিতেছেন, ইহার মধ্যে সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ক্ষুধা ঘোচে নাই। ইহাকেই আমি তাঁহার মনোধর্ম্মিতার লক্ষণ বলিয়াছি। এই দৃষ্টিঘটিত কৌতূহলের জন্য মানবী রাধার যৌবনোন্মেষের কোনো বাস্তব অবস্থাই অলক্ষিত থাকে নাই। এবং সর্ব্বোপরি ইহারই উপর,—এই বাস্তব জীবন-রূপের উপর—তিনি আপন মানসী-প্রতিমা গড়িয়াছেন। সেইখানেই বিদ্যাপতির সৌন্দর্য্য-সাধনার সর্ব্বোৎকর্ষ।

বিদ্যাপতির সৌন্দর্য্য-সাধনার কথা আসিল বলিয়া সে সম্পর্কে দু'একটি কথা বলিয়া লই। বিদ্যাপতি তাঁহার কাব্যের এক স্তরে লৌকিক অর্থে সৌন্দর্য্য-সাধনা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাই করিয়াছেন। না, কোনো ভক্ত-প্রাণের আকূতি নিবারণ করিতে শ্রীরাধিকার রূপ-নির্ম্মাণ নয়, আত্মপ্রাণের সৌন্দর্য্য-পিপাসা চরিতার্থের জন্যই বিদ্যাপতি রাধামূর্ত্তি তিলে তিলে রচিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার রাধিকা যেমন একদিকে বিশ্বহৃদির রাধারাণী, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার কবিপ্রাণের সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী। বিদ্যাপতির সামনে অসীম সৌন্দর্য্যময়ী রহস্যমূর্ত্তি বিরাজিত ছিল। কবি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহারই রূপসুধা পান করিয়াছেন। সেই পিপাসা-নিবারণে তাঁহার কোনো কুণ্ঠা নাই, সেই

সৌন্দর্য্য-দর্শন করিতে তিনি এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করেন নাই। ফলে তিনি যে রাধিকার মূর্ত্তি চিত্রিত করিলেন, একদিকে তাহা যেমন তাঁহার বৈজ্ঞানিক কৌতূহলজনিত মনোবৃত্তির জন্য বাস্তব মানবী, অন্যদিকে তাহাই তাঁহার বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-সাধনার ঈশ্বরী হইয়া দেবী—সৌন্দর্য্যদেবী। ফলে বিদ্যাপতির রাধিকার মধ্যে যুগপৎ বাস্তব ও অবাস্তবের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। বয়ঃসন্ধির রাধা (সাধারণভাবে) বাস্তব, পূর্ব্বরাগেও তাই; কিন্তু অভিসারের রাধিকায় অবাস্তবতা অথবা বাস্তব-উর্দ্ধতার ছায়াপাত হইয়াছে। অতঃপর বিরহের মধ্য দিয়া ভাবসম্মিলনে রাধিকার যে রূপ-পরিবর্ত্তন তাহার বিচার পরে করিব, কারণ তখন বিদ্যাপতির নিছক সৌন্দর্য্য-সাধনার অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। বয়ঃসন্ধি, পূর্ব্বরাগ, অভিসারের রাধিকাই সৌন্দর্যের রাধিকা, এবং দুঃসাহস না হইলে বলিব, সে-রাধিকা বিদ্যাপতির মানস-সুন্দরী।

এইবার পদ বিশ্লেষণে আসা যাক। প্রথম বয়ঃসন্ধির পদ। বাস্তবিক বিদ্যাপতি যে কত বড় সৌন্দর্য্যরসিক কবি, তাহা এই পদগুলি এমন অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করিয়াছে যে নূতন করিয়া বর্ণনার প্রয়োজন নাই। পর যুগের এক ভাববিহ্বল বৈষ্ণব কবি রূপের পাথারে আঁখি ডুবাইয়া, যৌবনের বনে মন হারাইয়া অফুরাণ সৌন্দর্য্যের পথে কেবলই ঘুরিয়া ফিরিয়াছেন। বিদ্যাপতিও পথ হারাইয়াছেন, সে-পথ যৌবনের পথ নহে,—যৌবন-রহস্যের নিবিড়,গভীর,ঝাঁপিয়া-আসা মায়া-কাননও নয়,—তাহা কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণের আলো-আঁধারি। সেখানে প্রকাশ ও অপ্রকাশের মধ্যে দোলাচল চিত্ত-বৃত্তি, তেজ ও তমের পরম বিরোধ, স্মৃতি ও বিস্মৃতি, লীলা ও লাস্য, সরলতা ও চতুরতার মধ্যে আন্দোলিত দেহ মন। শৈশবের মন আর যৌবনের মন, শৈশবের দেহ আর যৌবনের দেহে দ্বন্দ্ব পড়িয়া গিয়াছে। ঐ চঞ্চল দেহের সহিত চঞ্চল মনের বিরোধ কি অল্প? কোথাও দেহ যৌবনের দুয়ারে আঘাত করিয়াছে, মনের তন্দ্রা ঘুচে নাই। আবার কোথাও দেহ অবিকচ কমলকোরকের মতই সৌরভ-সুপ্ত অথচ তাহাকে ঘিরিয়া যৌবন-মধুকর গুন্‌গুন্ করিয়া ফিরিতেছে। কবি এ সকলই দেখিয়াছেন, দেখিয়া বিভোর হইয়াছেন। সে বিভোরতা আত্মবিভোরতা নয়,—বস্তুবিভোরতা, তাহা একান্তই তন্ময় রসদৃষ্টি। তাই শ্রীরাধিকার সৌন্দর্য-সন্ধির মধ্যে পথ হারাইয়াও কবি কোথাও মন হারান নাই। যাহা দেখিয়াছেন, তাহা দেখাইয়াছেন, রূপমুগ্ধ দৃষ্টির প্রত্যক্ষকে কোথাও রূপ-রসিকের নিকট অপ্রত্যক্ষ রাখেন নাই। সত্যই বয়ঃ-সন্ধির কাব্যপর্য্যায় নির্ব্বাচনের মধ্যে বিদ্যাপতির কবি-দৃষ্টির যে পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়, তাহা যেমনই মৌলিক, তেমনই অনুপম। কত কবিই তো যৌবনের গান গাহিলেন, কত শিল্পীই তো শৈশবের বন্দনা করিলেন,—সে দৃষ্টির মধ্যে আত্মমগ্ন ভাবদৃষ্টির কলা-

কারু দেখিয়া আমরা কতই না মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু ঐ দুই 'স্থির' সৌন্দর্যের অস্থির সন্ধিক্ষণকে যিনি কাব্যের উপাদান করেন, তিনি আমাদের কেবল বিমুগ্ধ করেন না,—বিস্মিত করেন ; তাঁহার কাব্যে কেবল রসাবেশ নয়,—রস-চমৎকার। আধুনিক কালের কবি-দৃষ্টিতে একস্থানে ঐ যুবতী-কিশোরীর যে ছবি ফুটিয়াছে, তাহার কিয়দংশ তুলিয়া দিতেছি :

"মুখ ফোটে ফোটে ফোটে না। মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থলকমলিনীর ন্যায় মুখ যেন ফোটে ফোটে তবু ফোটে না। ভীরু-স্বভাব কবির কবিতাকুসুমের ন্যায় মুখ যেন ফোটে ফোটে তবু ফোটে না।" (চন্দ্রশেখর)

অন্যত্র :

"সুন্দরী—নবীনা—সবেমাত্র যৌবন-বরষায় রূপের নদী পূরিয়া উঠিতেছে। ভরা বসন্তে অঙ্গমুকুল সব ফুটিয়া উঠিতেছে। বসন্ত বর্ষায় একত্র মিশিয়াছে।"—(চন্দ্রশেখর)

যে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম, তাহা স্পষ্টতঃ বয়ঃসন্ধির বর্ণনা নয়, অবশ্য 'বালিকা-যুবতী'র ভাব ও রূপবর্ণনা প্রসঙ্গেই কবি ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। তথাপি ঐ দুই অংশে বয়ঃসন্ধির ভাব-অস্থিরতা, উন্মাদনা অথবা প্রকাশ-বেদনার বর্ণনা এমন কবিত্বময় ও রমণীয় যে তাহা দ্বারা বিদ্যাপতির পদের আস্বাদনে উল্লাস বাড়িবে ! ঐ যে, "মুখ যেন ফোটে ফোটে ফোটে না"—বিদ্যাপতি ইহারই চিত্র আঁকিয়াছেন—'ফোটে ফোটে ফোটে না' দেহের, 'ফোটে ফোটে ফোটে না' মনের। ঐ যে ভরা যৌবনে 'বসন্ত বর্ষায় একত্র মিশিয়াছে'—ঐ বর্ষা যৌবনের, ঐ বসন্ত কৈশোরের। বয়ঃসন্ধি হাসিকান্নার লীলা। কৈশোরের চাঞ্চল্য মথিয়া যৌবন আসিতেছে, দেহমনে কী তাহার উল্লাস, অথচ কতই না বেদনা। এ বেদনা দুনিরীক্ষ্য অথচ সর্বমানব-সাধারণ—কৃষ্ণের জন্য রাধার বেদনা হইবার প্রয়োজন নাই—ঐ বসন্ত বর্ষার মিলন। আর একবার জনৈক আধুনিক কবির জবানীতে বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধিলীলার রস-বর্ণনা উপভোগ করিব, অতঃপর বিদ্যাপতির নিজস্ব পদের আস্বাদনে নামিব। কিশোরীর মূর্তি কবি আঁকিতেছেন—এক প্রান্তের চিত্র—

"কাঁচপোকা টিপ কপালে এখনো, ছাড়েনি পুতুল খেলা,
রাগ অভিমান কাঁদাকাটা হাসি লেগে আছে সারাবেলা।
সেধে ভাব করা যেমন তেমনি চিমটি কাটিতে পটু,
বৌদিদিদের পরিহাসে হারি রাগিয়া কহিবে কটু ॥......
চুড়ি কয়গাছি ক্ষণে ক্ষণে বাজে, ঝম্‌ঝম্ বাজে মল,
আধমুকুলিত উরস পরশি হার করে ঝলমল।

জোড়া ভুরু আর অলকার মাঝে পঞ্চমী চাঁদ পাতা,
ডাগর চোখের সরল চাহনি অশ্রু হাসিতে গাঁথা ॥"

অন্যপ্রান্তে—

"রাতের বেলায় জ্বালিয়ে বাতি মুকুরে তার মুখ 'দ্যাখে',
কাঁচলখানি খুলেই আবার মুচকি হেসে বুক ঢাকে।
দর্পণে সে চুম দেবে তার গালের টোলে লাজ-রাঙা,
ঠোঁটেই পড়ে ঠোঁটের চুমা, তাইত প্রাণে দুখ থাকে।"

এইবার বিদ্যাপতির পদ। বিদ্যাপতির যে-সকল পদ পাইতেছি (সাহিত্য পরিষদ সংস্করণে), তাহার মধ্য হইতে পদগুলি একটু সাজাইয়া লইলে কৈশোর হইতে যৌবন-উন্মেষের একটি চমৎকার ক্রমিক চিত্র পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণ ভাগবতের পূর্ণযৌবনা রাধিকা সম্পর্কে কবি-চিত্তের সংশয়-জিজ্ঞাসা— "ছিলে না কি কোনোকালে মুকুলিকা বালিকাবয়সী"—ছিল না, কবি একথা বিশ্বাস করিতে রাজী নন। সুতরাং তিনি শৈশব ও যৌবনের দ্বন্দ্ব বর্ণনা করিতেছেন—

"শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু দলবলে দ্বন্দ্ব পড়ি গেল ॥
কবহু বাঁধয় কচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাঁপয় অঙ্গ কবহু উঘারি ॥
অতি থির নয়ন অথির কিছু ভেল।
উরজ-উদয়-থল লালিম দেল ॥
চঞ্চল চরণ চিত চঞ্চল ভান।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান ॥"—(৪৯)

শৈশব যৌবনের দ্বন্দ্বের মধ্য হইতে শৈশবের প্রাধান্য এখনো চিনিয়া লইতে পারি। এখনো নয়ন চঞ্চল, চরণ চঞ্চল, চঞ্চল চিত ও চঞ্চল অঙ্গ—অথচ যৌবনের পদক্ষেপ হইয়াছে, দেহ-চেতনা জাগিয়াছে।

শৈশব যৌবনের দ্বন্দ্ব আর একটি পদের উপজীব্য। কাব্যগুণে পদটি উৎকৃষ্টতর।—

খনে খনে নয়ন কোণ অনুসরঈ।
খনে খনে বসন-ধূলি তনু ভরঈ ॥
খনে খনে দশন-ছটা ছুট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস ॥

চউকি চলয়ে খনে খনে চলু মন্দ।
মনমথ-পাঠ পহিল অনুবন্ধ ॥
হিরদয়-মুকুল হেরি হেরি থোর।
খনে আঁচর দএ খনে হোয় ভোর ॥—(৫৪)

এখানে শৈশব ও যৌবন উভয়ে একই দেহমন অধিকার করিয়া আছে। সরল আঁখির কোণে কটাক্ষের চতুরতা অথচ বসনে ধূলি মাখিবার চাপল্য। প্রাণের সহজ আবেগে হাসির ঝলক তুলিতেছে বটে, কিন্তু তাহাকে সংবরণ করিতেও সচেষ্ট। ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিতেছে অথবা অঞ্চলাগ্রে মুখ ঢাকিতেছে। কবি বলিতেছেন 'শৈশব তারুণের' 'জেঠ কনেঠ' স্থির করিতে তিনি পারেন নাই, তথাপি পাঠক অনুভব করে, তারুণ্যের দিকেই ভাবের আধিক্য, বিশেষতঃ এই শেষ দুই পঙ্‌ক্তি—"হিরদয়-মুকুল হেরি হেরি থোর" ইত্যাদি, ইহা তো নিঃসন্দেহে যৌবন-সমাগমের প্রাতঃকৃত্য।

ইহার পর একটি পদে যৌবন আসিয়া পড়িয়াছে, অথচ শৈশব যাইয়াও যাইতেছে না। তাহার মাধুর্য্য দেহে মনে আলিঙ্গন করিয়া আছে। যৌবনের সহিত পরিচয় এখনো গভীর হয় নাই, নব-পরিচয়ের চকিত-চাঞ্চল্য, তাহার নিবিড় আকর্ষণ অথচ সশঙ্ক কম্পন যেভাবে—সমগ্র পদে না হউক—একটি উপমার মধ্যে রূপ ধরিয়াছে, তাহা অসাধারণ বলিতে পারি। ঐ অবসরে ঐ উপমাটি একেবারে অব্যর্থ, অনিবার্য্য বলিলেও চলে। শ্রেষ্ঠ কাব্যে ভাব এবং উপমা যে অর্দ্ধনারীশ্বর, তাহার প্রমাণ এখানে পাইতে পারি। কবি শ্রীরাধার প্রথম যৌবন-চেতনা বর্ণনা করিতে মাত্র দুইটি পঙ্‌ক্তি লইয়াছেন :

শুনইতে রসকথা থাপয় চিত।
জইসে কুরঙ্গিনী শুনয়ে সঙ্গীত ॥

রাধার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা বর্ণনা করিতে জগতে বোধ করি ঐ একটিমাত্র উপমান-বস্তু আছে—কুরঙ্গিনী। কোথা হইতে একটা গীতধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে, সদা-সন্ত্রস্ত চঞ্চল বনের হরিণী অকস্মাৎ থামিয়া পড়িল, উৎকর্ণ হইয়া সেই অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনিতে লাগিল। হরিণী নয়—রাধিকা, গীতধ্বনি নয়—রসকথা। চঞ্চলতার মধ্যে হরিণীর ঐ উৎকর্ণ ভঙ্গিটুকু, অপরদিকে সখীপরিবৃতা স্বজনবেষ্টিতা রাধিকার গোপন সোৎসুক শ্রবণেচ্ছা—এ সকলই একেবারে একাকার হইয়া গিয়াছে। হরিণী এবং রাধিকা উভয়ের ঐ অরক্ষিত কৌতূহলটুকু যেন কোন্ বেদনার আভাস ঘনাইয়া তুলে, রবীন্দ্রনাথ হইলে হয়ত বলিতেন, উদ্যতশর পঞ্চশরকে মিনতি করিয়াই বলিতেন

কালিদাসের ভাষায় "মৃদু এ মৃগদেহে মেরো না শর, আগুন দেবে কেহে ফুলের পর", "ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্ মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ।"

অতঃপর কয়েকটি পদে শৈশব কেমন করিয়া যৌবনে পরিণত হইল, তাহারই দৈহিক পরিবর্ত্তনের বর্ণনা আছে। সেই সকল পদে মানসিক অংশ অল্প বলিয়া উদ্ধার করিবার প্রয়োজন নাই।

বয়ঃসন্ধির পদগুলি সম্পর্কে যে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইল তাহার মারফৎ বিদ্যাপতির কবি-প্রকৃতির একটি স্বধর্ম আশা করি পরিস্ফুট হইয়াছে—তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং মনোধর্ম্মিতা। এ বিষয়ে আলোচনা পূর্ব্বেই করিয়াছি এবং বলিতে চেষ্টা করিয়াছি ঐ মনের প্রাধান্যের পিছনে বুদ্ধির কারু অল্প নয়। তথাপি বিদ্যাপতির সকলের বড় কৃতিত্ব, এই বুদ্ধি-দৃষ্টিকে তিনি কাব্য-পর্য্যায়ে উন্নীত করিতে পারিয়াছেন। যে পদগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, সেগুলি যে কাব্য হয় নাই—ইহা কেহ বলিবেন না আশা করি। বিদ্যাপতির কাব্যে মনস্তত্ত্বের এই সূক্ষ্মতা বাস্তবিক আশ্চর্য্যের। যখন এমন পঙ্‌ক্তি পড়ি—

ক্ষণ ভরি নহি রহ গুরুজন মাঝে।
বেকত অঙ্গ ন ঝপায়ব লাজে ॥—

তখন অবাক হইয়া ভাবি, এতখানি মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, ইহা কেমন করিয়া তাঁহার কাব্যের উপাদান হইতে পারিল। অথবা ইহাই স্বাভাবিক;—কবিদৃষ্টি প্রতিভাদৃষ্টি, আর প্রতিভার সম্মুখে আত্মগোপন করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই। নচেৎ এতখানি সূক্ষ্মতা—অঙ্গ ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে যত না লজ্জা, সেই ব্যক্ত অঙ্গ সম্পর্কে আমি সচেতন, অঙ্গ ঢাকিতে গিয়া ইহা যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে তাহার লজ্জা বহুগুণ,—কেমন করিয়া সম্ভব? আবার এই চিত্র:

কেলিক রভস যব শুনে আনে।
অনতএ হেরি ততহি দএ কানে ॥
ইথে যদি কেও করএ পরচারী।
কাঁদন মাখী হাসি দএ গারী ॥—

কাব্যহিসাবে ইহার উৎকর্ষের কথা বাদ দিলেও মনস্তত্ত্ব হিসাবে? আশ্চর্য্য কবির অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি।

তথাপি বলিতে হইবে ঐ সকল অংশ কাব্য হইয়াছে এবং উৎকৃষ্ট কাব্য। মনস্তত্ত্ব আছে সত্য, কিন্তু তত্ত্ব ছাড়াইয়া বহুদূর পথে কাব্য আগাইয়া চলে।

এইবার আর একটি রস-পর্য্যায় সম্বন্ধে দু'একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। পূর্ব্বরাগে

বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব নাই ইহাই স্বীকৃত। সেখানে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের অবিসংবাদিত প্রাধান্য। কথাটি অনেকাংশে সত্য। তথাপি পূর্ব্বরাগ-পর্য্যায়ে বিদ্যাপতি যে নিতান্ত 'গমার' একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগই—রাধিকার নয়—উৎকৃষ্ট। আমরা পূর্ব্বরাগ বলিতে রাধিকার পূর্ব্বরাগই বুঝি। রাধিকার পূর্ব্বরাগের ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি ঐ দুইজন কবির কাছাকাছিও পৌছিতে পারেন নাই। একথা অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য। এমন কি 'ভাল' বলিতে পারা যায় এরূপ একটি পদও রাধিকার পূর্ব্বরাগ-পর্য্যায়ে নাই। যেগুলিকে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ মনে হয়, সেগুলি বাঙালী কোন কবির রচনা, যিনি চৈতন্যোত্তর যুগের। তথাপি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের পদ এমন উৎরাইল কি করিয়া? এখানেও সেই একই উত্তর—বিদ্যাপতির কবি-প্রাণের স্বধর্ম্ম, যাহা ভাব ছাড়িয়া রূপ, রস ছাড়িয়া অর্থের দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ তো আর কিছুই নহে, তাহা রূপমুগ্ধতা। রাধিকার রূপ দেখিয়া কৃষ্ণের মন মজিয়াছে। বিমুগ্ধ প্রাণের সেই উচ্ছ্বসিত সুবোৎসার শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ-বিষয়ক পদে ঐরূপ অনুপম-সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শ্রীরাধার প্রেমপ্রীতির পরিচয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাধিকা নারী। তাহার মধ্যে যতই হউক নারী-সুলভ একটা মধুর হৃদয়বত্তার প্রাধান্য থাকিবেই—আধ্যাত্মিকতার কথা যদি ছাড়িয়াও দিই। তাহাই যখন কৃষ্ণপ্রেমের দেউলে পূজা নিবেদন করিতে অগ্রসর হয়, তখন—নারী বলিয়াই—একপ্রকার পূজারিণীর শুচি-সুস্মিত ভাবের প্রাবল্য ঘটে। বিদ্যাপতি ইহার অন্যথা করিয়াছেন, তাই তাহা সার্থক কাব্য হয় নাই। চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বরাগের রাধিকাকে অপূর্ব্ব-রাগোন্মত্তা করিয়া তুলিয়াছেন। বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের পূর্ব্বরাগ—আক্ষেপানুরাগের তুলনা আছে নাকি? সেখানে রূপ নয় সেখানে নাম, সেখানে মন নয় সেখানে প্রাণ—'জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো', 'অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি কি করে প্রাণ'। বিদ্যাপতির রাধা তো তেমন করিয়া আকুল হইতে পারে না। এই পর্য্যায়ের কাব্যে 'রাধার দেহের ভাগ অধিক' ইহা তো দিবাসত্য। নারীর রূপতৃষ্ণা উৎকৃষ্ট কাব্য হইতে পারে কিনা সন্দেহ যদি তাহার মধ্যে রূপাতীত কিছু না থাকে। অপর পক্ষে নারী-রূপই যুগে-যুগান্তরে কবি-চিত্তের ধূপ-দীপারতিতে রহস্য-কল্পনাময় হইয়া মূর্ত্তি ধরিয়াছে। একজন পুরুষ যখন সেই রূপ দর্শন করেন, তখন রূপ-লালসার বর্ণনার মধ্য দিয়াই—যদি উচ্চতর কোনো মনোভাব অনুপস্থিত থাকেও—কাব্যত্বে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব। পুরুষ কৃষ্ণ যখন নারী রাধিকার রূপ 'নেহারিছেন', তখন কৃষ্ণের দৃষ্টি কবির দৃষ্টিতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণ নয়, স্বয়ং কবিই তাঁহার

আরাধ্যা সৌন্দর্য্য-মূর্ত্তির বন্দনাগান রচনা করিতেছেন। বয়ঃসন্ধি যে কারণে উৎকৃষ্ট, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগও সেই কারণে। রাধিকার রূপ নয়ত শেল, একেবারে পাঁজর ভেদিয়া হৃদয়ে বসিয়া গেল—হৃদয় ধ্বসিয়া গেল। প্রস্তুতির সময় ছিল না, আত্মরক্ষার উপায় ছিল না, পথে যাইতে বুঝি একবার নয়নের কোণে,—একেবারে সম্মুখে প্রত্যক্ষও নয়,—সে রূপ লাগিয়াছিল—'ভাল করি পেখন ন ভেল'—তাহার পরেই—

মেঘমাল সঞে তড়িতলতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল।

রূপ-শেল-বিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের কামনার হৃদয়-মন্থন-জ্বালা কয়েকটি পদে সত্যকার রসরূপ ধরিয়াছে :

অপরূপ পেখল রামা
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল
হরিণ-হীন হিমধামা।—(৩৪)

যব—গোধূলি সময় বেলি
ধনী—মন্দির বাহর ভেলি।
নবজলধর বিজুরি-রেহা
দ্বন্দ্ব পসারি গেলি॥ (৯২)

গেলি কামিনী গজহু গামিনী
বিহসি পলটি নেহারি।......
চরণে যাবক হৃদয় পাবক
দহই অঙ্গ মোর॥ (৭৫)

চিকুর গরএ জলধারা।
জনি মুখশশী ডর
রোয়এ আঁধারা। (৩৫)

আবার আধুনিক কবির মৌলিকতা হরণ করিয়াছে এমন কাব্য-পঙ্‌ক্তিও আছে—

তনু সঞে মিলি গেও সজল নীলাম্বর
বিন্দু বিন্দু ঝরু বারি।
রোয়ত সাটী, মোহে ধনী তেজব
পহিরব আনহি সাড়ী॥ (৪৬)

—না, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে একটু পার্থক্য আছে, সুন্দরীর সুনীল বসন স্নানের পূর্ব্বেই অঙ্গচ্যুত হইয়া কাঁদিতেছে—

"তীরে শ্বেতশিলাতলে সুনীল বসন
লুটাইছে এক প্রান্তে স্খলিতগৌরব
অনাদৃত; শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ
এখনো জড়িত তাহে, আয়ুপরিশেষ
মূর্চ্ছান্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ।
লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ
মৌন অপমানে।"

যে সামান্য পদাংশ উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে কবি-বাঙ্-নির্ম্মিতির দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষে আসিয়াছে। এই রূপনির্ম্মাণ-কৌশলের জন্য রচনা উচ্চতম লিরিক অনুভূতির আধার না হইয়াও চমৎকৃতি লাভ করিতে পারে। এবং বিদ্যাপতিতে তাহাই দেখিলাম। বিদ্যাপতির সঙ্গে চণ্ডীদাসাদির পার্থক্য এইখানে। বিদ্যাপতি কাব্যের form-কে যেমন প্রাধান্য দিয়াছেন, চণ্ডীদাস বা জ্ঞানদাস তেমন দেন নাই। বিদ্যাপতির দৃষ্টিমূলে আসক্তি ছিল, কিন্তু আসক্তি কেবল উপভোগে, তিনি ভোক্তা। কাব্যে রূপদান করিতে গিয়া ঐ আসক্তির সূত্র ধরিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগ সীমাহারা হয় নাই। তাঁহার কবি-দৃষ্টি একান্তই বস্তু-বিভোর। অপরপক্ষে চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস ভোক্তা হইতে ভক্ত অধিক, তাঁহাদের কাব্যে রূপমুগ্ধতা হইতে স্বরূপ-বিভোরতা প্রধান। জ্ঞানদাসের একটি অত্যুত্তম পদ—'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর'—রূপানুরাগের পদ বলিয়াই কথিত। কিন্তু ইহার মধ্যে রূপের প্রতি অনুরাগ কতটা আছে তাহা সন্দেহজনক। রূপ কতখানি অনুরাগ জন্মাইয়াছে ইহা তাহারই কাব্য-কথা। যাহার "পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে" সে আবার কোনদিন ভাল করিয়া রূপদর্শন করিয়াছে কি, সন্দেহ হয়। বিদ্যাপতি সত্যই তাহা করিয়াছেন, তাঁহার কাব্য-শিষ্য গোবিন্দদাসও তাহাই। তাই বিদ্যাপতির পক্ষেই (গোবিন্দ-দাসেরও) আত্ম-আবেগ সংবরণ করিয়া রাধিকার সৌন্দর্য্য দেখিতে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইয়াছে। আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়া, নানা পরিবেশে শ্রীরাধার সৌন্দর্য্যের নব নব বিকাশ কবি প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন। এবং এইজন্যই তাঁহার কাব্যে চিত্রধর্ম—নাটকীয়তা—উপমা-উৎপ্রেক্ষার ছড়াছড়ি। যে তন্ময় দৃষ্টি হইতে চিত্ররস ও নাট্যরসের উদ্ভব সম্ভব, তাহা বিদ্যাপতিতে কী পরিমাণ বর্ত্তমান ছিল, তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত বয়ঃসন্ধি ও পূর্ব্বরাগের পদগুলি হইতে প্রমাণ হইয়াছে। কথায়

এমন উজ্জ্বল অভ্রান্ত ছবি আঁকিতে তো সে-যুগে আর কাহাকেও দেখি না। এমন কি গোবিন্দদাসও এবিষয়ে তাঁহার নিম্নে। তিনিও ছবি আঁকিয়াছেন কিন্তু তাঁহার অখণ্ড-প্রবাহিত ছন্দহিল্লোল সে-চিত্র উপভোগে বাদ সাধে। বিদ্যাপতির অপেক্ষাকৃত ছন্দ-পরুষতা পদের অর্থ ও সেই সূত্রে চিত্রটি অধিকতর হৃদয়গোচর করে। এবং অনেকাংশে বিদ্যাপতির প্রাচীন কবি-ঐতিহ্য পরিত্যাগ এ বিষয়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের স্মারক। বয়ঃসন্ধিতে তিনি প্রাচীন কবি-পন্থার সাহায্য পান নাই। যদি বিক্ষিপ্ত ইঙ্গিত সামান্য কিছু থাকেও, তাহাকে কাজে পরিণত করিবার সমুদয় কৃতিত্ব তাঁহারই। গোবিন্দদাসের কবি-দৃষ্টিতে এই মৌলিকতা নাই। আবার বিদ্যাপতির কাব্যে যে উপমা-প্রাধান্যের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও তাঁহার কবি-বৈশিষ্ট্যকে ধরাইয়া দেয়। ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে উপমা-প্রাধান্য অত্যধিক। জাতিহিসাবে আমরা প্রতীক-উপাসক। সুতরাং বাস্তব জীবনচিত্র হইতে, সেই জীবনকেই এক অবাস্তব-মনোহর জগতে স্থাপন করিয়া,—যেখানে উপমা-উৎপ্রেক্ষা রূপক-অলঙ্কারের অবাধ সঞ্চরণ—আমরা কাব্যকে মর্ত্ত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছি। শিল্পজগতে,—কি চিত্র, কি কাব্য,—আমরা 'ছান্দসিক' রীতির পক্ষপাতী; ঐ রীতি আর কিছুই নয়, একটি বস্তুর গড়ন ও রঙের সহিত অন্যবস্তুর গড়ন ও রঙের সাদৃশ্য উপলব্ধি ও সংকেতে তাহার রূপায়ণ। আমরা সাধারণতঃ একটা বস্তুর সহিত শ্রেণীগত ছন্দানুগ অন্য একটি বস্তু প্রায়শঃ মনুষ্যেতর প্রাণী বা বস্তুর সূক্ষ্ম ভাবৈক্য উপলব্ধি করি এবং তাহাকেই সর্বক্ষেত্রে উপমান হিসাবে ব্যবহার করি। যেমন নারীর গতিগমনের সঙ্গে গজগমনের, পদ্মপর্ণের সঙ্গে চক্ষুপল্লবের, বিম্বের লালিমার সঙ্গে অধরোষ্ঠের। এই বস্তুগুলি 'ধ্রুবমান' হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এবং কবি বা চিত্রীগণ উপমা দিতে গিয়া, সাদৃশ্য উপলব্ধি করাইতে গিয়া, ঐ সকল ধ্রুবমানের যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। এই রীতির অত্যধিক অনুশীলনে অস্পষ্টতা এবং জীবন-বিমুখতার দোষ ঘটে। বিদ্যাপতির কাব্যে উপমা-ব্যবহারে এই দোষ নাই তাহা নয়, তথাপি তিনি অনেকাংশে ইহাকে অতিক্রমও করিয়াছেন। তাঁহার কতক মৌলিক উপমা ইতিপূর্ব্বে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহার মধ্যে কবিপ্রাণের স্বাধীনতা ঘোষণার অভিজ্ঞান আছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে কবি গতানুগতিক উপমা-উৎপ্রেক্ষার মধ্যে নূতন রসসৌন্দর্য্য স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। সেই সকল স্থানে কবি প্রাচীন কাব্যরীতির অনুসারক বটে, কিন্তু নবজীবনায়নের গৌরব তাঁহার। দু'একটি দৃষ্টান্ত :

গিরিবর-গরুঅ পয়োধর-পরশিত
গীম গজমোতিক হারা।

কামকম্বু-ভরি কনয়া শম্ভু পরি
ঢারত সুরধুনী ধারা ॥—(৩৪)

এই উপমাটির মধ্যে মৌলিকতা কোথায়, গতানুগতিকতা তো অল্প নয়। গিরিবরতুল্য পয়োধর, কম্বুতুল্য কণ্ঠ, শম্ভুতুল্য পয়োধর,—সব তো ব্যবহার-পরিচিত। তথাপি মুহূর্ত্তমধ্যে উপমাটি অন্তরে আনন্দসঞ্চার করে কেন, না আশ্চর্য্য উহার ব্যঞ্জনা। কণ্ঠে গজমোতির হার বক্ষের উপর দিয়া নামিয়াছে, এক মুহূর্ত্তে মনে যে চিত্র-কল্পনা জাগিল,—কনককান্তি শিব-মস্তকে সুরধুনীর ধারাভিষেক হইতেছে,—তাহা একেবারে মন লুটিয়া লয়। দেহবর্ণনার মধ্যে বিদেহ সত্তার আবির্ভাবে কবির যে কৃতিত্ব, তা যে-কোন প্রশংসার যোগ্য। এ যেন মধুযামিনীর প্রেয়সী প্রভাতে দেবীর বেশে উদিত হইল, যেন অকুণ্ঠিত সৌন্দর্য্যের সম্মুখে :

"পরক্ষণে ভূমি-পরে
জানু পাতি বসি, নির্ব্বাক বিস্ময়ভরে,
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি।"

আর একটি দৃষ্টান্ত লওয়া চলে; সেখানেও দুইটি যুগ্মবস্তুর কাব্যে সুপ্রচলিত অন্তরঙ্গতার সাহায্য গ্রহণ, কিন্তু কবি যে-ভাবে তাহার ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে কী অসীম আকৃতিই না ব্যক্ত হইয়াছে—

সরসিজ বিনু সর সর বিনু সরসিজ
কী সরসিজ বিনু সূরে।
যৌবন বিনু তন তন বিনু যৌবন
কী যৌবন পিয়় দূরে ॥ (৭৬৭)

এমন বহুতর দৃষ্টান্ত কবির কাব্যে পাওয়া যাইবে যেখানে ভাবানুষঙ্গের দিক হইতে কবি প্রাচীন কবি-ঐতিহ্যকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, অথচ তাঁহার স্বকীয় প্রতিভাও আপন স্বরূপে আপনি ধন্য। যথা: দুইটি পরিচিত উদ্ধৃতি—

লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিএ উড়ই ন পার ॥

এবং

চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারণি
অঞ্জন শোভন তায়।

জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল
অলিভরে উলটায়॥

বিদ্যাপতির প্রথম স্তরের কাব্য ও কবিধর্ম্ম সম্পর্কে আলোচনা একটু দীর্ঘ হইয়া পড়িল। এই আলোচনার মধ্যে,—সফল না হইলেও,—যে কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি তাহা বিদ্যাপতির বাঙ্‌-নির্ম্মিতির কৃতিত্ব। সাধারণতঃ আমাদের মতামত বড় প্রান্তিক হইয়া পড়ে। স্বীকার এবং অস্বীকারের দুই অন্তে আমাদের বিচারবুদ্ধি ছুটিয়া বেড়ায়। বিদ্যাপতি যখন মনকে টানে নাই, তখন তাঁহাকে নিতান্তই আলঙ্কারিক কবি বলিয়া নস্যাৎ করিবার একটা চেষ্টা অথবা অপচেষ্টা ইতস্ততঃ লক্ষ্য করিয়াছি। তাহার বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য ছিল। কাব্যসাধনার এক অধ্যায়ে অন্ততঃ কবি যে আলঙ্কারিকতার অনুবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা সত্য। কিন্তু অলঙ্কারপ্রিয়তা কেবল সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। অলঙ্কার এবং তদতিরিক্ত সৌন্দর্য্য কবি নিষ্কাশন করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার এই যুগের কাব্যে যে কালচারের ছাপ মুদ্রিত তাহা আড়ম্বর স্থূল নয়,—মার্জ্জিত-দ্যুতি, সুন্দর-রমণীয়। এই শ্রেণীর কাব্যে যতদূর কৃতিত্ব সম্ভব বিদ্যাপতি বোধকরি তাহার প্রায় শেষ সীমা পর্য্যন্ত পরিক্রমণ করিতে পারিয়াছেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিক রীতিবিলাসের ক্ষেত্রে প্রাচীন কবি 'কবিরাজ', 'সুবন্ধু' ও 'বাণভট্টকে' চতুর্থ-রহিত নির্দ্দেশ করিয়া সর্ব্বশেষ কথা কহিবার একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছেন। তাঁহাদের সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য উত্তরকালের বিদ্যাপতির কবি-কৃতি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। বিদ্যাপতি তৃতীয়েন পাদপূরণে চতুর্থ হইয়া সগৌরবে বিরাজ করিতেছেন।

(২)

বিদ্যাপতির কাব্য রীতি-মূলকতা অথবা রীতি-সর্ব্বস্বতার মধ্যে থামিয়া ছিল না। তাঁহার কাব্যসাধনার এক গভীরতর এবং শ্রেষ্ঠতর দিক ছিল। সেই কাব্য-পর্য্যায়ই বর্ত্তমানে আমাদের আলোচ্য। তৎপূর্ব্বে কয়েকটি সাধারণ কথা বলিয়া একটু ভূমিকা করিব। আলোচনার আরম্ভে ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাপতিকে তাঁহার স্ব-যুগের কবি সার্ব্বভৌম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। তাহার স্বপক্ষে কয়েকটা যুক্তিও এই প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িবে।

বিদ্যাপতির সমগ্র কাব্য-সম্পদ প্রত্যক্ষ করিয়া সে ধারণা জাগিবে—অন্ততঃ আমার যাহা জাগিয়াছে, বিদ্যাপতি যত বড় কবিই হউন, কাব্যসাধনা তাঁহার জীবন-

সাধনার অংশ-বিশেষ মাত্র, কবি-জীবন তাঁহার সমগ্র জীবন নয়। একটি বৃহত্তর ব্যক্তিত্ব, একটি বিরাটতর চরিত্রের অন্যতম দিক ঐ কাব্যসাধনা—হয়ত শ্রেষ্ঠ দিক। কবিগণের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য বুঝাইতে গিয়া আমরা প্রায়শঃ যে শব্দটি ব্যবহার করি, সেই "কবি-ব্যক্তিত্ব" কথাটি সেই যুগে বিদ্যাপতির প্রতি যেরূপ সুপ্রযুক্ত, সেরূপ অন্য কাহারো পক্ষে নয়। আমি বিদ্যাপতির সমযুগ বা অব্যবহিত পরযুগের যে শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস, তাঁহার গৌরব এই মন্তব্য দ্বারা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করিতেছি না। সামান্য মন্তব্যে ক্ষুণ্ণ-গৌরব হইবার কবি চণ্ডীদাস নহেন। তথাপি কবির সে স্বরূপ-স্বাতন্ত্র্য, যাহা কাব্যের একটি নির্দিষ্ট form-সৃষ্টির উপর নির্ভর করে, তাহা বিদ্যাপতিতে সমধিক। বিদ্যাপতির কাব্য তাঁহার নামাঙ্কিত না থাকিলেও তাঁহারই বলিয়া যেমন অসংশয় হওয়া যায়, চণ্ডীদাসের তেমন নয়। চণ্ডীদাসের একটি শ্রেষ্ঠপদ, যে কোন ভাব-গভীর শ্রেষ্ঠ কবির হইতে পারে, তাঁহার কাব্যের নির্বিশেষত্বই তাঁহার বিশেষত্ব। কিন্তু এই লক্ষণমাত্র-সহায়ে একজন কবির কাব্য না জানিয়া চেনা শক্ত। কিন্তু বিদ্যাপতির ব্যক্তিত্ব বিদ্যাপতির কাব্যে এমনই দীপ্তিমান যে চিনিতে দ্বিধা হয় না। এবং কবির এই যে কবি-ব্যক্তিত্ব, তাহা একটি জীবন-ব্যক্তিত্বের অংশস্বরূপ তাহাও অনুভবে ধরা দেয়। বিদ্যাপতির চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে এক বিশেষ যুগে, বিশেষ সমাজে ও বিশেষ প্রতিবেশে। সেই সমাজ এবং সেই যুগ তাহার যত-কিছু শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিদ্যাপতির মধ্যে ধরা পড়িয়াছিল, ইহাই আমার বিশ্বাস। অর্থাৎ বিদ্যাপতি সেই যুগের প্রতিনিধি-পুরুষ। আমার এই বিশ্বাসের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি তাঁহার কবি-সাধনা ও কবি-ভাবনার অন্তরঙ্গ আভ্যন্তর সাক্ষ্য হইতে এবং বাস্তব জীবন কাহিনীর সামান্য প্রাপ্তব্য বিবরণ মারফৎ। বিদ্যাপতি রাজসভার কবি ইহা বলিলে তাঁহার সম্বন্ধে সবটুকু বলিয়া ওঠা হয় না, ভারতচন্দ্রও রাজসভার কবি। রাজসভার বাক্ ও বুদ্ধির চতুরালি ভারতচন্দ্রেও রূপ ধরিয়াছে ভাল। বিদ্যাপতি চতুর কবি সত্য, কিন্তু তাঁহার বৈদগ্ধ্যের উৎস আরো গভীরে। তিনি রাজসভা তো বটেই, নিজ অন্তঃপ্রবৃত্তি এবং রুচি-সুখের মুখ চাহিয়াও ঐ সুরে কাব্য রচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার কাব্যে যে বৈদগ্ধ্যের সুর, তাহা নিছক কোনো বহিরঙ্গ প্রেরণাজনিত নহে, তাহা তাঁহারই চরিত্রের অনিবার্য্য উদ্ভব। বিদ্যাপতির জীবনকাহিনী সেই সাক্ষ্যই দেয়। তিনি মহা অভিজাত পরিবারের সন্তান; তাঁহারা অনেক পুরুষ ধরিয়া মিথিলার রাজপরিবারে অমাত্য-সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট। এমন পরিবারের সন্তান হইয়া, জন্ম ও পরিবেশ-প্রভাবে সে-যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কালচারের উত্তরাধিকার গ্রহণ ও অঙ্গীকার করিয়া, বিদ্যাপতির যে চরিত্র পূর্ণায়ত হইল, তাহা স্বভাবতঃই আবেগ-আকুল

3906

ভক্ত-ভাবুকের চরিত্র নয়। তাহার মধ্যে জ্ঞানের ও বুদ্ধির পাকা রঙ ধরিয়া গিয়াছে। ইহাই অবলম্বন করিয়া তিনি কবিজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। আবার বংশপ্রভাবে কবির জীবনে একটা ব্যাপকতার অবসর ঘটিয়াছিল। বিদ্যাপতি স্বয়ং উত্তর জীবনে যে মতাবলম্বী হউন না কেন (এবং সে-সম্পর্কে স্থির মীমাংসা দুরূহ) তাঁহার বংশ যে শিব-শক্তি মতাবলম্বী তাহাতে সন্দেহ নাই। শিব ও শক্তির প্রতি অনুরাগ তাঁহার বংশজনিত; শিক্ষা দীক্ষা ও প্রতিবেশ-প্রভাবে তিনি বহু বিচিত্র জীবনরসের আস্বাদনও করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মধ্যে সে-যুগে বিরল একটি ঐশ্বর্য্য দেখা যায়—ব্যাপকতা। কাব্যোৎকর্ষের পক্ষে গভীরতার সঙ্গে ব্যাপকতার মাহাত্ম্যও অনস্বীকার্য্য। একটি কবিতা বা পদের ক্ষেত্রে এই ব্যাপকতা সুরের উদারতা ও প্রসারতায় নির্ভর করে সত্য, কিন্তু ঐ ব্যাপকতাকে বুঝিয়া লইতে হয় কবি-প্রচেষ্টার বৈচিত্র্য ও বিস্তারে। বিদ্যাপতির মত বহুব্যাপক কাব্যরীতি ও কাব্য-বস্তু-ব্যবহারী কবি সে-যুগে আর কে? তিনি রাধাকৃষ্ণের পদাবলী রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার কবিখ্যাতি ইহার জন্যই। তথাপি বিদ্যাপতিকে বুঝিতে হইলে তথ্য হিসাবেও অন্ততঃ তাঁহার অন্যতর কাব্য-প্রয়াসের পরিচয় প্রয়োজন। বিদ্যাপতি শিববন্দনা রচনা করিয়াছেন, মহামায়ার ছন্দে অর্চ্চনা করিয়াছেন, বারমাস্যার প্রকৃতি কাব্য ও নিছক বসন্তের বর্ণনা লিখিয়াছেন। একটি সম্পূর্ণ লৌকিক ভাষা অবলম্বনে এক যুগের বাস্তব সমাজের রাষ্ট্রের পরিচয় রাখিয়াছেন, এবং কি করেন নাই। ধর্ম্ম, সমাজবিধি, পূজা-বিধি অবলম্বনে বহুতর সংস্কৃত গ্রন্থ রচনাতেও তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। আবার ছিল তাঁহার সুন্দর দীর্ঘায়ত দেহচ্ছন্দ। তাঁহাকে সে-যুগের কালচারের প্রতিভূ বলিব না! এমনই এক চরিত্র যখন কাব্যরচনা করিতে বসে তখন অনিবার্য্যভাবে কাব্যে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ছায়াপাত ঘটিয়া যায়। বিদ্যাপতির প্রথম স্তরের কাব্যে তাঁহার এই ব্যক্তিত্ব-পরিচয় বিস্তৃতভাবেই গ্রহণ করিয়াছি। form-আনুগত্যই সেই ব্যক্তিত্ব। সে-যুগে লিরিক আত্ম-উচ্ছ্বাসের রীতি ছিল না। সুতরাং কবির ব্যক্তিসত্তার পরিচয় তাঁহার কাব্যের বিশিষ্ট রীতি-অনুসৃতির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকিত। বিদ্যাপতি তাঁহার রূপ-প্রাণ পদসমূহে আপনাকে যথাসম্ভব সংবরণ করিয়া যে তন্ময় কবিদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, সেখানে তাঁহার সেই আত্মসংবরণই আত্ম-ব্যক্তিত্বের অভিজ্ঞান। ঐ যে আত্মাভিমান-বর্জ্জিত রূপ-বিভোরতা উহাই বিদ্যাপতিকে চিনাইয়া দেয়।

দ্বিতীয় স্তরে কবির রচনায় গভীরতার ছায়া নামিল। উল্লাস-উচ্ছলতার দিবা-লোকের উপর সঘন-সজল প্রচ্ছায় টানিয়া বেদনার অন্তর-লক্ষ্মী বিদ্যাপতির কাব্য-সৃষ্টির উপর নামিয়া আসিলেন। বিদ্যাপতি রূপ দেখিয়া মজিয়াছিলেন, এইবার রসে

মরিলেন। ভুল হইল বুঝি, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "অমৃতের সাগরে ডুবলে মরণের ভয় নেই।" রস-সাগরে ডুব দিয়া বিদ্যাপতির নবজন্ম ঘটিল। তখন যে-স্বরে ও সুরে গান ধরিলেন তাহা মানব জীবনের অনাদি হৃদয়-উৎস হইতে উত্থিত অনন্ত হৃদয়-রাগিনী। চিরন্তন ধ্বনি-মূর্চ্ছনাকে বিদ্যাপতি তাঁহার কবি-প্রাণের ছিদ্রপথে আহ্বান করিয়া, অনুভবের আলোছায়া পথে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আবার সেই সুর-বন্যাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। চিরন্তন মানবের জীবন-বাণী বহন করিয়াছেন যে বিদ্যাপতি, তিনি নিত্যযুগের কবি, চণ্ডীদাসও তাই। তবে পার্থক্য কোথা? আছে। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মত নির্ব্বিশেষকে অবিকৃত সত্তায় ফুটাইতে পারেন নাই, তাঁহার নির্ব্বিশেষ বিশেষের মধ্য দিয়াই রূপ ধরিয়াছে। তাহাই বিদ্যাপতির ব্যক্তিত্ব। আবার শ্রীরামকৃষ্ণের উপমাই ধরি; তিনি রহস্যচ্ছলে বলিতেছেন,—"কানার ঈশ্বরদর্শনে মুক্তি হোলো, কিন্তু কানা চোখটা রয়ে গেল।" কথাটি গভীর। বিদ্যাপতি নিখিল প্রাণের বেদন-মহোৎসবে যতই মাতিয়া উঠুন, নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই; ভাবের সমুদ্রে তিনি ঝাঁপ দিলেন না, তরী ভাসাইলেন। ঐ form-এর কঠোর বন্ধনই তরীর বহিরবয়ব। "যদি গাহন করিতে চাও এসো নেমে এসো হেথা গহন তলে"—সে কবি চণ্ডীদাস।

শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যাপতির এই যে কবি-আমিত্বের রক্ষা, ইহা তাঁহার কাব্যের উৎকর্ষ ও অনুৎকর্ষের কতদূর সহায়ক হইয়াছে, সে-প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক এবং চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের এই শ্রেণীর পদের সঙ্গে তুলনার ইচ্ছাও জাগিবে। সে প্রসঙ্গ আসিবার পূর্ব্বে এই শ্রেণীর পদের ক্রম-পারম্পর্য্য একবার নিরীক্ষণ করিব।

অভিসার পর্য্যায় হইতে বিদ্যাপতির কাব্যে রীতি-অতিরিক্ত রস বা ভাবের রঙ ধরিয়াছে। তথাপি এই পর্য্যায়েও সম্পূর্ণ আধুনিকতার প্রভাব কবি এড়াইতে পারেন নাই। অধ্যাত্মভাবদ্যোতক পদের পাশাপাশি নিতান্ত লৌকিক সুরের পদও আছে। অবশ্য এই লৌকিক স্থূলতার প্রভাব কবি কোনদিনই অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বিরহের পদে অত্যুৎকৃষ্ট ভাব ও রূপসৃষ্টির পরিচয় দিয়া যখন তিনি জগৎ কবিসভার সভাসদ, তখন তাহারই মধ্যে এমন দু'একটি পদ রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন যাহা তাঁহার মর্য্যাদাকে অবমানিত করিবে। তবে একটা জিনিষ স্বীকার্য্য, ঐ সকল নিম্নস্তরের পদের রচনাকাল আমাদের জ্ঞাত নয়। এবং কবি জীবনের এক এক স্তরে যে এক এক পর্য্যায়ের কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা না হওয়াই সম্ভব। হয়ত নিম্ন-স্তরের পদগুলি অপরিণত বয়সের অপরিপুষ্ট কবি-প্রতিভার স্মারক, কে বলিতে পারে? যাহা হউক অভিসারের পদে আমরা উভয় শ্রেণী ও সুরের পদই প্রায় সমান সমান

পাইতেছি—লৌকিক ও লোকোত্তরতার ইঙ্গিতবাহী। অভিসারের পদে লৌকিকতা যুগ বিচারে এবং কবি-ধর্ম্ম বিচারে নিতান্ত অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে কবি-চিত্তের অনুভবশালিতা মানিতে হইলে—অভিসারের দুর্জ্জয় আত্মবিশ্বাস, সুদুঃসহ কৃচ্ছ্র সাধনা, সদাশঙ্কিত অথচ অনুরাগমত্ত পদক্ষেপ—এ-সকলই একপ্রকার উচ্চতর জগতে মনকে উঠাইয়া দিবে। আধ্যাত্মিকতার জন্য কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া আকুল হইবার প্রয়োজন নাই, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠত্ব যেখানে,—সেই সাধন-দহনে নির্ম্মল আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের বাঁধন মানুষ অতিক্রম করিয়া যায়ই। তাই জগতের শ্রেষ্ঠ প্রণয়কাব্য, যাহা মিলনে নয় বিরহে লগ্ন, তাহা মানুষের অধ্যাত্মচেতনাকেই পরিতৃপ্ত করে। "তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল"—ইহা মাথায় করিয়া কেহ যদি পথে বাহির হয় প্রিয় মিলনের আকাঙ্ক্ষায়, তবে সে প্রিয়কেই দেবতা করিয়া তোলে, সেই পরম পুরুষের আশ্বাস তাহার উপর উদ্যত হইয়া থাকে—"যে যেভাবে আমাকে ভজনা করে সে সেই ভাবেই আমাকে লাভ করে।" ক্ষুরধারার ন্যায় নিশিত ও দুর্গম পথে যে অভিসার করে সে কেবল পথকেই নয়, আপনাকেও অতিক্রম করিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, যেখানে মানুষ ভালবাসে, সাধনা করে, সেখানে সে আপনাকে ছাড়াইয়া যায়, সীমার মধ্যে অসীমের স্পর্শ লাভ করে, অন্তমণিতে অনন্ত সূর্য্যের জ্যোতিঃপ্রকাশ উপলব্ধি করে। বিদ্যাপতির অভিসারের পদে সেই অবশ্যম্ভাবী অধ্যাত্মব্যঞ্জনার ইঙ্গিতই পাইতেছি।

বরিস পয়োধর ধরণী বারি ভর
রয়নী মহাভয় ভীমা।
তইও চললি ধনী তুঅ গুণ মনে গুণি
তসু সাহস নাহি সীমা॥
দেখি ভবন ভিতি লিখল ভুজগপতি
জসু মনে পরম তরাসে।
সে সুবদনী করে ঝপইত ফণীমণি
বিহুসি আইলি তুঅ পাশে॥
নিঅ পহুঁ পরিহরি সঁতরি বিখম নরি
অঁগিরি মহাকুল গারী।
তুঅ অনুরাগ মধুর মদে মাতলি
কিছু ন গুণল বরনারী॥ (৫৩৫)

অথবা—

গুরুজন নয়ন অন্ধ করি আওল
বাঁধব তিমির বিসেখ।
তুঅ উর ফুরত বাম কুচ লোচন
বহু মঙ্গল করি লেখ॥
কুলবতী ধরম করম ভয় অব সব
গুরু-মন্দির চলু রাখি। (২৩৮)

বা একটি সন্দেহজনক পদ—

চকিত চকিত কত বেরি বিলোকই
গুরুজন ভবন-দুয়ার॥
অতি ভয় লাজে সঘন তনু কাঁপই
কাঁপই নীল নিচোল।
কত কত মনহি মনোরথ উপজত
মনসিন্ধু মনহি হিলোল॥ (২৫৩)

কিন্তু এমন অংশও বিরল নয়—

লিহলে উধলল অবইত ভার।
ভেটলে মেটত অছ পরকার॥ (২৪৭)

অভিসারের পথে প্রসাধনের অনাবশ্যকতা বর্ণনা করিতে এই ধরণের স্থূল উক্তি সখীর মুখে বসান হইয়াছে। তবু একথা সত্য উৎকর্ষের দিক হইতে অভিসারের পদে গোবিন্দদাস ছাড়া (দু'একটি পদে রায়শেখর, যথা,—"গগনে অব ঘন মেহ দারুণ .....") বিদ্যাপতির জুড়ি নাই বৈষ্ণব সাহিত্যে। অবশ্য গোবিন্দদাস অপেক্ষা এ বিষয়ে তাঁহার স্থান অনেক নিম্নে। শুধু তাঁহার কেন, অন্য কোন বৈষ্ণব কবি অভিসারের পদ-পর্য্যায়ে গোবিন্দদাসের সমকক্ষতা তো দূরের কথা, নিকটেই উপস্থিত হইতে পারেন নাই। "মাধব কি কহব দৈব বিপাক", "কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল", "মাথহি তপন তপত পথ বালুক", "কুলমরিযাদ কপাট উদঘাটলু", "মন্দির বাহির কঠিন কপাট" ইত্যাদি পদের সদৃশ বৈষ্ণব সাহিত্যে নাই, অবশ্য অভিসার পদের দিক হইতে।

অভিসারের পর বিদ্যাপতির বিরহের পদ। এই পর্য্যায়ে বিদ্যাপতির কবিশক্তি শ্রেষ্ঠত্বের সীমা-লগ্ন বলিতে হয়। কী অপূর্ব্ব সব পদই না পাইয়াছি। দু'-একটি তুলিয়া দেওয়া যাক:

১। অঙ্কুর তপন- তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ঈ নব যৌবন বিরহে গমায়ব
কি করব সো পিয়া-লেহে॥
হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥ ইত্যাদি

২। এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
ঈ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ্ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈসে গমায়ব
হরি বিনু দিন রাতিয়া॥

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মধাঈ।···

৪। সরসিজ বিনু সর সর বিনু সরসিজ··

৫। চীর চন্দন উরে হার ন দেলা।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা॥

পিয়াক গরবে হাম কাহুক ন গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কে কি না কহলা॥…

৬। সজনি কো কহ আওব মধাঈ।
বিরহ-পয়োধি পার কিএ পাওব
মঝু মনে নাহি পাতিয়াই॥
এখন তখন করি দিবস গোঙায়লুঁ
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখে গোঙায়লুঁ
ছোড়লুঁ জীবনক আশা॥

ইহাই যথেষ্ট। উৎকৃষ্ট কবি-ভাবনার পূর্ণায়ত রস-রূপের সন্ধান এখানে পাওয়া যাইবে। যে কয়টি পদের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রথম চারিটি এবং শেষ দুইটি পদের ভিতর একটা ভাবরূপের সূক্ষ্ম পার্থক্য মনে হয় দৃষ্টিগোচর হইবে। প্রথম পদগুলিতে কবি-চিত্ত যে আবেগে স্পন্দিত, তাহা রূপ-নির্ম্মাণের অনুপম কৌশলের দিকেই বেশী ঝুঁকিয়াছে। কিন্তু শেষ দুইটি পদে কবি যেন "আমার গান ছেড়েছে তার সকল অলঙ্কার" বলিয়া ভাব-উৎকণ্ঠাকে নিরলঙ্কারে প্রকাশ করিতেই ব্যস্ত। প্রথম পদগুলি ব্যঞ্জনা ধ্বনি এবং অলঙ্কারের সৌষ্ঠবের মধ্য দিয়া যে কাব্যশ্রী লাভ করিয়াছে তাহার মধ্যে একটা ঐশ্বর্য্য ও গৌরব আছে। সে-গৌরব কেবল কাব্যদেহে নয়, সে-ঐশ্বর্য্য কেবল বর্ণনা-ভঙ্গিতে নয়, তাহা ভাব এবং আবেগ-সত্তাতেও। অর্থাৎ রাধিকার ঐ যে বিরহ, উহা আমাদের বেদনা দেয় না,—আনন্দ দেয়, মনে একটা পরমোল্লাসের ভাব জাগায়। কারণ এ বিরহ-বেদনাতেও একটা ঐশ্বর্য্য আছে, উল্লাস আছে। বিরহ এবং বিচ্ছেদ মিলন-সুখ-মন্থর সাধারণ দিনগুলির মর্ম্মমূলে একটি বিপর্য্যয় আনিয়া দিয়াছে। মর্ম্মে লাগিয়াছে দোলা, প্রাণে লাগিয়াছে কম্পন, সমস্ত সত্তা ব্যাপিয়া এক অপূর্ব্ব রসোন্মাদনার হিল্লোল বহিয়া যাইতেছে। ইহা বাহ্যতঃ বেদনার্ত্তির রূপ ধরিলেও কোথায় যেন একটা আনন্দ-সাগরের কল্লোল ধ্বনিত হইয়া ওঠে। তাই এইসকল পদে নিভৃত রাতের ব্যথাকাতর অর্দ্ধস্ফুট মৃদুভাষ নহে, হৃদয়ের বেদন-মহোৎসবের বাণী-বন্দনা একেবারে নাভিদেশ হইতে গর গর ধ্বনিতে উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে। 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর' পদটিতে তাহার নিদর্শন আছে। 'অঙ্কুর তপন-তাপে যদি জারব' পদটিতেও একই সুর। রাধিকা বিরহের বেদনাকে প্রকাশ করিতে যে চরম অলঙ্কৃত বাক্যকে আশ্রয়

করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার বিরহ-প্রকৃতি বোঝা যায়। ঐ পদটিতে অলঙ্কার নির্ব্বাচনের যাথার্থ্যে এবং সেই অলঙ্কারের মধ্যে প্রাণোত্তাপ সঞ্চারিত করিয়া দেওয়াতেই কৃতিত্ব। ইঁহার তুলনায় "এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর" পদটি অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। যে বেদনা-রূপায়ণ এখানে, তাহা এমনই রূপ-সার্থক যে, মনে এক অসাধারণ উন্মাদনার সঞ্চার করে। তথাপি কবিতাটির অনুভূতি সর্ব্বকালিক নয়। এক বিশেষ মুহূর্ত্তে বিশেষ পরিবেশে এক বিশেষ মানুষের যে চিত্ত-চাঞ্চল্য, তাহাই সুরে ও ছন্দে, ভাবে ও ভাবনায় আকারিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বুক-নিঙড়ানো, প্রাণ-নিড়ানো যন্ত্রণা নাই, তৎপরিবর্ত্তে একপ্রকার রসাবেশ আছে। আত্ম-স্ফূর্ত্তির জন্য মিলনের মদির মুহূর্ত্ত হইতে বিরহের এই মদনার্ত্ত প্রহরের প্রয়োজন বেশী। "ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া" এমন সময়ে মিলনের আশ্লেষমুগ্ধ রভস-লীলা একান্তই স্থূল হইয়া আসিত নাকি? কবি তাহা চান না। মানব-হৃদয়ের একটি বেদনাকে চরম ঐশ্বর্য্যরূপ দান করিবার জন্য যে মত্ত বর্ষাদিনের প্রয়োজন, কবি তাহাকেই গ্রহণ করিয়াছেন; এ বর্ষা 'অবিরল ঝর ঝর জলধার' নয়, নায়িকার চোখে বর্ষাধারা নামে নাই, তাহার হৃদয়ে বর্ষামঙ্গল হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলিতেছেন: "মেঘদূত যেদিন লেখা হয়েছিল, সেদিন পাহাড়ের উপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সেদিনকার নববর্ষায় আকাশে বাতাসে চলার কথাটাই ছিল বড়।......তাই মেঘদূতে যে বিরহ, সে ঘরে বসে থাকার বিরহ নয়, সে উড়ে চলে যাওয়ার বিরহ। তাই তাতে দুঃখের ভার নেই বললেই হয়, এমন কি তাতে মুক্তির আনন্দ আছে। প্রথম বর্ষাধারায় সে পৃথিবীকে উচ্ছল ঝরণায়, উদ্‌বেল নদীস্রোতে, মুখরিত বনবীথিকায়, সর্ব্বত্র জাগিয়ে তুলেছে। সেই পৃথিবীর বিপুল জাগরণের সুরে লয়ে যক্ষের বেদনা মন্দাক্রান্তা ছন্দে নৃত্য করতে করতে চলেছে। মিলনের দিনে মনের সামনে এতবড় বিচিত্র পৃথিবীর ভূমিকা ছিল না। ছোট তার বাসকক্ষ, নিভৃত, কিন্তু বিচ্ছেদ পেয়েছে ছাড়া নদী-গিরি-অরণ্য শ্রেণীর মধ্যে। মেঘদূতে তাই কান্না নেই, উল্লাস।"

উদ্ধৃতিটি একটু দীর্ঘ হইল, তথাপি ইহাকেই বর্ত্তমান পদের বিরহানুভূতির ব্যাখ্যা হিসাবে নির্দ্দেশ করা যায় না কি? রবীন্দ্রনাথ নববর্ষায় মর্ত্ত্য ও মর্ত্ত্যবাসী মানুষের যে মুক্তির কথা বলিয়াছেন, সেই মুক্তিই বিদ্যাপতির 'মাহ ভাদরের' কাব্যে। প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই তাহার সূচনা। 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর'—এ ভাষায় গভীরতম বেদনার বাণী কেহ প্রকাশ করে? এ তো দুঃখের আস্ফালন। আনন্দের দিনে যে কথা সত্য—'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর'—বিরহের কূলহীন দুঃখের দিনে উহাকে

পরিবর্ত্তিত করিয়া বলা চলে না—"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।" সখিরে, আমার দুঃখের সীমা পরিসীমা নাই—ইহা যদি কেহ পদের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে বলিয়া বসে, তবে তাহার দুঃখের যন্ত্রণার কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু দুঃখের ঐশ্বর্য্যের কথা! আহা কি অপূর্ব্ব তাহার রূপ। ঐ "কুলিশ শত শত পাত মোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া", ঐ "মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া"—এ বর্ণনায় বেদনা কোথা, কেবল ময়ূর নয়, রাধিকার চিত্তও নাচিতেছে—"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে।"

(লক্ষণীয়—'এ সখি হামারি' পদটিকে আমি বিদ্যাপতির বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি—গতানুগতিক পূর্ব্বধারণানুসরণই তাহার কারণ বলাই বাহুল্য। কিন্তু তদতিরিক্ত আর একটু দাবী—কবিতার আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের উল্লেখ করা যায় না কি? এমন পদ বিদ্যাপতির ছাড়া অন্য এক অল্পখ্যাত কবির দ্বারা রচিত হওয়া সম্ভব নয়, সে যুক্তি যদি বাদও দিই তথাপি যিনি 'আনন্দ ওর' লিখিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে 'দুখের ওর' লেখাই স্বাভাবিক)।

কিন্তু বিদ্যাপতির বিরহ কেবল গৌরবানুভূতিতে নয়—তাহার নিভৃততম রূপও আছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত 'সজনি কো কহ আওব মধাঈ', ও 'চীর চন্দন উরে হার ন দেলা' পদদ্বয়ে প্রিয়-বিরহিত নারীর 'অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ ক্রন্দন' একেবারে আকুল হইয়া উঠিয়াছে। পদ দুটিতে অলঙ্কার কোথা? কী আক্ষেপ! কী আর্ত্তি! যাহার সহিত মিলনে চীর-চন্দন-হারের প্রভেদটুকুও রাখি নাই, আজ তাহার ও আমার মধ্যে নদী গিরির ব্যবধান তরঙ্গিত—সমুদ্ধত। 'সজনি কো কহ আওব মধাঈ' পদটিতেও কবি-বাণী যথাসম্ভব নিরলঙ্কার। বিরহকে 'পয়োধি' ইত্যাদি বলার মধ্যে যেটুকু অলঙ্কার তাহা সীমাহীন দুঃখের বাণীরূপ দান করিতে একেবারে অপরিহার্য্য। অকূল অনন্ত প্রমত্ত কৃষ্ণ-সাগরের কূলে রাধারাণী বসিয়া আছেন। সে সাগর বিরহ-সাগর। তাহারই পরপারে কোন্ সুদূরে তাঁহার দয়িত অদৃশ্য হইয়া আছেন, মধ্যে বিচ্ছেদের তরঙ্গিত লবণাম্বুরাশি- রাধিকা তীরে বসিয়া হাহাকার করিতেছেন—'বিরহ পয়োধি পার কি এ পাওব'। কিন্তু রাধার দয়িত কি সমুদ্রের পরপারে, না ঐ সমুদ্রই তিনি—গভীর গহন বিপুল বিথর শ্যাম-সাগর। রাধিকা চরম মিলনের দিনেও তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই—'জনম অবধি হাম রূপ নেহারল নয়ন না তিরপিত ভেল…লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল তব হিয়া জুড়ন না গেল'। যিনি অনন্ত তিনিই যে অন্তরতম, যিনি অসীম তিনিই যে দয়িত—তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ মিলন হয় কি? অথবা প্রিয়ের মধ্যে অসীমত্বের উপলব্ধির নামই বিরহ। রাধিকা সেদিন কাঁদিয়াছেন, লক্ষ যুগ পূর্ব্বেও

কাঁদিয়াছেন, আজিকে কাঁদিতেছেন, আগামীকালেও কাঁদিবেন। "এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটীরে" সর্ব্বযুগের সর্ব্বশেষ ও সর্ব্ব-আধুনিক কথা।

বিদ্যাপতির বিরহ-পদ বর্ণনাপ্রসঙ্গে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের বিরহ-পদের কথা মনে আসে। চণ্ডীদাস নাকি দুঃখের কবি। সর্ব্বশেষ দুঃখের কথায় নাকি তাঁহারই অধিকার। সত্যই। চণ্ডীদাসে উল্লাস নাই, উচ্ছলতা নাই; মেঘশ্যামল দিনের সজল ছায়ার সঞ্চরণ, বর্ষারাতের অশ্রুবর্ষণ চণ্ডীদাসের কাব্যে—এবং তাঁহারই অনুগামী, ভাবানুগামী হিসাবে জ্ঞানদাসের পদও কবিপ্রাণের নিভৃত আকুতির বাণীই বহিয়া আনে। পূর্ব্বরাগ হইতে চণ্ডীদাসের বিরহ সুরু হইয়াছে, আক্ষেপানুরাগে তাহারই বৃদ্ধি,—পর্য্যায়ের পর পর্য্যায়ে অগ্রসর হইয়া চণ্ডীদাস ভাবসম্মিলনের আনন্দ-মুহূর্ত্তে বিচ্ছেদের অন্তিমতম বেদনাকে প্রকাশ করিয়া দিলেন। এমন ভাবে প্রকাশ করা—এ বোধকরি আর কোন বৈষ্ণব কবির পক্ষেই সম্ভব নয়-

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥···
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল ॥

করুণ! মর্ম্মস্পর্শী! কোন বিশেষণই এই চারিটি পঙ্‌ক্তির অনুভূতিকে প্রকাশ করিতে পারিবে না। যিনি সে বেদনা জানিয়াছেন, তিনিই কেবল এমন করিয়া জানাইতে পারেন। এ দ্রষ্টার বেদনাঙ্কন নয়; এখানে আপন হৃদয়কেই, করুণ ব্যথিত স্পন্দিত হৃৎপিণ্ডকেই, কবি একেবারে অনাবৃত করিয়াছেন, বেদনা লইয়া তিনি কাব্য করেন নাই। কিন্তু বিদ্যাপতি এতদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তিনি রাধিকার বেদনাকে অনুভব করিয়াছেন, অতি গভীর ভাবেই হৃদয়গত করিয়াছেন, কিন্তু সে বেদনা রাধিকারই, বিদ্যাপতির নয়। 'বিষয়ের' সঙ্গে আর্টিস্টের একটা দূরত্ব বজায় আছেই। চণ্ডীদাসের সে দূরত্বটুকু নাই। এই দিক দিয়া বিদ্যাপতি অনেক বেশী সচেতন শিল্পী। তাঁহার সৌন্দর্য্য বা ভাবোপভোগে আত্মবিভোরতা থাকিলেও (অধিকাংশ ক্ষেত্রে রূপ-বিভোরতা) আত্মবিস্মৃতি নাই। চণ্ডীদাস কিন্তু একেবারেই আত্মবিস্মৃত কবি। তাই চণ্ডীদাসের কাব্যের আবেদন মরমীর নিকট যতটা, সর্ব্বত্র সেরূপ নয়। যাঁহার প্রাণ আছে, অনুভব আছে, যিনি সেই উপলব্ধির আশীর্ব্বাদ অন্ততঃ কিয়দংশও অন্তরে লাভ করিয়াছেন তাঁহার নিকট চণ্ডীদাসের তুল্য কবি নাই। অথবা তাহাও সম্পূর্ণ সত্য নয়; মানুষের জীবনের কোথাও না কোথাও একটা গভীরতর অন্তরতর স্থান আছে। সেখানে ছুঁইলে প্রাণ সাড়া দিবেই। চণ্ডীদাসের পদের একটি পঙ্‌ক্তি হয়ত সেই

'মরম'-কে স্পর্শ করিয়া গেল। তখন আর তাঁহার সম্পূর্ণ কাব্যের প্রয়োজন নাই, সেই বিচ্ছিন্ন কলিটিই মনের মধ্যে সুর হইয়া সঞ্চরণ করে, বারবার গুন্‌গুন্‌ করিয়াও আশ মেটে না—"দুখিনীর দিন দুখেতে গেল, মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল।" চণ্ডীদাসের কাব্যে তাই শিল্পচেতনার পরিতৃপ্তি নাই; সমগ্রতঃ বিচার করিলে তাঁহার অধিকাংশ পদই রূপসম্পূর্ণ নয়। এমনও বলা যায়, তাঁহার পদ অরূপের রূপাভাস। তাহা একটা নির্ব্বিশেষ অনুভূতিকে বিশেষের মধ্যে—বাণীর মধ্যে—একবার হয়ত স্পর্শ করিল, তারপরেই উধাও! ভাবুক, মরমী,—এবং জীবনের বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত্তে সব মানুষই ভাবুক—চণ্ডীদাসের মুগ্ধ স্তুতি রচনা করে, কারণ চণ্ডীদাস তাঁহার কাব্যের রূপে আমাদের মুগ্ধ রাখেন নাই, ভাবে মুক্ত করিয়াছেন। চণ্ডীদাস সেই কবি—রামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন "আগুণ জ্বেলে দিয়ে গেছে, এখন রইল আর গেল।"

এখন যে-প্রশ্নটি বড় হইয়া উঠিতেছে, তাহা হইল, সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিসের মূল্য বেশী, এই প্রকাশ-সৌষ্ঠব-পন্থা, না গভীরতর অনুভূতিকে বাণীসুষমার দিকে দৃকপাত না করিয়া আভাসিত করিবার প্রচেষ্টা? একথা সত্য, সাধারণ ভাবে কাব্য বলিতে আমরা যা বুঝি, আমাদের শিল্পবোধ মুখ্যতঃ যে প্রতীতির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা বিদ্যাপতির রূপ-সুন্দর কাব্যেই অধিক তৃপ্তিলাভ করে। বিদ্যাপতি সৌন্দর্য্য-সাধনা বলিতে যা বুঝি, তাহাই করিয়াছেন। এ বস্তুটি চণ্ডীদাসের কাব্যে নাই। বিদ্যাপতির কাব্যে সেখানে সমগ্র পদটি ব্যাপ্ত করিয়া কবির সুন্দর-বিগ্রহ রূপময় হইয়াছে, সেখানে চণ্ডীদাসের কাব্যে চকিত রূপের একটি ঝলক ("চলে নীল সাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর),—কিন্তু তাহারই রূপোৎকর্ষ এরূপ যে, চণ্ডীদাসকে মহাকবি বলিতে বাধে না। তথাপি চণ্ডীদাসে সর্ব্বাঙ্গীণ বাণীসুষমার পরিচয় নাই। বিদ্যাপতি আজীবন সৌন্দর্য্যচর্চ্চা করিয়া এই বস্তুটি লাভ করিয়াছিলেন; সে কারণে যেখানে তাঁহার পদের ভাববস্তু নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, সেখানেও পাঠক একপ্রকার আনন্দানুভব করিতে পারে। এবং দিব্য আবেগের মুহূর্ত্তে এই প্রকাশ-প্রতিভা-সিদ্ধ বলিয়া বিদ্যাপতির কতকগুলি পদ একেবারে পারফেক্ট, ত্রুটি বিচ্যুতির চিহ্নমাত্র নাই। সৌন্দর্য-সাধনার সুকঠোর নিষ্ঠাই বিদ্যাপতিকে ভাষার বন্ধনে ভাবের উচ্ছল লাবণ্যকে ধারণ করিবার শক্তিদান করিয়াছে। ভাবের যমুনা বহাইতে কবিপ্রাণের আবেগোৎসারই যথেষ্ট। কিন্তু ভাবের তাজমহল গড়িতে গেলে সংযম, সাধনা, নিষ্ঠা ও কাঠিন্য প্রয়োজন। অনুভূতি একটা নির্ব্বিশেষ বস্তু; রস কূলহারা সাগর; সেই অনুভূতি এবং রসকে একটি নির্দিষ্ট আকারে বদ্ধ এবং মুক্ত করিয়া দিতে হইলে—এবং যাহা যথার্থ কবিকর্ম্ম,—সুমিতি ও সংযমের নিতান্ত প্রয়োজন। ঈশ্বর নির্ব্বিশেষ

সচ্চিদানন্দ সাগর, কিন্তু তাঁহার একটি ঢেউ যেমন রাম, একটি ঢেউ কৃষ্ণ (কথামৃত), তেমনি অবিশেষ রস সাগরের এক একটি ঢেউ মহাকাব্য বা কাব্য—বীচিবিভঙ্গ এক একটি পদ-গীতিকা। রসসমুদ্রের ক্ষণ-উচ্ছ্বসিত তরঙ্গভঙ্গের প্রতিবিম্ব পড়ে কবির মনোদর্পণে, তিনি সেই ক্ষণ-বিম্বটুকুকেই 'বিশেষ' করিয়া তোলেন ; অথচ স্বরূপসত্তায় তাহা রস-সাগরের ঢেউ, তাহার অঙ্গে অঙ্গে সমুদ্রের স্বপ্ন ও সুর, সৌরভ ও লাবণ্য ; কাব্য তাই বিশেষ হইয়াও নির্ব্বিশেষ। ইহাকেই আমরা কাব্যের ব্যঞ্জনা বলি, ধ্বনি বলি, বলি লোকোত্তর দ্যুতির দূতী। বিদ্যাপতির কাব্যে ঐ বিশেষের বিম্বটুকু ফুটিয়াছে ভাল, চণ্ডীদাসে তেমন নয়। একেবারে কি ফোটে নাই ? তাহা নয়, না ফুটিলে কাব্য হইত না। বিদ্যাপতি হইতে অসম্পূর্ণ ইহাই বক্তব্য।

বিদ্যাপতি কাব্যের এই form কোথা হইতে পাইয়াছিলেন (অবশ্য কবি-প্রকৃতিই আসল) তাহার উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি ; তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা, পরিবেশ, সমাজ ইত্যাদি। ঐ পরিবেশের কবি হইয়া এবং চৈতন্য-পূর্ব্ব যুগের কবি বলিয়াও, তাঁহার পক্ষে প্রথমেই রাধার মহাভাবের কথা গাহিয়া ওঠা সম্ভব হয় নাই। তাঁহাকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। রাধার জন্ম হয়ত অন্য কবি দিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে লালন করিয়া যৌবন-স্বর্গে তুলিয়াছেন বিদ্যাপতি। সেই কোন্ বয়ঃসন্ধির কাল হইতে তিনি রাধাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, পূর্ব্বরাগ অভিসার মিলন মান বিরহ ভাবসম্মিলন পর্য্যন্ত তাহাকে দর্শন করিয়াই চলিলেন। অন্যের দর্শনের সাহায্য তিনি পান নাই। তাই তাঁহার রাধিকা প্রথমে একেবারেই লৌকিক। পরবর্ত্তীকালে প্রেমের কৃচ্ছ্র সাধনায় অতীন্দ্রিয়তাকে আহ্বান করিলেও শেষ পর্য্যন্ত "যোগিনী" হইয়া উঠিতে পারে নাই। চণ্ডীদাস কিন্তু তৈরী রাধিকাই পাইয়াছিলেন। তাই পূর্ব্বরাগে নামস্মরণেই প্রাণ-বিস্মরণ, 'নাম পরতাপে ঐছন' অবস্থা। ভাবুক-গোষ্ঠীর জন্য চণ্ডীদাস গান গাহিয়াছেন, বিদ্যাপতি বিদগ্ধ রাজসভার জন্য। রসিক সমালোচকের ব্যাখ্যা শুনিয়াছি ; তিনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কাব্যপরিবেশ ব্যাখ্যা করিতেছেন : একজন বাশুলী মন্দিরের পূজারী। বনচ্ছায়া-মণ্ডিত নির্জ্জন গ্রাম্য মন্দিরের চূড়া বাহিয়া শেষ দিনলেখাটুকু নামিয়া গেল। সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসিল ; প্রদীপে ক্ষীণ সলিতাটুকু উস্‌কাইয়া এক গ্রাম্য কবি গান বাঁধিতেছেন। আপন মনেই গাহিতেছেন—তিনিই চণ্ডীদাস। সন্ধ্যা নামিয়াছে আর এক দিগন্তে ; তাহা গ্রাম নয়, নগর। রাজসভার কলমুখরিত প্রাঙ্গণে ঝাড়-লণ্ঠন একের পর এক জ্বলিয়া উঠিয়া রোশনাই ফেলিয়া দিয়াছে। রাজকবি আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি কি ঐ গ্রাম্য পুরোহিতের মত কেবল আপন অন্তরের দিকে তাকাইয়া গান ধরিবেন, তাঁহার কাব্যে কি কেবল প্রদীপটুকু স্নিগ্ধ হইয়া মৃদু আলোর

শান্তিটুকু বিকিরণ করিবে, না তাহাতে হাজার তারার বাতি, আলোর উল্লাস। চণ্ডীদাসের কাব্যে আঁধার বেশী, বিদ্যাপতির কাব্যে আলোক।

তথাপি বিদ্যাপতি সম্পর্কে সবটুকু বলিয়া ওঠা হইল না। তাঁহার কাব্যে কেবলই আলো বলিলে অবিচার করা হয়। কোন কবিই নিছক আলোর কবি হইয়া বড় হইতে পারেন নাই। বিদ্যাপতির কাব্যে আলো এবং ছায়ার মাঝামাঝি এক অসীম রহস্যের ধূসরতা পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। আজীবন তিনি শিল্পরীতির চর্চ্চা করিয়াছেন এবং তাঁহার কাব্যের উপজীব্য রাধাকৃষ্ণের জবানীতে মানবহৃদয়ই। একটি বার—বোধকরি সেই একটি বার মাত্রই—তাঁহার কাব্যে মানবজীবনের অনন্ত রহস্য—অনন্ত ট্রাজেডী ও আনন্দ যেভাবে রূপ ধরিয়াছে তাহাতে তাঁহার আর্ট-সাধনা সার্থক হইয়া গেল। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় না থাকিলেও বলিতে পারি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতি ও তাহার অব্যর্থ প্রকাশের বাণী মানবপ্রাণ চিনিয়া লয়ই—এ পদটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিরিক কাব্য। সুপরিচিত পদটি উদ্ধৃত করিতেছি—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোহি পিরীতি অনু- রাগ বখানিএ
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোহি মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গমায়লুঁ
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল॥
কত বিদগধ জন রস অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
কহ কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক॥

—রভস-মূর্চ্ছিতা রাধিকা কোন্ আচম্বিত মুহূর্ত্তে বঁধুর মুখ দেখিয়া ফেলিলেন; কী দেখিলাম! এতদিন কি দেখেন নাই! হয়তো, হয়তো নয়। দেখিয়াছি, আবার দেখিও নাই। একদিন নয়, দুইদিন নয়, 'জনম অবধি রূপ নেহারলুঁ', তবু কেন এই

বিস্ময়, কেন এই দর্শন-লালসা, স্পর্শ-কামনা, রতি-বাসনা। কেন কে বলিবে? ইহাই তো মানবজীবনের পরম রহস্য; সর্ব্বজীবনের দুর্ভেদ্য সমস্যা। চিরন্তন নারী সেই যে একবার মিলনের মদির মুহূর্ত্তে চিরন্তন পুরুষের অনাদি রূপ-রহস্য, অনন্ত প্রাণ-বিস্ময়টুকু নয়নগোচর, হৃদয়গোচর, করিয়াছিল,—তাহার পর সেই যে রতির দাহ হইতে আরতির দীপশিখা জ্বালাইয়া সে অনন্ত অনন্তকাল হৃদয়-দেবতার অর্চ্চনা করিয়া চলিয়াছে, তাহার শেষ নাই, শেষ হইবে না। নিখিল প্রাণ-রাধিকা—প্রাণ-আরাধিকা—প্রাণপতি কৃষ্ণের দিকে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া থাকিবেই, তাহাতে রূপের কামনা, রসের বাসনা, তৃপ্তির নিবিড়তা, তৃষ্ণার বিধুরতা।

এই একটি পদ বিদ্যাপতির কবি-শক্তির সীমা-নির্দ্দেশক হইয়া আছে। বৈষ্ণব কাব্যের অন্যত্র ইহার সদৃশ উৎকৃষ্ট পদ আছে। জ্ঞানদাস মিলনের তীব্র উৎকণ্ঠাকে অনুপম কাব্যশ্রীতে মণ্ডিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে চিরন্তনী জীবনের বাণী-বিকাশের গৌরব আছে—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ-পুতলি মোর থির নাহি বান্ধে॥

আশ্লেষ-বদ্ধ মিলন-মুহূর্ত্তেও তীব্র বিরহবোধ চণ্ডীদাসের কাব্যে ফুটিয়াছে—

দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল এক না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

বিদ্যাপতির ঐ একটি পদে এই সকল ভাব-রহস্য এবং ইহার অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা-রহস্য পুঞ্জিত হইয়া আছে। ইহাকে যিনি Cosmic Imagination—সৃষ্টি-রহস্য-ভেদকারী কল্পনা বলিয়াছেন তিনি অতি যথার্থই বলিয়াছেন।

ভাবের বাণী-নির্ম্মাণ এবং তাহারই মাধ্যমে ভাবাতীতকে স্পর্শ করিবার কবি-দুঃসাহস বিদ্যাপতির ছিল তাহা হয়ত পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে কিছুটা স্পষ্ট হইয়াছে। ইহার সহিত আর দু'একটি দৃষ্টান্ত-সংযোগ করিব। ভাব-সম্মিলন ও ভাবোল্লাসের পদে বিদ্যাপতি প্রতিদ্বন্দ্বী-হীন। বিদ্যাপতি পরম সুখে মিলনের রসাবেশ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে যেটুকু উৎকর্ষ তাহা বুদ্ধিদীপ্তি, অর্থ-গৌরব, শব্দ-নিপুণতার দান। বিদ্যাপতির সেই রম্যার্থ-উজ্জ্বল কবি-ব্যক্তিত্বের পরিচয় ইতি-পূর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছি। সেই মিলন বর্ণনাতেই তাঁহার কবি-শক্তি নিঃশেষ হয় নাই।

সেই প্রাকৃত মিলন-সঙ্গমে তিনি আপনার শ্রেষ্ঠ পূজা-উপচার সমর্পণ করেন নাই। মিলনের পর বিরহ আসিয়াছে, তাহার পর ভাবসম্মিলন। বিদ্যাপতি ভাবসম্মিলনের কবি। একদা তাঁহাকে আমাদের দেশের আধুনিক কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যকার সুখের কবি বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে নিছক সুখের কবি বলি কি করিয়া? সুখে নয় দুঃখে, মিলনে নয় বিরহে তাঁহার কবি-ভাব চরমে উঠিয়াছে। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, বিদ্যাপতি জীবন হইতে সুখকে বিসর্জ্জন দেন নাই। কিন্তু পরম সত্য যে অনাদি দুঃখ তাহাই তাঁহার কাব্যের ভূষণ। অথবা এমনও বলা যায়, তিনি সুখেরও কবি, দুঃখেরও কবি এবং একই সঙ্গে সুখ দুঃখাতীত আনন্দের কবি। শ্রীরামকৃষ্ণ উপমা দিতেন, জ্ঞানের কাঁটা দিয়ে অজ্ঞানের কাঁটা তুলে ফেলতে হয়, তারপর দুই ফেলে দিয়ে বিজ্ঞানের অবস্থা। সুখের পর দুঃখ তারপর আনন্দ—বিদ্যাপতির কাব্যে মিলনের পর মাথুর তারপর ভাবসম্মিলন, ভাবোল্লাস। এই আনন্দবাদ আমাদের দেশে উপনিষদের মতই প্রাচীন। রবীন্দ্র-দর্শনের অন্যতম মূল আশ্রয় আনন্দতত্ত্ব। তিনি বহু কাব্যে ও আলোচনায় ইহা প্রকাশ করিয়াছেন; বলিয়াছেন, আনন্দ সঙ্কীর্ণ নয়, তাহা দুঃখের বিপরীত সুখ নয়; আনন্দের মধ্যে সমস্ত কিছুর মিলন। রবীন্দ্রনাথের রচনার সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—"জগতের এই অপূর্ণতা যেমন পূর্ণতার বিপরীত নহে, কিন্তু তাহা যেমন পূর্ণতারই একটি প্রকাশ, তেমনি এই অপূর্ণতার নিত্য সহচর দুঃখও আনন্দের বিপরীত নহে, তাহা আনন্দেরই অঙ্গ। অর্থাৎ দুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দুঃখই নহে তাহা আনন্দ। দুঃখও আনন্দরূপমমৃতং।" রবীন্দ্রনাথের এই উদ্ধৃতির পর বিদ্যাপতির ভাবসম্মিলনের মর্ম্মব্যাখ্যা অনাবশ্যক। এখন একটি পদ তুলিয়া দিই।—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
সোহি কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।

পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা ॥
অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহুঁ মানব'নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা ॥

কী উল্লাস! আনন্দের একি অপরূপ প্রকাশ! এ কাব্যের রস আস্বাদনে বিলম্ব হয়? ইহার সঞ্চরণ একেবারে হৃদয়ে অব্যবহিত। ভাষা-ছন্দ-সুর ভাবের সহিত অভিন্ন সত্তায় সম্মিলিত হইয়া যে কাব্য-দেহের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকে আস্বাদন করি বলিলে ভুল হইবে—একেবারে অপরোক্ষ করি। রাধিকা যে-সুরে কথা বলিতেছেন, তাহা যেন প্রাণের গভীরতম প্রান্ত হইতে উচ্ছ্বসিত। এ ভাষা এ আনন্দোল্লাস তাঁহারই, যিনি বলিতে পারেন, আমি তাঁহাকে জানিয়াছি, তাঁহাকে পাইয়াছি, যাঁহাকে পাইয়া মানুষ মৃত্যুর পরপারে অমৃতত্ব লাভ করে। ভয় কি, কাহাকে ভয়?—"সোহি কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ, লাখ উদয় করু চন্দা, পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ, মলয় পবন বহু মন্দা।" ভাব ও ভাষা, রূপ ও রসের এমন পার্ব্বতী-পরমেশ্বর মিলন মহাকবিদের রচনাতেও বিরল।

ভাবসম্মিলন পর্য্যায়ে "কি কহব রে সখি আনন্দ ওর", "পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে" ইত্যাদি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পদ আছে। সে সম্পর্কে আর অধিক বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। আমি যে আর একটি পর্য্যায়ের কাব্যসৃষ্টিতে বিদ্যাপতির কবি-প্রতিভা সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া এই দীর্ঘ আলোচনা শেষ করিব। সে পর্য্যায় প্রার্থনা।

ভাবসম্মিলনের মত প্রার্থনারও শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি। কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক বন্দনারীতির বশবর্ত্তী না হইয়া বিদ্যাপতি রাধিকার জবানীতে মাধবরূপী সেই সত্য-স্বরূপের নিকট যেভাবে আত্ম-উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব কাব্য-সাহিত্যে অভিনব। এই শ্রেণীর যে তিনটি শ্রেষ্ঠ পদ পাইতেছি, তাহার মধ্যে বিদ্যাপতির কবি-প্রাণের এক নূতন প্রকাশ লক্ষ্য করিব। পদগুলির আভ্যন্তর প্রেরণা সম্পর্কে দু' একটি কথা বলিবার আছে; তৎপূর্ব্বে পদ তিনটি উদ্ধৃত করি:

(১) যতনে যতেক ধন পাপ বটোরলোঁ
মেলি পরিজনে খায়।

মরণক বেরি হেরি কোঈ ন পুছত
করম সঙ্গে চলি যায় ॥
এ হরি বন্দো তুয়া পদ নায়।
তুয়া পদ পরিহরি পাপ পয়োনিধি
পারক কওন উপায় ॥
যাবত জনম হাম তুয়া পদ ন সেবলুঁ
যুবতী মতি ময়ঁ মেলি।
অমৃত তেজি কিএ হলাহল পিয়লুঁ
সম্পদে বিপদহি ভেলি ॥
ভনঈ বিদ্যাপতি হেন মনে গণি
কহিলে কি বাড়ব কাজে।
সাঁঝক বেরি সেবা কোন মাগই
হেরইতে তুয়া পায় লাজে ॥

(২) মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পলুঁ
দয়া জনি ছোড়বি মোয় ॥
গণইতে দোষ গুণ লেশ ন পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহাওসি
জগ-বাহির নহোঁ মুঞি ছার ॥
কি এ মানুষ পশু পাখি কি এ জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ॥
ভনঈ বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥

তাতল সৈকতে বারি বিন্দু সম
সুত মিত রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হাম নিদে গমায়লুঁ
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রসরঙ্গে মাতলুঁ
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা॥
ভনই বিদ্যাপতি শেষ সমন-ভয়
তুঅ বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহাওসি
তারণ ভার তোহারা॥

প্রার্থনা পদে বিদ্যাপতির যে অভিনব কবি-ভাবনার কথা বলিতেছিলাম, আমার নিজের বিশ্বাস, এগুলির মধ্যে কবির আত্মস্বরূপের ছায়াপাত ঘটিয়াছে। যে গভীর আন্তরিকতা এবং সুতীব্র আকুতির সুরে পদগুলি রচিত তাহাতে এমন সন্দেহ স্বাভাবিক। "আধ জনম হাম নিদে গমায়লুঁ জরা শিশু কতদিন গেলা, নিধুবনে রমণী-রস-রঙ্গে মাতলুঁ," "যাবত জনম হাম তুয়া পদ ন সেবলুঁ যুবতী মতি ময়ঁ মেলি"—এই আকুল আক্ষেপ ও আত্মগ্লানি, এই পার্থিব নৈরাশ্য, নিজ জীবন-অভিজ্ঞতা ভিন্ন উৎপন্ন হওয়া কঠিন। রাজসভাশ্রিত পণ্ডিত অভিজাত বিদ্যাপতির লৌকিক জীবন স্মরণ করিতে বলি। সেই নাগরিক জীবন, সেই ঐশ্বর্য্য-বিলাসের প্রভূত আড়ম্বর—অবশ্যই অতৃপ্তি আসিতে পারে; সে অতৃপ্তি আক্ষেপ আর একটি পদে ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি—

কত বিদগধ জন রস-অনুগমন অনুভব কাহু না পেখ।
কহ কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক ॥

সুতরাং মনে হয়,—হয়ত অনুমান মাত্র—প্রার্থনার পদে রাধার নয়, বিদ্যাপতিরই আত্মগত খেদোক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, উহা মধুসূদনের আত্মবিলাপের মত বিদ্যাপতির আত্মবিলাপ।

রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি
জাগিবি রে কবে।
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম ভাতি
কতদিন রবে ॥

বিদ্যাপতিরও এই সুর, এই আত্মসম্বিতের আচম্বিত জাগরণ। বিদ্যাপতি ভোগী কবি কিন্তু ভোগবদ্ধ কবি নহেন। মানসভোগের অতৃপ্তি এবং সম্ভবতঃ বস্তু-ভোগের নৈরাশ্য তাঁহাকে উর্দ্ধতর অনুভূতির জগতে তুলিয়া দিয়াছে। নচেৎ তিনি স্বভাবতঃ সাত্ত্বিক ভক্ত নন, রাজসিক। বিদ্যাপতির মধ্যে প্রথম হইতে আত্মদানের ব্যাকুলতা নাই। তাহা চণ্ডীদাসের ছিল। সে হিসাবে বিদ্যাপতি প্রথম জীবনে (ধরিয়া লইতেছি) অগভীর। কিন্তু ভোগজনিত জীবন-রস উপলব্ধির একটা বিস্তৃতি আছে। তাহার দ্বারাই পরবর্ত্তী আত্মসমর্পণের কাব্যে সমুদ্রের সুর লাগিয়াছে। যে ভোগ করে নাই সে তাহার অসারতা উপলব্ধি করে কেমন করিয়া? শ্রীঅরবিন্দ যেমন বলেন, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা (লৌকিক জ্ঞান) জানিবার জন্যই জ্ঞানী হওয়া দরকার।

জ্ঞানের কথা উঠিতে আর একটি কথা মনে হইতেছে; বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদ এমন অপূর্ব্ব হইবার কারণ, আমাদের বিশ্বাস, তাহাতে জ্ঞানের একটা দৃঢ় বহিরাবরণ আছে। প্রার্থনার পদের বিদ্যাপতিকেও নিছক ভক্ত-কবি বলিতে কেমন বাধো বাধো ঠেকে। এ কথায় আপত্তি উঠিবে জানি, তথাপি মনে হয় প্রার্থনার অমন ভাবৈশ্বর্য্য নিছক আবেগ-মুখ হইতে আসে নাই। কবি শিব-ভক্ত, শক্তি-ভক্ত—তাঁহার একটা বৈদান্তিক দীক্ষা ছিল। তাহাই, ঐ জ্ঞানকাঠিন্যই, যেন আত্মসমর্পণের আবেগে বিগলিত হইয়া রসরূপ ধরিয়াছে। "কত চতুরানন মরি মরি যাওত ন তুঅ আদি অবসানা। তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমাওত সাগর লহরী সমানা, "আদি অনাদিক নাথ কহাওসি",—ইত্যাদি উক্তি জ্ঞানীর। এখানে অদ্বৈততত্ত্বের আভাস। শ্রীরামকৃষ্ণের যে উপমাটি ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা এখানে কত সুপ্রযুক্ত

—"সচ্চিদানন্দ সাগরের দুটি ঢেউ—রাম আর কৃষ্ণ"—ঐ "কত চতুরানন ·· সাগর লহরী সমানা।"

সর্বশেষে আমি আর একবার বিদ্যাপতির স্বপক্ষে আমাদের পুরাতন দাবীটি উত্থাপন করিতেছি,—বিদ্যাপতিকে তাঁহার যুগের কবি-সার্বভৌম বলা যায় কি না। যিনি কাব্যে রীতি-বিলাসের চূড়ান্ত প্রমাণ রাখিয়াছেন,—বাক্‌বৈদগ্ধ্যে যাঁহার তুলনা নাই, রূপ ও রসের মিলনোল্লাসে যাঁহার কাব্য চমৎকৃতির শেষ স্তরে উঠিয়াছে, এবং অন্ততঃ প্রধান কয়েকটি রসপর্য্যায়ে যাঁহার কবি-কৃতিই সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই মহাকবি বিদ্যাপতিকে তাঁহার যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলিলে বোধকরি মিথ্যাচার করা হয় না।

(ইতিপূর্বে আমি "সখি কি পুছসি অনুভব মোয়" পদটিকে বিদ্যাপতির বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। অনেকে পদটি বিদ্যাপতির বলিতে চান না। যুক্তি—পদটি 'কবিবল্লভ' ভণিতায় পাওয়া যায় এবং পদান্তর্গত 'অনুরাগ' শব্দটির ঐ বিশেষ অর্থে ব্যবহার রূপ গোস্বামীর অলঙ্কার গ্রন্থের নির্দেশ-অনুযায়ী। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হইল, 'কবিবল্লভ' বিদ্যাপতিরও উপাধি ছিল, অন্যেরও থাকিতে পারে। আর 'অনুরাগ' শব্দটি যে বিদ্যাপতির অজানা ছিল, তাহা সত্য নয়। অকৃত্রিম ও সন্দেহজনক—বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত উভয় প্রকার পদে 'অনুরাগ' শব্দটির ব্যবহার আছে। যথা সাহিত্য-পরিষদ সংস্করণের ৫২৭,৫৩৫ এবং ৬৯৯ পদ। আবার 'অনুরাগ' শব্দটির বিশেষ অর্থ—নিতি নবায়মান প্রেম—ঠিক ঐ অর্থে শব্দটির ব্যবহার থাক বা না থাক, 'তিলে তিলে নূতন হোয়' প্রেম যে বিদ্যাপতির অজানা ছিল না তাহার প্রমাণ তাঁহার কাব্যেই পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির বলিয়া অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত অতিশয় বিখ্যাত "আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ" পদের শেষ পঙ্‌ক্তি—"ধনি ধনি তুয়া নব নেহা।" বিদ্যাপতির নয় বলিয়া কাল্পনিক সন্দেহ-দুষ্ট আরো দুইটি পদে অনুরূপ ভাব—"সহএ ন পারএ নব নব নেহ" (২৯৯ সাঃ পঃ সং) এবং "তোহর পিরীতি সে নব নব মানয়" (ঐ—৩৯৫)।

কিন্তু ইহা তো বহিরঙ্গ প্রমাণ-অপ্রমাণের কথা। আমি আভ্যন্তর সাক্ষ্যকেই গুরুতর বিবেচনা করি। সে দিক দিয়া 'সখি কি পুছসি' পদটি এবং প্রার্থনার পদগুলির ভাবগত ঐক্য কি চক্ষুষ্মানের নিকট অস্পষ্ট থাকিবে? পদটির শেষে 'বিদগধ জনের' বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, 'আনুভবের' জন্য যে উৎকণ্ঠা, তাহা তো প্রার্থনা পদের ভাব-অঙ্গীকার। "কত চতুরানন," "কিএ মানুষ পশু"—এ সকল যে "লাখ লাখ যুগ,"

"কত মধু যামিনী," ইত্যাদির সঙ্গে একেবারে ভাবৈকরস তাহাও বুঝাইয়া বলিতে হইবে? ইহাতেও যদি না হয়, 'আজু রজনী হাম' পদটির প্রতি পুনর্ব্বার দৃষ্টিপাত করিতে বলি। সেখানে "লাখ লাখ ডাকউ," "লাখ উদয় করু," "লাখ বান হউ," আর "কি পুছসি" পদে "লাখ লাখ যুগ"—লাখের প্রতি এমন পিরীতি তো বিদ্যাপতি বই আর কোথাও বিশেষ দেখি না। এ প্রমাণও যদি যথেষ্ট না হয়, তবে শেষ যুক্তি আছে—অপরপক্ষের যথেষ্ট প্রমাণাভাব। একটি সুপ্রচলিত ধারণাকে বিপর্য্যস্ত করিতে হইলে যে পরিমাণ যুক্তি ও তথ্য সমাবেশ করিতে হয় তাহার অল্পমাত্র সংগৃহীত হইলে আসামী সন্দেহ সত্ত্বেও প্রমাণাভাবে খালাস পায়। এই হিসাবেও বিদ্যাপতি পরিত্রাণ পান।)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

রাধাচরিত্র

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধিকা পুরাতন বাংলা কাব্যসাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খচিত্রিত পূর্ণাবয়ব চরিত্র। সে যুগে ইহার দ্বিতীয় নাই। চর্য্যাপদের পর কৃষ্ণকীর্ত্তন যদি সর্ব্বাধিক পুরাতন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন হয়, তবে বলিব, ইহার মধ্যে প্রাচীন কবিমনের সৃষ্টি, প্রাচীন কবিসংস্কারের অনুগত যে নারীচরিত্রটিকে পাইলাম, সে নারী কিন্তু চিরন্তনী—যুগের খোলসটি ছাড়াইয়া ফেলিলে চিরমানবের রক্তস্পন্দিত দেহবিগ্রহ বাহির হইয়া আসিবে; সে নারী 'তীনভুবনজনমোহিনী', 'শিরীষকুসুমকোঁঅলী', 'অদভুদ কনকপুতলী' চন্দ্রাবলী রাহী।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধিকা রক্তমাংসে গঠিতা, প্রাণোত্তাপে সঞ্জীবিতা। মানুষের দেহপ্রাণের ইচ্ছা অনিচ্ছা, আশা নিরাশা, বাসনা কামনা, আকুতি আবেগ—এ সকলের একটা স্বতন্ত্র মর্য্যাদা এবং কাব্যমূল্য আছে। সে মূল্য ও মর্য্যাদাকে কাব্য কখনো স্বীকার করে, কখনো করে না। অবশ্য সম্পূর্ণ অস্বীকারের অর্থ কাব্যের আত্মবিনাশ। কাব্যে হয় বাস্তবের শরীরী রূপ নয় অশরীরী আত্মা—ইহার যে কোন একটির প্রাধান্য ঘটিয়া থাকে। নভোলোকচারী সূক্ষ্ম রসরহস্যলীন কাব্যের—ঐ উৎকৃষ্ট কাব্যেরই—অভাব এদেশে নাই। কিন্তু জীবনোচ্ছল কাব্য! তাহার বিরল অস্তিত্বের ইতিহাসে রাধাসর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন একটি স্মরণীয় সম্পদ।

'রাধাসর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' বলিবার তাৎপর্য্য আছে। কাব্যটির যাহা কিছু ঐ একটি চরিত্র। অন্য চরিত্রগুলি ঐ চরিত্রকে ফুটাইবার জন্য অঙ্কিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্বের সবটুকু আত্মসাৎ করিয়াছে রাধা। যাহার নামকীর্ত্তন করিতে কাব্যটির রচনা সেই শ্রীকৃষ্ণই উহার দোষের আশ্রয়। কাব্যটির যত কিছু দুর্নাম কৃষ্ণের জন্য।

রাধার চরিত্র বর্ণনাপ্রসঙ্গে কাব্যের দোষগুণের বিচারে আসা উচিত নয়, তবে স্থূলতঃ দুই-একটি কথা বলিয়া লই।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতার অভিযোগ আছে। আপাতদৃষ্টিতে সে অভিযোগ সত্য মনে হয়। যাঁহাদের সাহিত্যরুচি অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত তাঁহারা বহিরঙ্গ অশ্লীলতা যাহা, সেই দেহবর্ণনার অতিরেককে তত দূষণীয় মনে করেন না;

কৃষ্ণের অনাবৃত গ্রাম্য গোঁয়াতু´মিই তাঁহাদের নিকট অসহ্য। কৃষ্ণের আচরণ কাব্যশ্রীকে অবমানিত ও মানুষের সৌন্দর্য্যবোধকে আঘাত করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণ বাস্তবিক 'গমার' তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং সময় সময় তাহার কুশ্রীতা মনে ক্রুদ্ধ বিরাগের সৃষ্টিও করে। তথাপি বিচারের অপর দিকও আছে। কৃষ্ণকে বাদ দিয়া কাব্যের কাব্যত্ব যেখানে, সেখানে দীপ্তি আসিত কি? অর্থাৎ ঐ অসহ্য অভব্য কৃষ্ণব্যতীত রাধাচরিত্র অমন করিয়া ফুটিতে পারিত কি? রাধাচরিত্রের জন্য কৃষ্ণ—ঐ অসংস্কৃত কৃষ্ণ—যদি অপরিহার্য্য হয়, তবে কাব্যের পক্ষেও তাহাকে অপরিহার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধাচরিত্রের মধ্যে মানব-বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা যদি হইয়া থাকে, তবে এই কথাই বলিব, কৃষ্ণের সহিত সংঘর্ষ-সম্পর্কেই রাধার অমন ঔজ্জ্বল্য বিচ্ছুরণ; এক বিদগ্ধ কৃষ্ণের পাশে রাধার অপ্রাকৃত রসবিহ্বল স্বরূপ নিরীক্ষণ করিয়া আমাদের রসপিপাসা এক্ষেত্রে চরিতার্থ হইতে পারিত না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মানবতা ও বাস্তবতা আমাদের প্রাচীন কাব্যসাহিত্যের একটি সম্পদ। এই মানবতা মানবগুণসার কোন ভাবনির্য্যাস নহে, তাহা সীমাবদ্ধ আশা-আকৃতির মর্য্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন উচ্চতর ভাবলোকের কলাকুতূহল নহে, যে মানুষকে জানি, যাহাকে বুকে জড়াইয়া অনুভব করি, যাহার মধ্য দিয়া সাধারণ জীবনের উৎকণ্ঠা মূর্ত্তিমান হইয়া ওঠে—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সেই মনুষ্যত্বকে অভিবাদন জানান হইয়াছে। এই মানবতা বা মনুষ্যত্ব দেহ এবং প্রাণ উভয়কে বেষ্টন করিয়া আছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে দেহকে অস্বীকার করা হয় নাই। বিদেহ আত্মা সেখানে দেহকে ঘিরিয়া গুঞ্জন করে, সহজে দেহত্যাগ করিতে চায় না। সুতরাং এই 'দেহ' পরবর্ত্তী বৈষ্ণব পদাবলীর 'দেহ' নয়। পদাবলীতে দেহ আছে, তাহার সম্ভোগের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনাও আছে। কিন্তু অপ্রাকৃত ভাববৃন্দাবনের সেই 'দেহ' যেন মানুষের শুদ্ধ আত্মার বাহ্য রূপনির্ম্মাণ। তাহার মধ্যে প্রাকৃত প্রাণোত্তাপ—সজীবতা অল্পই। দেহসম্ভোগ পরিবেশ এবং বর্ণনাগুণে এমনই রূপকাশ্রয়ী যে, মনে তাহা পার্থিব কাব্যানুভূতি তেমন করিয়া জাগাইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ গোবিন্দদাসের কথা ধরা যাক। গোবিন্দদাসের মধ্যে দেহকামনা ও দেহভোগের যে বিস্তৃত বিবরণ আছে, তাহা কেবল মাগুনিকতার দ্বারা চাপা পড়িয়া গিয়াছে, একথা সর্ব্বাংশে সত্য নয়। মাগুনিকতা খানিকটা চাপা দিয়াছে,—তদুপরি ছিল গোবিন্দদাসের কাব্যে পার্থিব দেহকামনা অস্বীকৃতির মনোভাব। তিনি দেহকে দেহ হিসাবে অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যেভাবে গ্রহণ করে সেভাবে গ্রহণ করেন নাই, ঐ দেহ দেহাতীতকে পাইবার একটা অবলম্বন-

স্বরূপ। সুতরাং গোবিন্দদাসের কাব্যের মূল্য অন্তদিকে যাহাই হউক, তাহাতে লৌকিক রসের মর্য্যাদা নাই। অবশ্য ইহাতে কবি বা পাঠকের দুঃখের কারণ ঘটিতেছে না; মানবজীবনের মর্য্যাদাপ্রতিষ্ঠা গোবিন্দদাসের কাব্যোদ্দেশ্য নয়। এই দেহের প্রসঙ্গে আর একটি সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টান্তের কথা মনে আসিতেছে। বামাচারী তান্ত্রিক সাধকেরা দেহকেই তাঁহাদের সাধনার প্রথম সোপান হিসাবে গ্রহণ করেন। ইন্দ্রিয়পাশ ছেদন করিতে সেই অনাবৃত ইন্দ্রিয়সম্ভোগ বা দেহোপভোগকে কাব্যের উপাদান করিলেও কাব্যে মানবতার প্রতিষ্ঠা হইবে না। কারণ সেখানে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি—তাহার প্রবৃত্তি সংস্কার প্রীতি বা ভীতি লইয়া দেহকে গ্রহণ করা হয় না।

সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতেই কৃষ্ণকীর্ত্তনকার এই দেহকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তাঁহার কাব্যে মানবজীবনের নিজস্ব যে সম্মান, তাহার আশ্রয়লাভ ঘটিয়াছে। রাধিকা-চরিত্রের মধ্য দিয়া প্রাকৃত মানুষের সাধারণ দেহবোধের পরিচয় রাখিয়াছেন। প্রবৃত্তি এবং তাহার পরিণতির চিত্র আছে কৃষ্ণকীর্ত্তনে। মানবিক ধর্ম্ম ও ধারণার বৈপরীত্য ঘটান হয় নাই বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মধ্যে অশ্লীলতা বা দুর্নীতি নাই—অবশ্য গ্রাম্যতা বা স্থূলত্ব কিছুটা আছে। যুগপরিবেশে এবং বাংলা সাহিত্যের তাৎকালিক অবস্থাবিচারে উহা অবশ্যম্ভাবী।

এখন আর একবার অশ্লীলতা বা দুর্নীতি-সম্পর্কিত অভিযোগের সত্যাসত্য যাচাই করা যাক। একজন খ্যাতনামা আধুনিক সমালোচক রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার আলোচনাপ্রসঙ্গে একটি গুরুতর প্রশ্ন তুলিয়াছেন; তিনি বলিতেছেন, চিত্রাঙ্গদার অশ্লীলতা-বিষয়ে যে-কারণে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়, সে কারণটি যুক্তিসহ নহে। কাব্যটির মধ্যে দেহসম্ভোগের যে বর্ণনা আছে তাহা এমন কিছু মারাত্মক নয় যে, অশ্লীল বলিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে সমালোচক মহাশয় কিন্তু আর একটি কঠিনতর আপত্তি তুলিয়াছেন; তিনি বলেন, চিত্রাঙ্গদা কাব্যে অশ্লীলতা নয়, দুর্নীতি প্রবল। তাঁহার বক্তব্য উদ্ধৃত করিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে:

"চিত্রাঙ্গদার মধ্যে যাহা প্রধান দোষ তাহা অশ্লীলতা নয়, দুর্নীতি; তাহাতে ভাষাগত অশ্লীলতা তো নাই-ই, অর্থগত অশ্লীলতা যেখানে যেটুকু আছে, কাব্য হিসাবে তাহা নিন্দনীয় নয়। কিন্তু যে ধরণের দুর্নীতি এ কাব্যের প্রধান দোষ, তাহা কল্পনাবস্তু ও কল্পনাভঙ্গিতেই প্রকট হইয়াছে। আমি যে দুর্নীতির কথা বলিতেছি তাহা নীতিবাগীশের দুর্নীতি নহে; কবির কল্পনায় যে ভাববঞ্চনা রহিয়াছে, সৃষ্টির সত্যকে উপেক্ষা করিয়া একটা অযথার্থ আদর্শ-প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা উহাতে

লক্ষিত হয়—এ কাব্যের সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির মূল কারণ তাহাই।...যে চিত্রাঙ্গদার রূপে প্রথমে অর্জ্জুনের দেহের ক্ষুধা মিটিয়াছিল, এবং যে চিত্রাঙ্গদার গুণে শেষে তাহার আত্মার ক্ষুধা মিটিল—এই দুই চিত্রাঙ্গদা কি এক ব্যক্তি? দেহেও এক নয়। বরং এত বিপরীত যে একজনকে আর একজন বলিয়া চিনিয়া লওয়াই দুঃসাধ্য। চিত্রাঙ্গদা যখন স্বর্গীয় রূপলাবণ্যের অবসানে তাহার মুখাবগুণ্ঠন মোচন করিল, তখন অর্জ্জুন শুধু কুৎসিত নয়—একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত নারীকে দেখিয়া অপ্রতিভ ও সন্ত্রস্ত হইল না? এই সম্পূর্ণ ভিন্নমূর্ত্তিধারিণীকে তৎক্ষণাৎ সে গভীর প্রেমের চক্ষে দেখিল কি করিয়া? এ যেন এক নারীকে ত্যাগ করিয়া আর এক নারীতে আসক্ত হওয়া। তাহা হইলে, সম্ভোগতৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার জন্য এক নারী, এবং সেই তৃষ্ণার অবসানে ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য আর এক নারীর ব্যবস্থাই সমীচীন?...যৌনপিপাসা মিটাইল একজন, প্রেমের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিল আর একজন—জীবনের সত্য ইহা নয়, ইহা সৃষ্টি-নিয়মের বহির্ভূত।"

চিত্রাঙ্গদা সম্পর্কে উপরিউদ্ধৃত সমালোচনা বর্ত্তমান লেখকের মনোমত, এ কথা কেহ যেন ধরিয়া না লন। মনোমত কি, সে প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রয়োজন বর্ত্তমানে নাই। আমি চিত্রাঙ্গদার ঐ বিরূপ সমালোচনার সুযোগ গ্রহণ করিতেছি এইজন্য যে, ঐ সমালোচনার বিপরীত পক্ষ খাড়া করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কবিকৃতির মূল্য যাচাই করিয়া লইতে পারিব। চিত্রাঙ্গদাসম্বন্ধে ঐ বিরুদ্ধ বক্তব্যকে আমি কাব্য হইতে যেন বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছি এবং তাহারই আলোকে কৃষ্ণকীর্ত্তনের অশ্লীলতার অভিযোগের পুনর্বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বলা বাহুল্য, চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে সত্য হোক বা না হোক, সাধারণ কাব্য সম্বন্ধে সমালোচকের পূর্ব্বোদ্ধৃত তত্ত্বদৃষ্টিকে আমি সমর্থন করি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আপাতদৃষ্টিতে অশ্লীলতা যতই থাক, তাহা সমালোচক-কথিত চিত্রাঙ্গদার পূর্ব্বোক্ত দুর্নীতি হইতে মুক্ত। চিত্রাঙ্গদার কবি বাহ্য-রূপের উর্দ্ধে প্রাণ বা আত্মার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিতে গিয়া দেহের মূল্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকারের চেষ্টা করিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদা ধার-করা রূপের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারে, কিন্তু দেহ, তাহাতো তাহার নিজের। দেহ-খাঁচায় বাস করিয়া হৃদয়-মনের অতখানি নির্ব্বিকার কূটস্থ অবস্থা সম্ভব কি, অন্ততঃ চিত্রাঙ্গদাশ্রেণীর নারীর? দেহরূপের মর্য্যাদাগত যে অস্বীকৃতি চিত্রাঙ্গদার ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। রাধিকার দেহের উপর কৃষ্ণের অত্যাচার ঘটিয়াছে তখন, যখন তাহার মন জাগে নাই। কিন্তু ঐ

দেহই মনকে জাগাইল। দেহের সঙ্গে মনের আত্মিক বিচ্ছেদ চিত্রাঙ্গদায় ; কৃষ্ণকীর্ত্তনের মধ্যে দেহ এবং মন গভীরতর সত্তায় সংযুক্ত। ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় যাহাকে দেহদান করিতে হইল, তাহার বিরুদ্ধে হয় প্রেম নয় ঘৃণা, যে কোন একটি জাগিবে। রাধিকার প্রেমই জাগিয়াছিল। দেহের সোপান বাহিয়া সেই প্রেমের পদক্ষেপ। কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধিকার পূর্ব্বরাগ নাই,—পূর্ব্বভোগ ঘটিয়াছে। রাধিকা সেখানে পূর্ব্বভোগ হইতে পূর্ব্বরাগে পৌছিয়াছেন। ইহাতে অমনস্তাত্বিক কিছু ঘটে নাই। দিনের পর দিন কামনার সাগরে দেহদান করিতে হইতেছে, অথচ মন আগাইতেছে না—ইহা অসম্ভব। অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদার সহিত কত বসন্ত-নিশীথ যাপন করিল, অথচ আরোপিত রূপের এমনই মাহাত্ম্য যে, সে চিত্রাঙ্গদা-মানুষটার কোন পরিচয়ই আবিষ্কার করিতে পারিল না—ইহা বড় আশ্চর্য্য। বৎসরান্তে রূপত্যাগী চিত্রাঙ্গদাকে নূতন করিয়া প্রাপ্তি --চিত্রাঙ্গদার মহত্ত্বের সহিত শুভদৃষ্টি—অর্জ্জুনের পক্ষে অভিনব ঘটনা। নূতন চিত্রাঙ্গদার সহিত পূর্ব্বতন চিত্রাঙ্গদার সম্পর্ক কোথা? শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এই বস্তুটি ঘটে নাই। রাধা এবং কৃষ্ণ এই দুই নরনারীর মধ্যে দেহমিলনঘটিত যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল—তাহাতে প্রথমে মনের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু মন দেহকে বাদ দিয়াও নয়। কৃষ্ণ রাধাদেহকে যতই ভোগ করিয়াছে—আন্তরিক বিরাগ সত্ত্বেও—রাধার চিত্ত কৃষ্ণের প্রতি সেই পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে। এই আকর্ষণ একেবারে অনিবার্য্য। কৃষ্ণকামনার আদি অধ্যায়ে রাধার মধ্যে হয়ত প্রবৃত্তির নীচুমহলের তাড়না একটু অধিক পরিমাণে ছিল, কিন্তু যতই দিন গিয়াছে, ততই ঐ অসংযত কামনা প্রেমের রূপ ধরিয়াছে। সর্ব্বশেষে, রাধার প্রেম যে স্তরে উপনীত হইল তাহা পরবর্ত্তী বৈষ্ণব ভাবরসের শ্রেষ্ঠাধার মহাভাবস্বরূপ হয়ত হয় নাই, দেহকামনার রেশটুকুও বোধ করি শেষ পর্য্যন্ত উহার মধ্যে থাকিয়া গিয়াছিল, যাহা নিতান্ত মানবিক—তথাপি তাহার অন্তিম রূপান্তর মানবচরিত্রের শ্রেষ্ঠ হৃদয়ধর্ম্মকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়।

এখন আমরা সংক্ষেপে কৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যে রাধাচরিত্রের ক্রমবিকাশের স্তরগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিব। কবি রাধা নাম্নী একটি এগার বৎসরের বালিকাকে তাঁহার কাব্যে অবতীর্ণ করাইলেন। বলাবাহুল্য এ রাধা কোন ভাববৃন্দাবনের নয়। সে একেবারেই লৌকিক। সে রোমান্টিকা নয়, সে বাস্তবিকা। কবি যেমন দেখিয়াছেন তেমনি দেখাইয়াছেন। তাহার মুখের ভাষাটুকু পর্য্যন্ত তাহার নিজের। কবি সম্পূর্ণ আত্মসংহরণ করিয়া সেই রাধাচন্দ্রাবলীকে আত্মপ্রসারের সুযোগ দিয়াছেন।

কবি সেই বালিকাটিকে অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিতেছেন। তাহার বয়স এগার বটে কিন্তু ঐ বয়সেই কী তীব্র ব্যক্তিত্ব,—কী প্রখর আত্মস্বাতন্ত্র্য! আত্মহারা

অবস্থায় সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া ফেলিবার মেয়ে সে নয়। রতিই জাগিল না, আরতি কোথায়! পরযুগের বৈষ্ণব কবিরা রাধার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—'শিশুকাল হইতে বন্ধুর সহিতে পরাণে পরাণে বান্ধা,'—সে রাধিকা ভিন্ন। দুইজন কবির হাতে রাধিকার একটি সম্পূর্ণ জীবন কাটিয়া গিয়াছে। তাঁহারা হইলেন বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস। এই দুইজন অনভিজ্ঞাকে অভিজ্ঞা, মুগ্ধাকে প্রগল্‌ভা, কৃষ্ণবিরূপাকে কৃষ্ণ-প্রাণা করিয়া গিয়াছেন। তবেই না পরের যুগের প্রারম্ভেই 'রাঙাবাস পরা যৌবনে যোগিনী' সে।

যাহাই হউক, প্রথম দর্শনেই রাধিকা একেবারে 'মনের পাঁজর' কাটিয়া বসিয়া যায়। সাগর গোয়ালের ঘরে যাহার জন্ম, পদুমা যাহার মাতা, বৃন্দাবনে যাহার বাস, রূপ তাহার অপরূপ—চমৎকার ভাষায় কবি তাহা বর্ণনা করিয়াছেন :

তীনভুবনজনমোহিনী।
রতিরসকামদোহনী॥
শিরীষকুসুমকোঁঅলী।
অদভুত কনকপুতলী॥

রূপের বর্ণনায় মনে যেটুকু কোমল মধুর ভাব জাগিয়াছিল, তাহা রাধিকা অবিলম্বে দূর করিয়া দিল। 'শিরীষকুসুমকোঁঅলী' দেহের মধ্যেও বিদ্যুতের দীপ্তি আর অগ্নির দাহ থাকিতে পারে। কৃষ্ণ রাধার রূপের কথা শুনিয়া মজিয়াছে, বড়ায়িকে দিয়া প্রণয়ের কর্পূর তাম্বূল পাঠাইয়াছে। বড়ায়িও দূতীর উপযুক্ত সুরে কথা পড়িল ('কথা খানি খানি কহিল বড়ায়ি বসিআঁ রাধার পাশে'); কৃষ্ণের পরিচয়, বিরহজ্বরে (নাম শুনিয়াই বিরহ!) তাহার শোচনীয় দশা,—ইত্যাদির বর্ণনা দ্বারা রাধিকার করুণা এবং তদনুচর স্নেহোদ্রেকের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া সবে কর্পূর তাম্বূল হয়ত একটু বাড়াইয়াছে—বাড়াইতে আর হইল না—অকস্মাৎ—

এ বোল সুণিআঁ নাগরী রাধা
হাণএ সকল গাএ।
যত নানা ফুল পান করপুর
সব পেলাইল পাএ॥

তারপরেই ধিক্কার, গঞ্জনা, আত্মমর্য্যাদার ঘোষণা—সর্ব্বশুদ্ধ অগ্নিবর্ষণ :

ঘরে সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর
আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের ঘরের গরু রাখোআল
তা সমে কি মোর নেহা॥…

ধিক জাউ নারীর জীবন
দহে পসু তার পতী।
পরপুরুষের নেহাএঁ যাহার
বিষ্ণুপুরে (হএ) স্থিতী ॥

বুড়ি বড়ায়ি অবশ্য ইহাতে থামিল না। কৃষ্ণ নাছোড়বান্দা, রাধার সহিত মিলন ঘটাইতেই হইবে। কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি অথবা আপন স্বভাবে বড়ায়ি রাধাকে আর একবার ধরিয়া পড়িল। কিন্তু কাছে কাছে ঘুরিলেও বড়ায়ির রাধিকাকে চিনিতে বাকি ছিল। বড়ায়ির কথা শুনিয়া—'কোপেঁ গরজিলী রাধা যেন কালসাপ।' কালসাপের গর্জ্জন কবির ভাষায় শোনা যাক :

দারুণী বুঢ়ী তোর বাপেত নাহিঁ লাজ।
তেকারণে মোক বোলসি হেন কাজ ॥…
আর যবেঁ বোল মোরে হেন পরিহাস।
আবসি করিবোঁ তবেঁ তোহ্মার বিনাশ ॥

এবং :

এহা গুআ পান তোহ্মে আপণেই খাহা।
আপণাক চিহ্নিআঁ কাহ্নের থান যাহা ॥

এবং ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া :

এহা বুলী বড়ায়িক চড়ে মাইল রোষে।

এই রাধা। সবল সুস্থ তেজস্বিনী প্রাণোচ্ছলা। দেহে এবং মনে দুর্ব্বলতা কোথাও নাই। হিন্দুর ঘরের মেয়ে, মনে সতীত্ববোধ গাঁথিয়া আছে। সংস্কার তাহার চিরকালের সম্পদ। অবস্থাপন্ন ঘরের বধূ—সে কারণে গর্ব্বও অল্প নয়; 'বড়ার বৌহারী আহ্মে বড়ার ঝী'; স্বামী লইয়া তাহার অভিযোগের কোন কারণ ঘটে নাই—'চিরকাল জীউ মোর সামী আইহন। আনুপাম বল বীর মতীএঁ গহন ॥' সে একজন সাধারণ 'রাখোয়াল' ছোকরাকে ভজিবে কোন দুঃখে। সুতরাং রাধা কৃষ্ণের কুপ্রস্তাবে চটিয়া গালাগালি দিয়া মারিয়া যে বড়ায়িকে তাড়াইয়া দিবে তাহাতে অবাক হইবার কিছু নাই; না দিলেই অবাস্তব হইত।

এমন মেয়ে একদিন কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া পাগল হইয়া উঠিবে—রূপযৌবন, পতি-পরিজন, লাজলজ্জা, কুল-গোকুল সব ভাসাইয়া অন্ধ আবেগে কৃষ্ণ-সন্ধানে ছুটিয়া বেড়াইবে—অন্যত্র নয়, এই বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যেই। কিন্তু সে অবস্থা আনিতে কবিকে

দীর্ঘ প্রস্তুতি, সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। সেই প্রস্তুতির ইতিহাসটুকু কৃষ্ণকীর্ত্তনের গৌরব। এমন করিয়া চরিত্র-চিত্রণ সে যুগে কেন এ যুগেরও ক্ষেও প্রতিভা-শক্তি দাবী করে। তাম্বূল খণ্ডে কৃষ্ণের কর্পূর-তাম্বূল রাধা 'পেলাইল পাএ'; দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমন খণ্ড,—যমুনা, হার এবং বাণখণ্ডের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমণ করিয়া যে রাধা জীবনের পথে অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছে, বংশীখণ্ডে তাহার কণ্ঠে যখন বাজিয়া উঠিল—যাহা চিরযুগের বিরহী-হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস :

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥…
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥

—তখন পাঠক রাধিকার এই রূপান্তরকে অভিনব মনে করিয়া বিস্ময়-চাকত দৃষ্টি-ক্ষেপ করে না। পূর্ব্বের খণ্ডগুলি বাহিয়া পাঠকও রাধার সহিত বংশীখণ্ডে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সূক্ষ্ম রসদৃষ্টি এবং তীক্ষ্ণ মানবচরিত্রাভিজ্ঞতা সহায়ে বড়ু চণ্ডীদাস রাধা-চরিত্রের যে বিবর্ত্তন ঘটাইলেন তাহাতে অবাস্তবতা—আধুনিক মনোধর্ম্মী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেও—অসম্ভাব্যতা কিছু থাকে নাই। সমালোচক বলিতেছেন, ইহার পর সকল বাংলা কাব্যের রাধিকাই কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিবে, কিন্তু কেহই কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধার মত সহজ স্বাভাবিক একান্ত ঘরোয়া সুরে আপনার বেদনা প্রকাশ করিতে পারিবে না—যাহার শরীর আকুল, যাহার রন্ধন 'আকুলায়িত', যাহার মন 'বেআকুল', 'কুম্ভারের পণীর' মত যাহা নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে।

তাম্বূলখণ্ডে রাধা লাথি মারিয়া তাম্বূল এবং হাতে মারিয়া বড়ায়িকে বিদায় দিল। কিন্তু ঐ 'অলপবয়সী বালা' মাত্র নিজের তেজ ও সতীত্ব-গর্ব্বে কি সর্ব্বনাশ এড়াইতে পারিবে? অপমানাহত বড়ায়ি এবং কামাহত কৃষ্ণ ষড়্‌যন্ত্র করিয়া রাধাকে পথে আটকাইল। রাধিকা পসরা লইয়া যাইতেছে, সুতরাং কৃষ্ণের দান চাই। চাহিবার অধিকার? বর্ব্বর বল আপনার অধিকার আপনি সৃষ্টি করে। কৃষ্ণ বলিতেছে, হয় অর্থ, নয় দেহ, যে কোন একটি দাও; কোন তৃতীয় বিকল্প নাই। আবার অর্থ হইতে

দেহের প্রতি কৃষ্ণের অধিক আসক্তি। সেই নির্জ্জন গ্রামপথে সহায়হীনা একটি নিতান্ত বালিকা,—অসভ্য বলিষ্ঠ গ্রাম্য যুবক তাহার প্রতি অত্যাচারে উদ্যত। কিন্তু কী সাহস মেয়েটির—চরিত্রের সে কিরূপ বহ্নি-দীপ্তি! কৃষ্ণ চরম ইন্দ্রিয়ক্ষুধার পরিচয় রাখিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া রাধিকার দেহ-সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিতেছে, উত্তরে রাধিকা বলিতেছে :

দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে।
আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে॥

কৃষ্ণের অনুচিত কামনার বিরুদ্ধে তাহার স্পষ্ট কথা :

যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতেঁ না পারে।
গলাত পাথরী বান্ধী দহে পসী মরে॥

অথবা কঠিন ব্যঙ্গ :

দিঠিত পড়িলে বাঘত হয়ে লাজ।
সোদর ভাগিনা হআঁ হেন তোর কাজ॥

অথবা সুতীব্র রোষ :

ষোল শত গোআলিনী নাইএ বিকে হাটে।
মাগুকিলেঁ কিলাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা বাটে॥

অথবা উপযুক্ত প্রত্যুত্তর :

এ বোল বুলিতেঁ কাহ্নাঞিঁ মুখে লাজ বাস।
এভোঁহো নাহিঁ ঘুচে তোর মুখে দুধবাস॥

অথবা তীক্ষ্ণ সতর্কবাণী :

আহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম
ছুইলেঁ খাইলেঁ মরী।

এত করিয়াও কিছু হয় না। বলাধিক্যের বিরুদ্ধে এক সময় তাহাকে ভাঙ্গিয়া পড়িতে হয়। রাধা কৃষ্ণকে সকাতর অনুরোধ জানাইল :

এহা আভরণ কাহ্নাঞি সব মোর নে।
বেরি এক কাহ্নাঞিঁ মোক ঘর যাইতে দে॥

বলাবাহুল্য অনুনয়ে ফল হয় নাই। কৃষ্ণ পুনঃপুনঃ কদর্য্যভাবে রাধিকার বিভিন্ন দেহাঙ্গের বর্ণনা করিয়াই চলিল। ঘৃণায় লজ্জায় আশঙ্কায় বেদনায় অভিভূত সেই নিঃসহায় বালিকা কী গভীর হতাশায় না আত্মধিক্কার দিতেছে—'আপনার মাসে

হরিণী জগতের বৈরী'; সৌভাগ্য ও গৌরবের অভিজ্ঞান নিজ রূপসৌন্দর্য্যের প্রতি তাহার বিরাগের সীমা নাই :

আন ডাক দিআঁ বড়ায়ি নাপিতের পো।
কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডায়িবোঁ মো॥…
মুছিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি সিশের সিন্দূর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচূর॥

আর সর্ব্বশেষে বাণীহীন বেদনায় :

লোটায়াঁ লোটায়াঁ কান্দে রাহী।

সেই রাধিকা আত্মসমর্পণ করিয়াছিল—তাহাকে করিতে হইয়াছিল। সে আত্মসমর্পণে আত্মরক্ষাবুদ্ধি প্রবল, বিন্দুমাত্র হৃদয়সম্পর্ক ছিল না। নচেৎ আত্মদানের পূর্ব্বে কেহ প্রতিজ্ঞা করাইয়া লয়, দেখিও হার না ছেঁড়ে, মুকুট না ভাঙে, অলঙ্কার না নষ্ট হয়, শরীরে আঘাত না পাই।—

মাথার মুকুট কাহ্নাঞিঁ ভাঁগি জুণি জাএ।
যোড় হাথ করি কাহ্ন বোলোঁ তোর পাএ॥
ছিণ্ডি জুণি জাএ কাহ্নাঞিঁ সাতেসরী হারে।
আর নঠ না করিহ সব অলঙ্কারে॥

আত্মদানের উপযুক্ত ভাষা ও সুর বটে! রাধিকা মন বিবিক্ত করিয়া দেহটিকে একটি কামোন্মত্ত জীবের হাতে নিরুপায় বেদনা ও লজ্জায় ছাড়িয়া দিল।

কাহ্নাঞিঁর কামনা এত সহজে নিবৃত্ত হইবার নয়। সুতরাং বড়ায়ি-কাহ্নাঞিঁ ষড়যন্ত্রের শিকাররূপে পুনরায় নৌকাখণ্ডে রাধিকার নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। তাহাকে নৌকা চড়াইয়া মাঝ যমুনাতে কৃষ্ণ যৎপরোনাস্তি নাকাল করিয়া ছাড়িল। রাধিকার কটুকথা, ক্রন্দন, অনুনয় কিছুতে কিছু হইবার নয়। যখন—

মাঝ যমুনাত বড় বাত ভঁআঁ গেল।
পর্ব্বত সমান ঢেউ নাঅত লাগিল॥

—তখন কৃষ্ণ সান্ত্বনা বা আশ্বাস তো দূরের কথা, ইচ্ছা করিয়া নৌকা টলমল করাইতে লাগিল আর প্রতিশ্রুতি আদায়ের ফিকিরে রহিল—যদি আমার কথা স্বীকার কর, তবেই বাঁচাইব। প্রমত্ত কৃষ্ণযমুনার মাঝখানে লোভ-নিষ্ঠুর কৃষ্ণের হাতে পড়িয়া যদি 'ধারেঁ ঝরেঁ রাধিকার নয়নের পাণী', যদি 'ডর পায়ি রাধা কাহ্নাঞিঁকে মাঙ্গে কোল'—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে রাধিকার দ্বিতীয় আত্মসমর্পণেও কোন হৃদয়-

সংযোগ ছিল না, তাহা নিতান্তই প্রাণের তাগিদে—দেহ-প্রাণ একত্র রাখিবার অবশ তাড়নায়। তথাপি এ পর্য্যন্ত কি রাধিকা-চরিত্রের কোন বিবর্ত্তন ঘটে নাই? মানব-চরিত্রাভিজ্ঞ কবির নিকট তাহা অসম্ভব ঠেকে। দ্বিতীয়বারে রাধিকার দেহচেতনা জাগিয়াছে। প্রথমবার রাধা অকুণ্ঠিতচিত্তে নিজ দেহের উপর কাহ্ণাঞির অত্যাচারের কথা বড়ায়ির নিকট বিবৃত করিয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় বারে নানা ছলনায় তাহা চাপিয়া গেল। কৃষ্ণের প্রতি রাধার বিরাগের পূর্ণ পরিচয় রাখিয়াও মাত্র এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া কবি অতি সূক্ষ্মভাবে রাধার চারিত্রিক পরিবর্ত্তনের ইঙ্গিতটুকু দিলেন। আরো কৌতুকের কথা, দূতী বড়ায়ির নিকট রাধা এ বিষয় গোপন করিতেছে, যে সকলই জানে। রাধাও যে তাহা জানে না তাহা নয়, তবু—ইহাই মানবচরিত্র! চেতনা জাগিলে জাগে লজ্জা; তখন অন্য আচ্ছাদন না পাইলে একান্ত আত্মজনের নিকটও মানুষ সঙ্কুচিত হইয়া লজ্জা ও ছলনার তলে আত্মগোপন করিতে চায়।

ভারখণ্ডে রাধিকা অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। সেখানে রাধা-কৃষ্ণের মধ্যে কলহে বাক্যগত তীব্রতা হ্রাস না পাইলেও ভাবগত বিদ্বেষ যথেষ্ট কমিয়াছে। তাহাদের কলহ অনেকটা রসকলহের মত ঠেকে। বুঝিতে পারি ঐ প্রকার কথা কাটাকাটি বেশ সুখদায়ক, অন্ততঃ রাধার পক্ষে। রাধার কয়েকটি বক্রোক্তি:

আউ থাকিতেঁ কাহ্ণাঞি মরণ ইছসি।
সাপের মুখেতে কেহ্নে আঙুল দেসী।

বা—

হাথেঁ হাথেঁ চাহা কাহ্ণাঞি আকাশের চাঁন্দ।

অথবা এমন ব্যঙ্গ:

ঝাঁট কাহ্ন লঅ দধিভার।
এ নহে কলঙ্ক তোহ্মার॥
দধি দুধ বহএ গোআলে।
তাহাত কে কি বুলিতেঁ পারে॥

—এ সকলের মধ্যে ক্রোধের প্রকাশ নাই, কেবল কাহ্ণাঞি যে তাহার প্রার্থিত সম্মানলাভের নিতান্ত অযোগ্য সেই কথাটি রাধিকা বুঝাইয়া দিয়াছে। নচেৎ যে-কৃষ্ণের দর্শনমাত্রে রাধা ভয়ে শিহরিয়া উঠিত, তাহাকে দিয়া ভার বহাইয়া 'উলসিলী গোআলার ঝী'? ভারখণ্ডে রাধিকা আকারে ইঙ্গিতে, এমনকি অনেকক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাষায় কৃষ্ণকে দেহদানে সম্মতিজ্ঞাপন করিয়াছে:

"উলটি উল্লটি রাধা কাহ্ন পাণে চাহে।"
"মনস্থখ ভৈলেঁ বোল ধরিবোঁ তোহ্মার।"
"আসিতেঁ তোহ্মাক রতি দিবোঁ মো কাহ্নাঞি।"
"বাটতে জায়িতেঁ তোরে দিবোঁ চুম কোল।"

রাধিকা যে কতদূর আগাইয়া গিয়াছে তাহার পরবর্ত্তী প্রমাণ ছত্রখণ্ডে মেলে। সেখানে প্রথমতঃ কৃষ্ণের জন্য 'চারিপাশ চাহে রাধা তরল নয়ানে'; অতঃপর ছলনা করিয়া সে উভয়ের নিকট হইতে বড়ায়িকে সরাইয়া দিল। ছত্রখণ্ডে রাধা আলিঙ্গন দিবার নাম করিয়া কৃষ্ণকে প্রায় খেলাইয়া ফিরিয়াছে। এখানে কৃষ্ণসঙ্গত্যাগ করিতে নয়, নির্জ্জন বনপথে কৃষ্ণকে দিয়া আপনার মাথায় ছাতা ধরাইতে রাধিকার সমধিক আগ্রহ।

বৃন্দাবন খণ্ডের ভিতরে রাধাকে প্রায় কৃষ্ণোৎসুকারূপে পাই। ইতিপূর্ব্বে যে-শাশুড়ির সতর্ক রক্ষণে রাধা স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করিতে চাহিত, সেই শাশুড়ি আটকাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া এখন তাহার দুঃখের সীমা নাই। বড়ায়িকে বলিতেছে, কী যন্ত্রণা, শাশুড়ির জন্য ঘরের বাহির হইতে পারি না, বৃন্দাবনে যাইতে প্রাণ এমন করিতেছে, যাইবার উপায় কর দেখি:

আহ্মার সাস্থড়ী বড়ায়ি বড় খরতর।
সব খন রাখে মোরে ঘরের ভিতর॥
কেমনে জায়িবোঁ বড়ায়ি তার বৃন্দাবনে।
মনত গুণিআঁ বোল উপায় আপনে॥

এই বৃন্দাবনখণ্ডেই রাধা নানা দেহভঙ্গিতে কৃষ্ণের কামনাকে উত্তেজিত করিয়াছে; সকলের নিকট হইতে পৃথক করিয়া কৃষ্ণ-সঙ্গ উপভোগের বাসনা জাগিয়াছে; সর্ব্বোপরি মান দেখা দিয়াছে। মান প্রেমের এক বিশিষ্ট পরিপক্ক অবস্থা। কেবল নিজের প্রেম নয়—অপরের প্রেম সম্পর্কে নিশ্চয়তা—সুতরাং অধিকারবোধ না জন্মাইলে মান হয় না। বৃন্দাবনখণ্ডে রাধিকা সেই অবস্থায় উপনীত।

কালিয়দমনখণ্ডে রাধার কৃষ্ণার্ত্তি সর্ব্বপ্রথম অনাবৃত ও অকুণ্ঠিত স্বরূপে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ পাইল। কৃষ্ণ যখন কালীদহে নিমজ্জিত, তখন রাধা পারিপার্শ্বিক ভুলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়াছে; বলিয়াছে:

ধিকছুক কাহ্নাঞিঁ সে কালীনাগে।
আহ্মা না দংশিল তোহ্মার আগে॥

প্রেম যে সম্পূর্ণ দেহবদ্ধ নয়, শেষ পঙ্‌ক্তির উক্তি তাহারই সঙ্কেত প্রদান করে। তারপর কৃষ্ণ জল হইতে উঠিতে বিশ্ব ভুলিয়া রাধা :

নিমেষরহিত বঙ্ক সরস নয়নে ॥
দেখিল কাহ্নের মুখ সুচির্ সমএ।
সকল লোকের মাঝেঁ তেজি লাজ ভএ ॥

অপূর্ব্ব তদ্গত তন্ময় অবস্থা।

যমুনাখণ্ড হইতে কিন্তু রাধার মনোভাবে ও আচরণে বিপরীতমুখিতার আভাস আছে। অবশ্য এই খণ্ডের প্রারম্ভে রাধার যমুনায় জল তুলিতে যাইবার আগ্রহ এবং পরিশেষে রাধাকৃষ্ণের মিলনের কথা আছে, তথাপি রাধার ব্যবহারে ঠিক ঠিক অনুরাগের সুর লাগে নাই। তাহার গঞ্জনার ভাষা যেন পূর্ব্বের তীক্ষ্ণতা ফিরিয়া পাইয়াছে। যেমন :

বড়ার বহু মো বড়ার ঝী।
আহ্মে পাণী তুলী তোহ্মাত কী ॥…
যার কান্ধ বসে দোষর মাথা।
সেসি আহ্মা সমে কহিবে কথা ॥…
গোআলিনী আহ্মে নহোঁ নাচুনী।
মোর কাজ নাহিঁ তোর কিঙ্কিনী ॥

অথবা :

নাহিঁ চিহ্ন তোহ্মে চক্রপাণী।
তেঁসি মোরে বোল হেন বাণী ॥
কাজ পড়িলেঁ দুষ্ট কাহ্নে।
ইষ্ট মিত্র কাহো নাহিঁ চিহ্নে ॥
হেন দুরুজন সে কাহ্নাঞিঁ।
মামী মাউসী তার ঠায়ি নাহীঁ ॥

ইহা চরমে উঠিয়াছে :

আহ্মে সখি সব বহুত কাহ্নাঞিঁ
এক তোহ্মে এহা তীরে।
মাগুকিলেঁ তোহ্মা কিলায়িআঁ কাহ্নাঞিঁ
নীব যমুনার নীরে ॥

সর্ব্বশেষে রাধিকা অসংবরণীয় বিরাগে হারখণ্ডে যশোদার নিকট কৃষ্ণের বিরুদ্ধে হার চুরির অভিযোগ পর্য্যন্ত আনিল। রাধার এই চিত্ত-বৈরূপ্যকে বহিরঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; এই কৌটিল্য প্রণয়-পর্য্যায়েরই অংশবিশেষ। তথাপি এতখানি বিরূপতাকে নিছক প্রণয়-কুটিলতা বলিতে বাধা আছে। আমাদের মনে হয়, রাধার মনে প্রতিক্রিয়া জাগিয়াছিল। সমাজ এবং সংসারে আবদ্ধ, সামাজিক সংস্কারে আবিষ্ট এই চতুর্দ্দশী কিশোরীর মনে সম্ভবতঃ নিজ কৃতকর্ম্মের যাথার্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিয়াছিল। অপ্রতিরোধ্য হৃদয়-তাড়নায় ইতিপূর্ব্বে সে কৃষ্ণের দিকে ঝুঁকিতে বাধ্য হইয়াছে; কালিয়দমনখণ্ডে প্রেমের সেই প্রকাশ্য আত্মঘোষণা দেখিয়াছি। কিন্তু রাধিকা তো আমাদেরই দেশের মেয়ে, যুগ-যুগান্তরের সংস্কার ও নিষ্ঠাবোধ তাহার মধ্যে জাগ্রত। তাই প্রকাশ্যে সম্পূর্ণ অবৈধ প্রেমের প্রতি আসক্তির পরিচয় দিয়া তাহার পক্ষে প্রত্যাবর্ত্তনের বাসনা স্বাভাবিক। কামনা এবং কামনা-নিগ্রহের প্রচেষ্টা—যমুনা ও হারখণ্ডের মধ্যে সেই মানস-বিপ্লব আমরা প্রত্যক্ষ করি—প্রত্যক্ষ করিয়া নিতান্ত পুলকিত হই। বাস্তবিক সেই অপরিণত এক ভাষার গ্রাম্য এক কবির মধ্যে এতখানি মনস্তত্ত্ববোধ—জীবনদৃষ্টি—আশ্রয়লাভ করিয়াছে! বৃন্দাবন-কালিয়দমনখণ্ড ও বংশী-বিরহখণ্ডের কৃষ্ণমুখী হৃদয়-প্রাবল্যের একমুখী ধারায় যমুনা-হারখণ্ডের প্রতিক্রিয়াজনিত উজানস্রোত বড়ু চণ্ডীদাসের কবিপ্রতিভার স্মারক হইয়া থাকিবে।

কিন্তু এই প্রতিক্রিয়া রাধিকার উত্তাল হৃদয়াবেগকে ঠেকাইতে পারিল না। বরং যমুনা-হারখণ্ডের বদ্ধ শৈলে আহত হইয়া তাহা দ্বিগুণবেগে বংশী-বিরহখণ্ডের উপর আছড়াইয়া পড়িল। বংশী ও বিরহখণ্ডের সেই আর্ত্তি কেবল বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের নয়, আমাদের সমগ্র কাব্যসাহিত্যের একটা সম্পদ। এই প্রেমতরঙ্গকে বংশীখণ্ডের কূলে ভাঙিয়া ফেলাইবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কবি একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। যাহা স্বাভাবিক ভাবে ঘটিতে পারিত, তাহা ঘটাইতে তিনি অপ্রাকৃতের আশ্রয় লইলেন। বাণখণ্ডে তাহার ইতিহাসটুকু আছে।

বাণখণ্ডে আছে, কৃষ্ণ বড়ায়ির সহিত পরামর্শ করিয়া বিরূপা রাধিকার উপর পুষ্পশর প্রয়োগ করিল, ফলে রাধিকা প্রথমে মৃতপ্রায় অচেতন, পরে কৃষ্ণের চেষ্টায় জীবন পাইয়া নিজ স্বরূপ বুঝিতে পারিল এবং কৃষ্ণ-সঙ্গের জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করিতে লাগিল। বাণখণ্ডের এই পুষ্পবাণটিকে রূপক হিসাবে গ্রহণ করিতে আমাদের আপত্তি নাই। যমুনাখণ্ডের পর বংশীখণ্ড মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল, কিন্তু কবির পদক্ষেপ এত সতর্ক, তাঁহার বিচার-বুদ্ধি এমন তীক্ষ্ণ, অনুভূতি এহেন স্পর্শকাতর যে,

তাঁহার নায়িকার পরবর্ত্তী আচরণের পক্ষে তিনি ঐ অপ্রাকৃত সমর্থনটুকু সংগ্রহ না করিয়া পারেন নাই। যমুনা-হারখণ্ডের ঠিক পরেই বংশীখণ্ড আনা যাইত না। মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং সেই প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া দেখাইতে মধ্যে আরো একটি খণ্ড সংযোজিত করার প্রয়োজন ছিল। বাণখণ্ডের মধ্যে সেই প্রয়োজনীয় খণ্ডটির আরব্ধ কার্য্য সারিয়া লইয়াছেন। তবে ঐ খণ্ডে অন্যান্য খণ্ডের অনমুরূপ একটু অতিপ্রাকৃতের আশ্রয় লইয়াছেন। তাহাতে ক্ষতি হয় না। ঐ মদনশর মদনই মারিত, কবি কৃষ্ণের হাত দিয়া শরাঘাত কাজটুকু করাইয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণের শরক্ষেপকে রূপক বলিতে বাধা কি? শকুন্তলা নাটকে দুর্ব্বাসার শাপকে রবীন্দ্রনাথ রূপক বলিয়াছেন। বহুবল্লভ দুষ্যন্তের পক্ষে যে ব্যবহার নিতান্ত স্বাভাবিক, কালিদাস দুর্ব্বাসার শাপরূপ রূপকের অন্তরালে তাহার রূঢ়তা হরণ করিয়াছেন। উপরন্তু তাহাতে ঘটনাবৈচিত্র্যের বৃদ্ধি। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের বাণখণ্ডে কি ঘটনাবৈচিত্র্য বাড়ে নাই?

বাঁশি বাজিয়া উঠিল। 'বাঁশি বাজে বনমাঝে কি মনমাঝে।' রাধাচন্দ্রাবলীর আর আত্মসংবরণের উপায় নাই। তাহার মর্ম্মভেদ করিয়া যে বেদনাধ্বনি বাহির হইয়া আসিয়াছে, বড়ু চণ্ডীদাসের প্রতিভাধারে তাহাই বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ পদের রূপ ধরিল। ঐ 'কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।' বাঁশির শব্দ শুনিয়া রাধার কি অবস্থা:

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিষে যেহ্ন
ঝরএ নয়নের পাণী।

কী প্রতিক্রিয়া:

বড়ার বৌহারী আহ্মে বড়ার ঝী।
কাহ্ন বিণি মোর রূপ যৌবনে কী॥

কী ব্যাকুলতা:

শ্রীনন্দনন্দন গোবিন্দ হে।
অনাথী নারীক সঙ্গে নে॥

এবং কিরূপ আত্মসমর্পণ:

আজি হৈতেঁ চন্দ্রাবলী হৈল তোর দাসী।

এই বেদনার হাত হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত রাধিকা কৃষ্ণের বাঁশি না চুরি করিয়া পারে নাই। বাঁশির সাতটি ছিদ্রের ভিতর দিয়াই তো কৃষ্ণের অনিবার আহ্বান ছুটিয়া আসে, দুর্নিবার গতিতে ছুটিয়া যাই, হৃদহর কৃষ্ণ ধরা যে দেয় না, রাধিকা বাঁশি চুরি করিবে না?—

তোহ্মার বিরহে মোঁ হয়িলোঁ বেআকুলী।
তেকারণে তোর বাঁশী নিলোঁ বনমালী ॥

বংশীখণ্ডের পরই বিরহখণ্ড। কৃষ্ণ ধরা দিয়া দেয় নাই। রাধিকার প্রেম সীমা মানিতেছে না। যত প্রেম, তত অশ্রু। রাধিকা কাঁদিয়া কূল পায় না। বিরহে বিচিত্র মনের অবস্থা। এতদিন লালসায় কৃষ্ণ রাধার দেহবন্দনা করিয়াছে। আজ রাধিকা প্রেমে কৃষ্ণের দেহবিগ্রহ নিরীক্ষণ করিল। রাধার রূপানুরাগ জাগিল—এতদিনে। বংশীখণ্ডে ইহার সূচনা—বিরহখণ্ডে ইহার ব্যাপ্তি :

পাএ মগর খাড়ু হাথে বলয়া
মাথে ঘোড়া চূলা।
ধূলাএ ধূসর নীল কলেবর
সেই সে নান্দের বালা ॥ (বংশীখণ্ড)

বা :

কাল কাহ্নাঞিঁ মাথাতে ঘোড়াচুলে।
সুগন্ধে চন্দনে বড়ায়ি লেপিআঁ গাএ।
করেঁ করতাল মধুর বাঁশী বাএ ॥
কাল কাহ্নাঞিঁ গাএ ধরে পীত বাসে।
ষোল শত গোপীজন যাএ তার পাশে ॥
নেতধড়ী পিন্ধি আগু পাছু লাম্বাএ।
চরণে নূপুর রুণুঝুণু কাঢ়ে রাএ ॥
(শেষ দুই পঙ্‌ক্তির ধ্বনিগুণ লক্ষ্য করিতে বলি)

বা :

নানা আভরণ গলে শোভকএ।
নীল জলদ সম দেহা।

এমন কৃষ্ণকে রাধিকা পাইতেছে না। রাধিকার নিকট পৃথিবী শূন্য, জীবন অসার, যৌবন জঞ্জাল। সুদীর্ঘ বিরহখণ্ড ব্যাপিয়া রাধিকার হৃদয়-মন্থন—প্রাণ-পীড়ন—নানা সুরে ও ছন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। সেই বিভিন্ন বিচিত্র অবস্থার সামান্য অংশ—কখনো আত্মগ্লানি,—পূর্ব্ব দুষ্কৃতির জন্য অনুতাপ—বিপুল আক্ষেপ :

বিরহে বিকল গোসাঞিঁ তোহ্মে বনমালী।
যবেঁ আছিলাহোঁ আহ্মে অতিশয় বালী ॥

পান ফুল না লইলোঁ মাইলোঁ তোর দূতী।
সেহো দোষ খণ্ড মোর মদন মুরুতী ॥…
বারেঁ বারেঁ তোক যত বুইলোঁ আহঙ্কারে।
সেহো দোষ খণ্ড মোর দেব গদাধরে ॥ ইত্যাদি

কখনো কলঙ্কের জ্বালা :

সামী মোর তুরুবার গোআল বিশাল
প্রতি বোল ননন্দ বাছে।
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহ্নাঞিঁর সঙ্গে আছে ॥

বিমুখ ভাগ্যের জন্য আক্ষেপ :

যে ডালে করো মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিঞাঁ পড়ে
নাহি হেন ডাল যাত করো বিসরামে।

বিরহের একমাত্র শান্তি স্বপ্ন-মিলন-ভঙ্গে যন্ত্রণা :

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুনতোঁ বসি
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে ॥

কিন্তু :

দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে।

আর সকলের বড় বেদনা প্রিয়তমের অন্যাসক্তি :

যে কাহ্নু লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ
না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে ॥

তাই রাধিকা বড় দুঃখেই বলিতেছে :

সকল সন্তাপ কাহ্ন সহিবাক পারী।
তোর বিরহ সন্তাপ সহিতেঁ না পারী॥

তথাপি সন্তাপ সহিতে হয়—বিরহের আছে তপন-তাপন শক্তি। তাই কখনো রাধা অর্দ্ধস্ফুট গদ্‌গদস্বরে হৃদয় নিবেদন করে :

আতি দুখিনী বালী ল।
আল
লবলীদলকোঅলী ল।
আল
মদনবাণে পরাণে আকুলী ল॥
বিরহে না মার মোরে ল।
আল
চরণে ধরোঁ তোরে ল॥

কখনো করুণ কাতর অশ্রুনিষিক্ত কণ্ঠে আবেদন জানায় :

আল হের (বড়ায়ি)।
কাহ্নাঞি মোরে আণিআঁ দে।
আল পরাণের বড়ায়ি।
কাহ্নাঞি মোকে আণিআঁ দে॥

এখানে বাণী কত সংক্ষিপ্ত সরল, অথচ কি হৃদয়ভেদী! বুক-নিঙ্‌ড়ানো ব্যথার সুর বোধকরি এমনই হয়। হৃদয় যতই স্পন্দিত, কণ্ঠ ততই স্তিমিত। কিন্তু বেদনার একটা ঐশ্বর্য্যের দিকও আছে। রাধিকার সর্ব্বস্বসমর্পণে মাঝে মাঝে সেই ঐশ্বর্য্যের সুর লাগে। রাধার কৃষ্ণপ্রেমে আর খাদ নাই, সমস্ত বিশ্বসংসারের সামনে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে আপন বেদনা ঘোষণা করিবার অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। বলিবার সুরে অপরূপ উদ্দীপ্তি :

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ (মো) এ সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর॥......

মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনীরূপধরী লইবোঁ দেশান্তর॥
যবেঁ কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে।
হাথে তুলিয়া মো খাইবোঁ গরলে॥

পূর্ব্বে একদিন ঠিক এই কথাগুলিই রাধিকা বলিয়াছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত ভঙ্গিতে। কৃষ্ণের দৃষ্টিক্ষুধায় অবমানিত হইয়া সে নিজ দেহসৌষ্ঠবকে বিনাশ করিতে চাহিয়াছিল; আজ কৃষ্ণের সেই নয়ন ও প্রাণের ক্ষুধার আশ্রয় হইতে পারে নাই বলিয়া সে ধনযৌবনকে বিসর্জ্জন দিতে চায়। কবি আয়রনির প্রলোভন ছাড়িতে পারেন নাই।

তাম্বূলখণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া বিরহখণ্ডে আসিয়া রাধিকার সুদীর্ঘ জীবনচর্য্যা সমাপ্ত হইল। বিরহখণ্ডের শেষভাগে ক্ষণস্থায়ী মিলনের অন্তে সুচিরকালের বিচ্ছেদে রাধিকার মর্ম্মান্তিক হাহাকারের মধ্যেই সম্ভবতঃ কাব্যের সমাপ্তি। একদিন যে বালিকাটি দুইচক্ষে অগ্নি লইয়া অসামাজিক প্রেমের বিরুদ্ধে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সেই নীতি-বিগর্হিত প্রেমের জন্য দুই চক্ষুতে অশ্রু কুলাইল না, সমস্ত হৃদয় ভরিয়া শ্রাবণ নামিল। এই সম্পূর্ণ পৃথক দুই প্রান্তের যোগসূত্র রচনা করিয়াছে বড়ু চণ্ডীদাসের অনুপম কবি-প্রতিভা। রাধিকার রূপদান করিতে বড়ু চণ্ডীদাস যে কবিকৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা এই বিশিষ্ট ক্ষেত্রে অতীব উপযোগী। সমগ্র কৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যটি লিরিক, ড্রামা ও ন্যারেটিভের বিচিত্র সমন্বয়। একজন জীবন্ত মানুষের চরিত্রাঙ্কন করিতে হইতেছে বলিয়া ঐ তিন পন্থা কাব্যের মধ্যে সার্থকভাবে মিলিতে পারিয়াছে। কারণ জীবন নিছক লিরিক নয়, নিছক ড্রামা নয়, নিছক ন্যারেসনও বলা যায় না—ঐ তিনের সমন্বয়—হয়ত অধিক কিছু। কৃষ্ণের সহিত রাধিকার কলহের রূপায়ণে ড্রামাটিক কলাকৌশল-অবলম্বন অত্যন্ত উপাদেয়। দুইটি নরনারীর দ্বন্দ্বকলহের ভিতরে কবির অনুপ্রবেশ অতিশয় অনুচিত হইত। কবি নাট্যকারের মত এখানে নিজেকে অপসৃত রাখিয়াছেন বলিয়া ঐ দু'টি চরিত্র অমন স্বকীয় দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিতে পারিল। তাহার কিছু কিছু পরিচয় পূর্ব্বে লইয়াছি। আবার কৃষ্ণ-প্রেম এবং কৃষ্ণ-বিরহে রাধিকার অশ্রুসিন্ধুতে যখন জোয়ার আসিয়াছে তখন কাব্যেও লিরিক ভাববন্যা। কবি আপন হৃদয়বেদনা রাধিকার কাতরোক্তির মধ্যে উজাড় করিয়া দিয়াছেন। আর ঐ লিরিক ও ড্রামার মধ্যে সংযোগ রচিয়াছে আখ্যানের সূত্র—ন্যারেশন।

তথাপি কাব্যের শেষাংশের লিরিক সুর সর্ব্বাংশে কবির আত্মভাবগীতি হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার জন্য কবির অসামান্য সঙ্গতিবোধ দায়ী। বড়ু চণ্ডীদাস

রাধার মধ্যে একজন মানুবী—একজন কিশোরী-যুবতীর চিত্র আঁকিয়াছেন। এই কিশোরীর চিত্তে প্রেমোন্মেষ ও তাহার পরিণতি তিনি দেখাইয়াছেন। প্রথম দেহ-মিলন ও তাহার ফলস্বরূপ শনৈঃ শনৈঃ প্রেম-জাগরণ যে কিরূপে ঘটিল—সে সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রথমেই করিয়াছি। ঐ সঙ্গে বিচার্য্য, দেহমথনের মধ্য দিয়া যে প্রেম জাগিয়াছে, তাহা দেহকে যতই ছাড়াইয়া যাইতে চাউক, সম্পূর্ণ ছাড়িতে পারে কি? সংশয় থাকে। বড়ু চণ্ডীদাস অন্ততঃ যে নারীটিকে অতি সতর্কভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণ এবং পরিচিত্রণ করিয়াছেন, সে যে সম্পূর্ণ পারে নাই, তাহা সত্য। বংশী ও বিরহখণ্ডে রাধিকা অতি উচ্চ সুরে কথা বলিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সমস্ত আক্ষেপবাণীর মধ্যে দেহসম্ভোগের তৃষ্ণা মিশাইয়া ছিল। ইহাতে কাব্যের কোনই হানি ঘটে নাই—বরং তাহা কাব্যকে স্বাভাবিকত্ব দান করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বিরহখণ্ডের যে সকল উৎকৃষ্ট কবি-পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, সেগুলি লক্ষ্য করিতে বলি,—ঐ সম্ভোগের স্বপ্ন-দর্শনমূলক পদটি, কিংবা 'যে কাহ্ন লাগিআঁ মো,' 'এ ধন যৌবন বড়ায়ি' ইত্যাদি। দেখা যাইবে বিরহের প্রায় সকল পদেই দেহসম্ভোগ-বিরতিজনিত হতাশা ফুটিয়াছে—দেহবিস্মৃতি নাই। থাকিলেই হতাশার কারণ ঘটিত। কারণ বড়ুর কাব্যের রাধা একজন মানবী, দেবী নয়। পদাবলীর চণ্ডীদাসের রাধার সঙ্গে এই রাধার তুলনা চলে। সেখানে রাধা সন্ন্যাসিনী, এখানেও খানিক তাই। তথাপি উভয়ের যথেষ্ট পার্থক্য। সে রাধা জন্ম হইতে যোগিনী—একটি বিশেষ ভাবকে অঙ্গীকার করিয়া তাহার জন্ম। সে ভাব ভোগমুখী নয়—তাই তাহার ভোগলিপ্সা অল্প। সে যথার্থ মহা-ভাবময়ী হইবার গুণ ধরে। তাহার কাতরোক্তির উপর কবির ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাস ঢালিয়া দিতে বাধে নাই। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সে কোন পৃথক ব্যক্তিত্ব নয়—ভাবের রূপ—রসের পুঞ্জ। অথচ বড়ুর কাব্যে রাধিকা বিশিষ্ট চরিত্র, শুধু ভাবময়ী নয়—জীবনময়ীও। সুতরাং তাহার বেদনা অথবা আনন্দ বিশুদ্ধরূপে যত নির্ব্বিশেষই হউক, ঐ 'বিশেষ' একেবারে ঘুচিবার নয়। তাহার মানবীসুলভ ভোগলিপ্সা ঐ 'বিশেষ'। তাহাকে মুছিতে পারেন নাই বলিয়া,—আর্টিস্ট হিসাবে জীবন-বিমুখতাকে অস্বীকারের ক্ষমতা ছিল বলিয়া,—বড়ু চণ্ডীদাস একজন সার্থক কবি।

বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের কবিধর্ম্মগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বড়ু এবং বিদ্যাপতি, এই দুইজন কবি রাধিকাকে শিশুকাল হইতে লালন করিয়া যৌবন-স্বর্গে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের দুইজনকেই—রাধাকে প্রেমময়ী করিয়া তুলিবার পূর্ব্বে—যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে,—উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া যত্নসহকারে রাধাকে সেখানে স্থাপন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইয়াছে। অতএব স্বভাবতঃই

তাঁহারা রাধার পথ হইতে নিজেরা সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। স্বাভাবিক ভাবে রাধাকে জীবন-রস সংগ্রহ করিতে দিয়া তাঁহারা কবি হিসাবে মালঞ্চের মালাকরের ভূমিকা লইয়াছেন। ফলে উভয়ের দৃষ্টিতে তন্ময়তা ও নাটকীয়তা প্রাধান্যযুক্ত। এইজন্যই শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা রাধার ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। রাধার বেদনা যেখানে সর্ব্বজনীন—বেদনা একসময় সর্ব্বজনীন হইয়া ওঠেই—সেখানে কবি একজন দ্রষ্টার অনুভবমতই রাধার বেদনা আত্মগত করিয়াছেন—কিন্তু তাহার বেশী অগ্রসর হইতে পারেন নাই—অর্থাৎ হন নাই। বড়ু চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির কাব্যে রাধার বেদনা,—হৃদয়োৎকণ্ঠার সর্ব্বোচ্চ স্তরেও—রাধারই বেদনা, কবির বেদনা নয়। বিষয়ের সঙ্গে আর্টিস্টের এই ব্যবধান পদাবলীর চণ্ডীদাস বা জ্ঞানদাসের মধ্যে নাই। সেখানে কবি ও রাধা একাকার।

তথাপি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে যে কবিকৌশল ও কবিভাবনাগত পার্থক্য নাই এমন নয়। একথা সত্য, বয়ঃসন্ধি প্রভৃতি পর্য্যায়ে বিদ্যাপতি অকুণ্ঠিত বাস্তবতা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিক্ষুধার পরিচয় রাখিয়াছেন; সেখানে উপমা-নির্ব্বাচন হইতে সুরু করিয়া সমস্ত কিছু লৌকিক জীবনানুসারী। চণ্ডীদাসেও এই লৌকিক জীবন ও তাহার চিত্রণ। তবে পার্থক্য কোথা? বিদ্যাপতি যতই বাস্তব জীবন অবলম্বন করুন, তাঁহার প্রতিভার মূলে আছে একটা আলঙ্কারিক দৃষ্টিভঙ্গি—রাজসভার বৈদগ্ধ্যের স্থায়ী মুদ্রণ। বয়ঃসন্ধির কাল হইতে তিনি রাধিকাকে নিরীক্ষণ করিতে পারেন, এবং সে দৃষ্টি হয়ত বাস্তবও, তবু ঐ বাস্তবতা সীমাবদ্ধ। ঐ সকল পদ পর্য্যায়ে রাধিকার জীবনের যে স্থানটুকুর উপর দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সেই স্থানে হয়ত আলঙ্কারিকতা তেমন করিয়া চাপান নাই, কিন্তু ঐ দৃষ্টিমুখে জীবনের অংশ নির্ব্বাচন ও গ্রহণ-রীতির মধ্যে একটা সীমাবদ্ধতা আছে। বিদ্যাপতির রাধা দেবী নয়, আবার সর্ব্বাংশে মানবীও নয়। বিদ্যাপতির কৃতিত্ব, তিনি তাঁহার মানসী-প্রতিমা-রূপিনী এই রাধামূর্ত্তির উপর নিজের বাস্তব-দর্শনের ঐশ্বর্য্য চাপাইতে পারিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা সর্ব্বাংশে বাস্তব নারী। বড়ু কোন রাজসভার কবি নহেন; তিনি শিক্ষিত হইতে পারেন, কিন্তু বিদ্যাপতির আলঙ্কারিক কবি-ব্যক্তিত্ব তাঁহার ছিল না। তিনি সহজ স্বাভাবিক জীবনরসের রসিক। সুতরাং সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে নয়, সমগ্র জীবনপ্রশ্নেই বড়ুর বাস্তবতা।

বড়ু চণ্ডীদাসের বাস্তবতার স্বরূপ—যাহা রাধা-চরিত্রের মধ্যে পূর্ণ বিকশিত—বুঝা যাইবে পরবর্ত্তী পদাবলী হইতে অপর উদাহরণ গ্রহণ করিলে। পরবর্ত্তীকালের পদে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যভাব যথাসম্ভব পরিহার করিয়া মাধুর্য্যরসের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

তাহার সহিত ভক্তিরসের মিশাল আছে। মাধুর্য্য সিক্তিত রাধা ও কৃষ্ণ সাধারণের মত হইয়াও সম্পূর্ণ সাধারণ হয় নাই—একটু স্বাতন্ত্র্য থাকিয়া গিয়াছে। কবিগণের অতীন্দ্রিয় ভাবাকুলতা এবং ভক্তিপ্রাণতা সাধারণ মানবজীবনের প্রেমলীলার ইতিবৃত্তকে ভিন্ন লোকে স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্যভাব। ঐ ঐশ্বর্য্য একেবারে বহিরঙ্গ খোলসের মত কাব্যের গায়ে লাগিয়া আছে। একবার যদি ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বর বিচ্ছিন্ন করা যায় তবে কৃষ্ণ নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর একটি গ্রাম্য যুবক হইয়া দাঁড়ায়। পাঠক সম্ভবক্ষেত্রে আরোপিত ঐশ্বর্য্য বর্জ্জন করিয়া কাব্যাস্বাদ করিবার ক্ষমতা রাখে। তাই তাহাদের পক্ষে রাধা ও কৃষ্ণের মানবিক সম্পর্কের রসটুকু সম্পূর্ণ উপভোগ করা সম্ভব হয়। তদুপরি বড়ু চণ্ডীদাস লৌকিক উপমা উৎপ্রেক্ষা এবং গ্রাম্য কথ্যবুলিকে পরিমার্জ্জিত করিয়া এইরূপে কাব্যে নিবেশিত করিয়াছেন যে, ঐ কাব্যের বাস্তবরস আমাদের প্রত্যক্ষে বিদ্ধ করে। কিন্তু পরবর্ত্তী মাধুর্য্যময় কৃষ্ণকে এমন নিরঙ্কুশ বাস্তব ভাবা সম্ভব নয়। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য নির্গলিত হইয়া যখন মধুর ও ভক্তিরসের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, তখন সেই কৃষ্ণ—পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছি—মানুষের গা ঘেঁষিয়া আসিলেও সম্পূর্ণ মানুষ হয় নাই, অতএব বাস্তবতার সুরটি অকুণ্ঠিত নয়। যেখানে কৃষ্ণ একজন সাধারণ মানুষের মত চিত্রিত,—অথচ না দিলে নয় বলিয়া মাঝে মাঝে তাহার ঐশ্বর্য্যভাবের সাড়ম্বর গাহনা দেওয়া হইতেছে, সেখানে ঐশ্বর্য্যের চাপরাশ খুলিয়া তাহাকে প্রাকৃত জনের আসরে সহজে টানিয়া আনিতে পারি। আর যেখানে ঐশ্বর্য্য নির্য্যাসে পরিণত হইয়া দেহপ্রাণের বলাধান করিতেছে, সেক্ষেত্রে অত সহজে তাহাকে দেব-মহিমাহারা করিতে পারি না। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে বাস্তবতার অন্যতম কারণ,—আমার বিশ্বাস,—ঐ ঐশ্বর্য্য ও মানবিকতার অমিশ্রণ, যাহার মধ্য হইতে মানবত্বকে সহজেই পৃথক করিয়া লওয়া সম্ভব।

জ্ঞানদাস

বৈষ্ণব কবিকুলের মধ্যে, আধুনিককালে লিরিক-প্রতিভা বলিতে যাহা বুঝি, তাহা যদি কাহারও থাকে, তবে জ্ঞানদাসের। জ্ঞানদাসের গাঢ় গভীর অনুভূতির আকৃতি ছিল এবং জ্ঞানদাস জানিতেন কেমন করিয়া সেই অনুভূতিকে সংহত তীব্র আকারে প্রকাশ করিতে হয়। অনুভূতির গভীরতার দিক হইতে চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস অপেক্ষা অনেক অগ্রসর; কবিতার রূপবিলাস ও মণ্ডনকলার বিচারে গোবিন্দদাসের আসন জ্ঞানদাসের ঊর্দ্ধে। কিন্তু এই উভয়ের সমন্বয়—রূপ ও রসের যথাযথ মিশ্রণ ও তদ্দ্বারা কাব্যমূর্ত্তি গঠনের প্রতিভা জ্ঞানদাসে যেরূপ তাহা,—যদি স্পর্দ্ধা বিবেচিত না হয় বলিব, অন্যত্র দুর্লভ। অনুভূতির অতি-গভীরতা এবং কূলপ্লাবী উন্মাদনা সাধকোচিত ভাবাঙ্গ-সৃজনে অক্ষমতার সহিত যুক্ত হইয়া চণ্ডীদাসকে অনেকাংশে মিষ্টিক কবি করিয়া তুলিয়াছে এবং ভাব-ব্যতিরেকেই বহুতর ক্ষেত্রে অনুপম প্রকাশ-ভঙ্গির অনুশীলন ও তাহার অভিব্যক্তির পরীক্ষা গোবিন্দদাসকে রূপদক্ষ আলঙ্কারিকতায় প্রায়শঃ আত্মতুষ্ট রাখিয়াছে। ঐ ঐ কবির প্রতিভার নিজস্বতার দিক অর্থাৎ উৎকৃষ্টতর রস ও রূপপ্রতিভার পদতলে প্রণতি জানাইয়া ভাব ও বাণীর যে কাব্যপ্রয়াগ জ্ঞানদাস রচনা করিয়াছেন, নিম্নতর ক্ষেত্রে বলরামদাস ছাড়া তাহার অনুরূপ বৈষ্ণব-সাহিত্যে নাই। তুলনা করিয়া বলিতে গেলে, চণ্ডীদাসের রসহিল্লোল জ্ঞানদাসে নাই, গোবিন্দদাসের হীরক-কাঠিন্যও তাঁহাতে পরিদৃষ্ট হয় না, কিন্তু লাবণ্যকে অনায়াসবন্ধনে বাঁধিয়া অতি চমৎকার মুক্তাহার রচনার গৌরব তাঁহার প্রাপ্য। রবীন্দ্রনাথের "ইন্দ্রাণীর" রূপের মতই অনেকটা জ্ঞানদাসের কবি-প্রতিভা "আপনার মধ্যে একটা প্রবল বেগ এবং প্রখর জ্বালা একটি সহজ শক্তির দ্বারা অটল গাম্ভীর্য্যপাশে অতি অনায়াসে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যুৎ তাহার মুখে চোখে এবং সর্ব্বাঙ্গে নিত্যকাল ধরিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে।"

জ্ঞানদাসের কবিতাকে লিরিক ভাবসম্পন্ন বলিয়াছি। জ্ঞানদাস বৈষ্ণব কবি; কোন বৈষ্ণব কবির পদকে লিরিক বলিয়া ওঠা একটু বিপদের। এখানে লিরিক কবিতাসুলভ সুতীব্র রসানুভূতির উজ্জ্বল সংহত প্রকাশ হয়ত থাকে, কিন্তু সেই অনুভূতি কবি-ব্যতিরিক্ত অন্য একজনের ব্যক্তিসত্তার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। লিরিক কবিতায় কবির আত্মভাব অথবা মন্ময়তা সর্ব্বপ্রধান। সেই মন্ময় দৃষ্টির

আলোকে বস্তুর স্বীকৃত সাধারণ প্রকৃতির পরিবর্তন পর্য্যন্ত ঘটে। বিশ্বকে দেখিবার দৃষ্টিভঙ্গি এবং আপনাকে প্রকাশ করিবার রীতি সমস্তই স্রষ্টার হৃদয়বাসনায় রঞ্জিত হয়। সামান্যকে বিশেষ করিবার কবি-প্রাণতা লিরিক কবিতায় দেখিতে পাই। সেখানে নির্দ্দিষ্ট কবি-রীতি অথবা প্রথাগত বস্তু ও দৃশ্যসংস্থানের মর্য্যাদা নাই। বৈষ্ণবকাব্য কিন্তু আধুনিক অর্থে মন্ময়কাব্য নহে। উহাতে রূপের কথা বাদ দিলেও ভাবের কথা, হৃদয়ের কথা যেখানে প্রকাশ পাইয়াছে, সেখানে তাহা রাধা অথবা কৃষ্ণের হৃদয়ভাব। পদাবলীতে কেবল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অনুগত ভাব ও ভাবনার অবসর রহিয়াছে। সুতরাং পাঠকের পক্ষে কবির নিজস্ব আবেগ, ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার অনুরঞ্জন বলিয়া কোন কিছুকে গ্রহণ করা শক্ত হইয়া পড়ে।

তথাপি কবি-প্রাণের আবিষ্কার—বৈষ্ণবপদে—কি একেবারেই অসম্ভব? পদাবলী সাহিত্যে দুই শ্রেণীর পদকার আছেন; এক শ্রেণী মূলতঃ বস্তুবিদ্ধ অথবা রূপ-তন্ময়। তাঁহাদের কাব্যে যেখানে ভাবের কথাও আছে, তাহা বিভাবাদির হৃদয়ভাব। শিল্প ও শিল্পীর মধ্যে দূরত্ব বজায় আছেই। বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস এই শ্রেণীর কবি। আবার অন্য এক শ্রেণীর পদকর্ত্তা আছেন যাঁহারা মূলতঃ ভাববিদ্ধ—প্রাণতন্ময়। তাঁহারা যখন কথা বলেন, রাধার মুখে বসিলেও তাহা ঐ কবিদের নিজের কথাই থাকিয়া যায়। সে সময় রাধার মুখের বাণী নিত্যকালের বাণী হইয়া ওঠে এবং সেই নিত্যকালের বাণীকেই কবি রসসৃষ্টির বিশেষ কৌশলে নিজস্ব করিয়া লন। রাধা যে কথা বলিতেছে, অনুরূপ অবস্থায় যে কোন নারী তাহা বলিতে পারে, রাধার কথার মধ্যে 'বিশেষত্ব' কিছু নাই, তাহা ভাবে ও রসে সর্ব্বজনীন। এই সর্ব্বজনীন আনন্দ-বেদনার ভাষাটুকু যাঁহারা বৈষ্ণবকাব্যে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহারা হইতেছেন চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস। বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের তুলনায় এই দুইজনের মন্ময়তার অন্যতম প্রমাণ ইঁহারা যেসব 'রূপকল্প' ব্যবহার করিয়াছেন তাহার অনেকগুলিই ইঁহাদের স্ব-ভাবিত! বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস চিত্র বা উপমাব্যবহারে অতিশয় আলঙ্কারিক। আপনাকে নিরপেক্ষ রাখিয়া যখন রূপলোক নির্ম্মাণ করিতে হইতেছে—যে রূপলোক আবার রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত বৃন্দাবন—সেখানে প্রাকৃত জীবন হইতে কাব্যবস্তুকে দূরে রাখিবার জন্য প্রাচীন কবি-ব্যবহৃত উপমা উৎপ্রেক্ষার শরণ লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। প্রতীকধর্ম্মই রাধাকৃষ্ণ-লীলার উপর অপার্থিবতার ব্যঞ্জনা আরোপ করিতে পারে। বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাস সেই চেষ্টাই করিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের হৃৎ-মর্ম্মেই রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন। চক্ষু বা মন দিয়া নয়, হৃদয় দিয়া কবি যখন দেখিয়াছেন, তখন তাঁহার কাব্যে ব্যক্তিগত আবেগ অনুরাগের সুর

লাগিবেই—অভিনব রূপকল্পনার প্রাদুর্ভাব ঘটিবেই। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উক্তির কথা মনে আসে : তাঁহার অপূর্ব্ব রসোজ্জ্বল ভাব-গভীর, অতি যথার্থ তুলনাগুলি নিত্যনূতন কিরূপে বাহির হইয়া আসে, তাহার উত্তর দিতে গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন,—"মা রাশ ঠেলে দেয়। দেখনি, মেয়েরা ধান কুটবার সময় একজন কেমন ক'রে ঢেঁকির গর্ত্তে ধানের রাশ ঠেলে দেয়?" নিজস্ব ভাবানুভূতি বা দর্শনের বিশেষ সুযোগ এই—কাব্যে 'চিত্র বা দৃশ্যের' অভাব হয় না, উপমা-উপমানের 'রাশ' মনের ভিতর হইতে ঠেলিয়া আসে। যে কবিদৃষ্টি বস্তুর মর্ম্মভেদ করে, তাহাই অভিনব সামঞ্জস্যের আলোকে দুইটি আপাত-বিপরীত বস্তুকে একত্রে গাঁথিতে পারে।

এই স্বকীয় উপলব্ধির ব্যাপারে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস তুলনীয়। মন্ময়তা উভয় কবিরই ছিল, এবং ব্যক্তিগত হৃদয়োত্তাপ তাঁহারা কাব্যে সঞ্চারিত করিতে পারিতেন। তথাপি চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের মধ্যে ক্ষেত্র-বিশেষে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য কাব্যের পরিণতির ব্যাপারে। উভয় কবি একই ভাবে আরম্ভ করেন কিন্তু চণ্ডীদাস তাঁহার কাব্যের সমাপ্তিতে ব্যক্তিগত অনুভূতিকে এমনই নির্ব্বিশেষ করিয়া ফেলেন যে, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার কাব্যরূপ অনেকাংশে শিথিলতা পায়। চণ্ডীদাসে যে পরিমাণে গভীরতা ছিল, সেই পরিমাণে রূপসৃষ্টির ক্ষমতা ছিল না, অথবা তাহা যদি সত্য নাও হয়, রূপকে বজায় রাখিবার বাসনাই তাঁহার ছিল না। চণ্ডীদাসের কাব্যের বিচ্ছিন্ন পঙ্‌ক্তি রূপের ক্ষণিক চাঞ্চল্যমাত্র সৃষ্টি করিয়া একাকারের ভাবপ্লাবনে আত্মহারা হইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত তিনি মিষ্টিক। "চলে নীল সাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর"—এই ধরণের খাঁটি রোমান্টিক রসানুভূতি কবি অল্প-ক্ষেত্রেই প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাকে অতিক্রম করিয়া এক অতীন্দ্রিয় ভাবাকুলতায় প্রাণসমর্পণ করিতে তাঁহার পরম তৃপ্তি। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহার কাব্যে রূপরহস্য নয়—অপার্থিব ভক্তিপ্রাণতাই জয়যুক্ত হইয়াছে। "বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে মহাযোগিনীর পারা"—ইহা চণ্ডীদাসের কাব্যের একটি মূল ভাব। 'আক্ষেপানুরাগে', 'আত্মনিবেদনের' ভক্তিস্তোত্রে তাঁহার প্রতিভার বিশেষ বিকাশ ঘটিয়াছে। জ্ঞানদাসের মধ্যেও ভক্তিপ্রাণতা আছে সত্য, এবং তাঁহার আত্মনিবেদনও চমৎকার। তথাপি জ্ঞানদাসের কাব্য মিষ্টিক হইয়া পড়ে নাই, তাঁহার কাব্যের একটি মূল ধর্ম্ম—আমার মনে হয়—রোমান্টিকতা। রোমান্টিক রহস্যময়তায় জ্ঞানদাসের কাব্য পূর্ণ। এই রহস্যময়তাটুকু তাঁহার নিজস্ব সম্পদ, তাবৎ বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের কবিধর্ম্মের সহিত জ্ঞানদাসের পার্থক্য এইখানে। জ্ঞানদাসের মধ্যে

একটা অনির্দ্দিষ্ট কিছু—তাঁহা আধ্যাত্মিক হইবার প্রয়োজন নাই—আভাসিত করিবার শক্তি ছিল। তিনি বুঝিতেন কোথায় থামিতে হয়, কোথায় থামিলে পাঠকের ভাবাকুল হৃদয় নিজস্ব কিছু সৃষ্টি করিয়া অসমাপ্তকে আপন মনে সমাপ্ত করিয়া লয়। একটি উদাহরণ লইলে জ্ঞানদাসের এই স্বতন্ত্র শক্তিটুকুর প্রকৃতি ধরা পড়িবে। পূর্ব্বরাগের এক পদ আরম্ভ হইতেছে :

আলো মুঞি জানো না সই জানো না
জানো না গো জানো না।

—এ কাহার ভাষা? একই কথা আকুলভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পরম অনুনয়ের সুরে প্রকাশ করিতেছেন যিনি, তিনি বাহ্যতঃ হয়ত রাধিকা, আসলে স্বয়ং কবি। এ যেন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে,—এক রোমান্টিক কবির কণ্ঠে,—স্পন্দমান হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অকারণ অনুনয়ের সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। ঐ ব্যাকুলতার একটা বাহ্য কারণ কবি দেখাইয়াছেন, সে কারণটুকু কোনমতে যথেষ্ট নয়,—'জানো না সই জানো না, জানো না গো জানো না'—এই সঙ্গীত, এই সুর কারণহীন আবেগে জাগে। "নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে, ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের বাহিরে"—ঘর হইতে বাহিরে না যাইতে অনুরোধের কারণ কি বর্ষার মেঘাড়ম্বর, বৃষ্টির ভয়, বজ্রপাতের আশঙ্কা? এত ক্ষুদ্র হেতু, এত স্থূল যুক্তি? নহে নহে। আষাঢ়ের ঘনাচ্ছন্ন দিনে যখন বর্ষা তাহার মেঘময় বেণী এলাইয়াছে, তখন কবির মনে না জানি কেন, এই কথাটাই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল—ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের বাহিরে। কৃষ্ণ কদম্বতলে দাঁড়াইয়া আছে—রাধিকা বলিতেছে, তাহা জানিলে ঐ স্থানে যাইতাম না—এই হেতু-নির্দ্দেশই কি ঐ সুরময় বাণীর, গুঞ্জনধ্বনির শেষ কথাটুকু বলিয়া দিয়াছে, না রাধিকা অর্থাৎ কবি বলিবার আনন্দেই বলিতেছেন—"জানো না সই জানো না ....."। ইহার পর যে চারিটি পঙ্‌ক্তি আছে তাহা যে কোন সাহিত্যের গৌরব হইতে পারে :

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া না জানি কি করে প্রাণ॥

এ কোন্ যুগের কবি-বাণী? এমন করিয়া বলা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাহারো পক্ষে আমাদের দেশে সম্ভব কি? সুদীর্ঘ কয়েকশত বৎসর পূর্ব্বে জ্ঞানদাস এই কবি-ভাষা আবিষ্কার করিলেন কিরূপে? আদ্যন্ত রোমান্টিক না হইলে কাহারও

লেখনীর মুখে এই বাণী আসিতে পারে না। ইহার রহস্যময়তার মর্মভেদ কেবল অনুভবে, ব্যাখ্যায় নয়, বিশ্লেষণে নয়। নিতান্ত আধুনিক কালের কবিভাবনার মধ্যেই ইহার অনুরূপ কিছু খুঁজিয়া পাইয়াছি। রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া গিয়াছে, যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল—আধুনিক কবির হৃদয়-অরণ্যে পথ হারাইবার কথা শুনিয়াছি বটে। 'ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ'—এ পথ যে কেন ফুরায় না, কেমনই বা এই পথ, এ পর্য্যন্ত কেহ সেকথা বলিতে পারে নাই। বলিতে পারে নাই অথচ বলিতে ছাড়ে নাই; না-বলার আবেগ, না-পাওয়ার অতৃপ্তি, না-থামার আনন্দ—ইহা বিমিশ্র অনুভূতির যে কলতান অন্তরে বাজাইয়া তোলে তাহাতে—'অন্তরে বিদরে হিয়া না জানি কি করে প্রাণ'. না জানিবার রস-রহস্য-বিলাসেই যুগে যুগে কবি-চিত্ত উল্লাস-মথিত।

জ্ঞানদাসের এই বিশিষ্ট কবি-মর্ম ছিল। ইহার বহু প্রমাণ তাঁহার কাব্যে মিলিবে। প্রায় সকল পদকর্ত্তার মধ্যেই খুঁজিলে দুই-চার পঙ্‌ক্তি এইরূপ রহস্যদ্যোতক অংশ আবিষ্কার করা যায়, কিন্তু জ্ঞানদাসেই ইহার সবিশেষ প্রাচুর্য্য। জ্ঞানদাসের রাধা বলিতেছে :

শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণে নেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল
ভিন্ ভিন্ করি দেহা॥

ইহা অতিশয় রোমান্টিক উক্তি—ইহাকে নিছক আধ্যাত্মিক বলিলে মানিব না। "শিশুকাল হৈতে" পাঠ করিলেই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় কাব্যাংশ :

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগলপ্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হতে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়নসলিলে,
মিলনমধুর লাজে।

অন্যত্রও জ্ঞানদাস যুগ হইতে যুগান্তরে অবিচ্ছিন্ন প্রেমোপলব্ধির কথা বলিয়াছেন :

শুন বিনোদিনী প্রেমের কাহিনী
পরাণ রৈয়াছে বান্ধা।

'একই পরাণ দেহ ভিন্ ভিন্
জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা ॥

অথবা :

তোমার আমার একই পরাণ
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ার হৈতে বাহির হৈয়া
কেমনে আছিলা তুমি ॥

চণ্ডীদাসের কাব্যে অনুরূপ দু'একটি পঙ্‌ক্তি আছে বটে ("হৃদয়ে আছিল বেকত হইল দেখিতে পাইনু সে"......"শিশুকাল হইতে শ্রবণে শুনিনু সহজ পিরীতি কথা" ইত্যাদি), তথাপি জ্ঞানদাসেই যেন এই ভাবটির সহজ স্বাভাবিক অধিকার।

জ্ঞানদাস কয়েকটি উৎকৃষ্ট বংশীমূলক পদ রচনা করিয়াছেন। তাহা সম্ভব হইয়াছে, আমার বিশ্বাস, কবির রহস্য-প্রিয়তার জন্য। বাঁশ বস্তুটি যতই স্থূল হোক, বাঁশি সূক্ষ্ম ও সুকুমার। আবার তাহার রন্ধ্রপথে যে সুরোৎসারণ তাহার মত অনির্দ্দেশ্য আর কিছু নাই। বাঁশিতে abstract music। তাহার কোন ভাষা নাই, তাই সে যে বেদনা জাগায় তাহাও ভাষা পায় না, অথবা যে ভাষা পায় তাহা ভাষাহীন সুরেরই সগোত্র। চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির বেদনার একটা কারণ আছে, উভয়ের বেদনার রূপ অবশ্য পৃথক। জ্ঞানদাসের একটা আপাত কারণ আছে বটে, কিন্তু তাহাই সবটুকু নয়—অকারণে তাঁহার আঁখি ছলছল করিয়া আসে, মিলনের মদির মুহূর্ত্তে বিরহের তপ্তশ্বাস কোথা হইতে বহিয়া যায়। বাঁশি সেই অকারণ আনন্দ-বেদনার সুরকে মুক্ত করিয়া দেয়। কত বিস্মৃত দিনের, হয়ত অতীত যুগের, সঞ্চিত স্মৃতির গোপন অবিকচ মুকুলটিকে বাঁশির সুর একবার সন্তর্পণে ছুঁইল, তারপরেই উধাও, তবু তাহার অদৃশ্য সূক্ষ্ম গতিরেখা বাহিয়া সহসা-জাগরিত মনটি ছুটিয়া চলিতে চায়, অর্থাৎ কাল-সঞ্চিত রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া যায়, যুগ-পুঞ্জিত যৌবনের বনে মন হারাইয়া যায়, ঘরে যাইবার চিরাচর পথ কোনদিন ফুরায় না। নিদ্রিতকে জাগাইয়া, পথে নামাইয়া, পথ ভুলাইয়া দিবার শক্তি বাঁশির আছে, তাই হয়ত জ্ঞানদাসের বাঁশির প্রতি প্রীতি—কে জানে! অন্য কবি বংশীধ্বনির ফলাফল লইয়া কাব্য করিয়াছেন,—শারদরাত্রিতে 'মুরলী গান পঞ্চম তান' শুনিয়া গোপবধূদের অবস্থার রসোত্তীর্ণ প্রকাশ আছে গোবিন্দদাসের কাব্যে, কিন্তু নিছক বাঁশিকে লইয়া কাব্য বোধকরি জ্ঞানদাসই করেন। যে বাঁশি রাধার হৃদয়ে এমন বিপর্য্যয় আনিয়া দেয়, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির মর্ম্মকোঠায় সে কোন্ আমন্ত্রণের সুর বহন করে সে সম্পর্কে কবির যথেষ্ট কৌতূহল :

কোন রন্ধ্রে বাঁশি বাজে অতি অনুপাম।
কোন রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম॥
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশি সুললিত ধ্বনি।
কোন রন্ধ্রে কেকাশব্দে বাজে ময়ূরিণী॥
কোন রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন রন্ধ্রে কদম্ব ফুটয়ে প্রাণনাথ॥ ইত্যাদি

সপ্তরন্ধ্রা বাঁশির কোন্ রন্ধ্রটি হইতে কোন্ অঘটনটি ঘটে সে বিষয়ে কৌতূহল স্বাভাবিক এবং সমাধানহীন। বস্তুতঃ বিশ্বাসঘাতকতাই বাঁশির ধর্ম্ম:

নিজ নাম শ্যাম তখন বাঁশি পুরে আধা।
নাহি বাজে শ্যাম নাম বাজে রাধা রাধা॥
ফিরিয়া আপন নাম বাজাইতে চায়।
শ্যামের মুখে শ্যামের বাঁশি রাধা নাম গায়॥

রোমান্টিক মনোভাবের একটি স্বতঃসিদ্ধ গতি বিষাদের দিকে। ইহা আনন্দমুখী নয়। জ্ঞানদাসের কাব্যে আমরা প্রায়ই একটা রোমান্টিক বিষাদের সুরকে বাজিয়া উঠিতে দেখিব। সকল গভীর কবিই উপলব্ধি করেন যে, যে আনন্দ বা উল্লাসকে পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, তাহা অবিমিশ্র আনন্দ নয়—বেদনার ম্লানচ্ছায়া ঐ আনন্দের পটভূমিকা রচনা করিয়াছে। এই উপলব্ধি কবিজীবনে ঘটেই, কিন্তু পরিমাণ-ভেদ আছে। রোমান্টিক কবিদের ক্ষেত্রে এই হতাশা বা আন্তিটুকু প্রবল। প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকারের মধ্যে ঐ অনুভূতির প্রকাশ দেখিলেও মানিতে হয় জ্ঞানদাসেই ইহার স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। পরম ভোগী বিদ্যাপতিকেও এক মুহূর্ত্তে বলিতে হইয়াছিল—"জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ নয়ন না তিরপিত ভেল"; চণ্ডীদাসও বলিতেছেন—"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া," "এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি, নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি"—কিন্তু জ্ঞানদাসের মত বারবার নয়:

তিলে কত বেরি মুখ নেহারয়ে
আঁচরে মোছয়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে
তেঞি সদা লয়ে নাম॥

অথবা:

রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পুতলি লাগি থির নাহি বান্ধে॥ ইত্যাদি

রূপে-গুণে, সম্ভোগে-মিলনে তৃপ্তি আসে নাই বলিয়াই তো রূপ লাগি আঁখি ঝুরে। দীর্ঘ বিরহের অন্তে যে মিলন ঘটিবে—যাহার স্থায়িত্বে বিশ্বাস নাই—তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখার অতি করুণ প্রযত্ন:

হিয়ার উপর হৈতে শেজে না ছোঁয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥
নিদের আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠিয়ে॥

রোমান্টিকতার সহিত স্বপ্নের একটা গূঢ় সম্পর্ক আছে। যাহা কিছু অনির্দ্দিষ্ট তাহার প্রতি রোমান্টিক মনের আকর্ষণ। স্বপ্নে বাস্তব বলিয়া কিছু নাই, অথচ বাস্তবের ছায়াটি আছে। সুতরাং সব রোমান্টিক কবিই স্বপ্ন দেখিতে ভালবাসেন। রবীন্দ্রনাথ অতীতলোকে প্রস্থানের বাসনা হইলেই স্বপ্নের আশ্রয় লইয়াছেন: "দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে, খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রা নদী পারে মোর পূর্ব্বজনমের প্রথম প্রিয়ারে।" আমাদের কবিরও স্বপ্নের প্রতি পক্ষপাত আছে। অন্ততঃ একটি স্বপ্নদর্শনকে তিনি যে কাব্যরূপ দিয়াছেন, উচ্ছ্বসিত স্তুতি-বিস্তারেও উহার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত করা সম্ভব নয়। পদটি উদ্ধৃত করি:

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে হেথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে শ্যামল চরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই॥

এটুকু ভূমিকা। অতঃপর নিদ্রাকালীন বর্ষার পটভূমিকা:

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁঝিঁ ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিনু হেন কালে॥

এমন আশ্চর্য্য শব্দমন্ত্র, রূপচিত্র, রহস্যময় বর্ষার আবেষ্টনী, এমন ভাষা-সুর-ছন্দের অনিবার্য্য মায়াবিস্তার—জারক শক্তি—ইহা নিত্যকালের একটি চিত্র হইয়া রহিল। আশ্চর্য্য নয়, কোন এক অনুরূপ বর্ষাকালে শত কবিতা থাকিতে জ্ঞানদাসের এই পদটি রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিবে :

"অন্ধকার বাদলা রাতে মনে পড়ছে ঐ পদটা, রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন··· ।

"সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে কবির চোখের কাছে কোন একটি মেয়ে ছিল। ভালবাসার কুঁড়ি-ধরা তার মন, মুখচোরা সেই মেয়ে, চোখে কাজল পরা, ঘাট থেকে নীল সাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা। সে মেয়ে আজ নেই। আছে শাঙন ঘন, আছে সেই স্বপ্ন, আজো সমানই।"

বিশ্বপ্রকৃতি এবং বিশ্বজীবনের দিকে তাকাইয়া, মুগ্ধ হইয়া, তন্ময় হইবার পূর্ব্বেই মন্ময় কবি যখন আপন হৃদয়-সমুদ্রে ডুব দেন, তখন হৃদয়লক্ষ্মীর উপমা খুঁজিতে তাঁহাকে অলঙ্কারশাস্ত্র উল্টাইতে হয় না,—ঐ সুন্দরকে বরণ করিতে সার দিয়া সুন্দরোপম বাহির হইয়া আসে—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভাবুক চণ্ডীদাস প্রচুর মৌলিক উপমা উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করিয়াছেন, রোমান্টিক জ্ঞানদাস অল্প করেন নাই। কবি বলিতেছেন :

"নয়ানে নয়ানে মোরে পিয়ে।"

রাধিকা ঘাটের পথে পথ ভুলিল, কারণ :

"তিমিরে গরাসিল মোরে।"

কৃষ্ণের মন রাধার রূপে মজিয়াছে। কেমন রাধা ?—

"উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি।
কলসে কলসে জনু অমিয়া উঘারি॥"

রূপ হৃদয়ে পশিয়াছে, কি ভাবে —

"হৃদয়ে পশিল রূপ পাঁজর কাটিয়া।"

জ্ঞানদাসের রাধা নদীর কূলে উপস্থিত। চাহিয়া দেখে পারঘাটে এক নীরদ নেয়ে —তরুণ, সুন্দর, সুকুমার ; দেখিয়া রসে মন ভিজিয়া আসিল। যে সোৎসুক প্রশ্নটুকু রাধিকা করিতেছে, তাহাতে কতই মাধুরী, কত না সরল চাতুরী :

বড়াই হের দেখ রূপ চেয়ে।
কোথা হতে আসি দিল দরশন
বিনোদ বরণ নেয়ে।
ঐ কি ঘাটের নেয়ে॥

স্নেহ-কম্পিত এই বিস্ময়টুকু কাব্যের সম্পদ। নৌকালীলার আর একটি পদে একেবারে আধুনিক ভাষা ও ভঙ্গিতে জ্ঞানদাস রসসৃষ্টি করিয়াছেন :

মানস গঙ্গার জল ঘন করে কলকল
দু' কূল বহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ
তরণী রাখিতে নারে কেউ ॥
নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায়।
কখনো না জানে কান বাহিবার সন্ধান
জানিয়া চড়িনু কেন নায় ॥
নেয়ের নাহিক ভয় হাসিয়া কথাটি কয়
কুটিল নয়ানে চাহে মোরে।
ভয়েতে কাঁপিছে দে এ জ্বালা সহিবে কে
কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে ॥

জ্ঞানদাসের পদাবলীতে রোমান্টিক রহস্যপ্রিয়তার অনুরূপ আর একটি সামান্য লক্ষণ আছে যাহা কাব্যের সর্ব্বত্র অনুস্যূত। মাধুর্য্য সেই সামান্য লক্ষণ। জ্ঞানদাসের সব পদকেই (বাংলা পদ) নির্ব্বিচারে মধুর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই মাধুর্য্যগুণ সাধারণভাবে তাঁহার কাব্যের বর্ণনাভঙ্গি, সংযত প্রকাশরীতি, শব্দব্যবহারের মধ্যে এবং স্থানে স্থানে বিশেষ পরিবেশ ও ঘটনাসংস্থানকৌশলের গুণে চমৎকার ফুটিয়াছে। বর্ণনাচাতুর্য্যগত এই মাধুর্য্যের একটা উদাহরণ দিই : রাধার জননী রাধাকে প্রশ্ন করিতেছেন,—প্রাণনন্দিনী রাধা, তুমি কোথায় গিয়াছিলে, তোমাকে প্রতি গোপঘরে আমি খুঁজিয়া ফিরিয়াছি, তোমার এমন অপরূপ বেশবাসই বা কেন, ভালে অগুরু চন্দন, কস্তূরী কুস্কুম, পৃষ্ঠে নবমল্লিকার মালায় জড়ানো বিনোদ লোটন? উত্তরে রাধারাণী যাহা বলিল, তাহা যেন অমিয়-সেঁচা বাণীর মণি :

মাগো গেনু খেলাবার তরে।
পথে লাগি পেয়ে এক গোয়ালিনী
লৈয়া গেল মোরে ঘরে ॥
গোপ রাজরাণী নন্দের গৃহিনী
যশোদা তাহার নাম।
তাহার বেটার রূপের ছটায়
জুড়ায়ল মোর প্রাণ ॥

কি হেন আকুতে তার বাম ভিতে
নৈয়া বসাল মোরে ॥
একদিঠে রহি তাহার আমার
রূপ নিরীক্ষণ করে ॥
বিজুরী উজোর মোর দেহখানি
সেহ নব জলধর।
সুমেল দেখিয়া দিবাকর ঠাঞি
কি হেতু মাগিল বর ॥

বৃন্দাবনের চিরকিশোর-কিশোরী এরা।

বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে যে মাধুর্য্যরসের কথা বলিয়াছি, ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত পদ বা পদাংশের মধ্যে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। জ্ঞানদাসের কাব্যের সর্ব্বব্যাপী এই মাধুর্য্যগুণ অনেকক্ষেত্রে অনুভূতির তীব্রতাকে পরিহার করিয়া সুমিত লাবণ্যের সঞ্চার করে। ফলে যেখানে সর্ব্বগ্রাসী হাহাকার, মর্ম্মবিদারণ, সেখানে জ্ঞানদাসের প্রতিভা অসার্থক। চণ্ডীদাসেরও। সেখানে বিদ্যাপতির অভ্যুদয়। সমুদ্রের সুর তুলিতে একমাত্র বিদ্যাপতিই পারিয়াছেন, জ্ঞানদাস গাঁয়ের স্বচ্ছতোয়া কুলুনাদিনী নদীটি। বিরহের পদ সম্পর্কেই ঐ বক্ষবিদার ক্রন্দনধ্বনির কথা আসে। সেখানে বিদ্যাপতি কণ্ঠ তুলিলেন:

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
ঈ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥

বিদ্যাপতির বিরহ যেমন রাজসিক, মিলনও তদ্রূপ:

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ"……ইত্যাদি

বিরহ বা মিলনের এই এক রূপ—ঐশ্বর্য্য ও মহিমা-জড়িত প্রকাশ। কিন্তু ইহার অন্যতর আর একটি দিক আছে; সেখানে বেদনায় প্রাণ মূর্চ্ছিত, দেহ-মন স্তিমিত। সেই বেদনার রূপদান করিতে চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস আসিয়া দাঁড়ান। চণ্ডীদাসের অতুলনীয় কাব্যপঙ্ক্তি:

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল ॥

জ্ঞানদাসের বেদনায় এতখানি গভীরতা নাই, বেদনাকেও তিনি সুমিষ্ট করিয়া প্রকাশ

করেন। তিনি বিদ্যাপতির মত আনন্দের কবি নহেন, গোবিন্দদাসের মত উল্লাসের কবি নহেন, তিনি মাধুর্য্যের কবি। রাধিকার বিরহদশা প্রকাশ করিতে তিনি কোন আবেগের সঞ্চার করেন না, কেবল শান্ত সংক্ষিপ্ত বিরলবর্ণ উক্তিতে ব্যথার্ত্ত অবস্থাটি ফুটাইতে চান :

সোনার বরণ দেহ।
পাণ্ডুর ভৈগেল সেহ॥
গলয়ে সঘনে লোর।
মুরছে সখীক কোর॥
দারুণ বিরহ জ্বরে।
সো ধনী গেয়ান হরে॥
জীবনে নাহিক আশ।
কহএ এ জ্ঞানদাস॥

কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যখন অভিযোগের সুর, তখনো তাহাতে উত্তেজনা নাই, করুণ ক্লান্ত অনুযোগ :

মাধব কৈছন বচন তোহার।
আজি কালি করি দিবস গোঙাইতে
জীবন ভেল অতি ভার॥
পন্থ নেহারিতে নয়ন অন্ধায়ল
দিবস লিখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেল
বরিখে বরিখে কত ভেল॥

জ্ঞানদাসের আর একটি বিখ্যাত পদেও হাহাকার নয়, অভাগা কণ্ঠের অশ্রুসিক্ত আক্ষেপ ও আত্মধিক্কারই মুখ্য হইয়াছে :

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল। ইত্যাদি

জ্ঞানদাসের আত্মনিবেদনের পদেও একই মাধুর্য্যের সঞ্চরণ। চণ্ডীদাসের আত্মনিবেদন সত্যকার আত্মসমর্পণে সার্থক। তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র আত্মগৌরব অবশিষ্ট নাই। কিন্তু জ্ঞানদাস তাঁহার বঁধুর প্রেমভাজন হইবার গৌরবটুকু ছাড়িতে পারেন নাই। চণ্ডীদাসের রাধা বলিয়াছে :

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান॥

অপরপক্ষে জ্ঞানদাসের রাধা সব দেয়, গরবটুকু দিতে পারে না:

বঁধু তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ও দুটি চরণ
সদা নিয়ে রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।
শিশুকাল হৈতে মায়ের সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি॥

জ্ঞানদাসের রাধার এখনো অমিত্ব আছে, স্মরণ করাইয়া দিতেছে—সোহাগিনী বড় আমি। সোহাগের মত মধুর জিনিস আর নাই। 'তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম' ইত্যাদি পদেও ঐ গৌরব-গরব, ঐ সোহাগ-সরমটুকু বড় ফুটিয়াছে।

জ্ঞানদাসের প্রতিভার মূল গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাঁহার কবি-শক্তি সর্ব্বোচ্চ কোন্ স্তরে উঠিতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের মতামত যথাসম্ভব প্রকাশ করিয়াছি। তথাপি মনে হয় জ্ঞানদাসের প্রতিভা সম্পূর্ণ সার্থক হয় নাই। তাঁহার মধ্যে কোথায় একটা দ্বিধা ছিল, কোথায় যেন অসম্পূর্ণতার ছোঁয়া ছিল। ফলে সমগ্রতঃ নিখুঁত কাব্যদেহ বলিতে যাহা বুঝি, অনেকক্ষেত্রেই জ্ঞানদাসের মধ্যে তাহা নাই। তিনি এমন পঙ্ক্তি রচনা করিয়াছেন, শ্রেষ্ঠ লিরিক কবিও যাহা আত্মসাৎ করিতে পারিলে আনন্দবোধ করিবেন; আবার এমন অংশও আছে যাহার দায় গ্রহণ করিতে নিতান্ত অপ্রতিষ্ঠ কবিও ঘাড় পাতিবে না। প্রতিভা সকল সময়ে সমান জলন্ত থাকে না বুঝি,—দিব্য আবেশের মুহূর্ত্তে কবির লেখনী হইতে যে সকল অপূর্ব্ব কাব্যোৎসারণ হয়, স্তিমিত-রসাবেশ, অভ্যাস-আবর্ত্তনের কাব্যরচনায় তাহার নিদর্শন না মিলিতে পারে, কিন্তু একই কবিতায় (যে কবিতার আকার আবার অতি ক্ষুদ্র) যুগপৎ অত্যুৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট অংশ সন্নিবিষ্ট থাকে কি করিয়া? উদাহরণ লওয়া যাক। পূর্ব্বোদ্ধৃত 'রূপের পাথারে আঁখি' প্রভৃতি অংশের পর আছে:

চন্দন চাঁদের মাঝে মৃগমদে ধান্ধা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলি রৈল বান্ধা ॥
কটি পীত বসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুল কলঙ্কের কোড়া ॥

এই দুই অংশ কি একই কবির রচনা, না তাঁহার শত্রুপক্ষ এইগুলি তাঁহার নামে চালাইয়া দিয়াছে? "রূপের পাথারে আঁখি" লিখিবার পর এমন পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যহীন রচনা জ্ঞানদাসের হাত দিয়া বাহির হইল? এগুলিকে আমরা শত্রুপক্ষ, লিপিকর, সম্পাদক—সম্ভব অসম্ভব সকলেরই কারসাজি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম, কিন্তু নান্যোহপায়, কবির কাব্যের অন্যত্রও অনুরূপ দৃষ্টান্ত মিলিয়া যায়। 'কানা' ও 'পদ্মলোচন' কবির কাব্যে দিব্য পাশাপাশি চলিয়াছে। বিরহ পর্য্যায়ে 'মাধব কৈছন বচন তোহার' পদটির দ্বিতীয় অংশ নিকৃষ্ট। বিখ্যাত 'মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা' শীর্ষক পদের শেষাংশে প্রাথমিক দীপ্তি বজায় নাই স্বীকার করিতে হইবে।

এখন একই পদের মধ্যে—বিভিন্ন পদের বিচার ছাড়িয়া দিলেও—এই অননুরূপ শক্তির পরিচয় কেন? ইহার কারণ, আমার মনে হয়, কবি তাঁহার কবি-ভাষা এবং কবি-ভাবনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রত্যয়বুদ্ধ হইতে পারেন নাই। জ্ঞানদাসের মধ্যে যে দ্বিধার কথা বলিয়াছি, ইহাই সেই দ্বিধা। প্রতিভা আত্মপ্রতিষ্ঠ না হইলে তাহার মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকে; ফলে কাব্যে স্থানে স্থানে হয়ত অত্যুত্তম সৃষ্টি-সুযোগ আসে, আবার ঠিক তাহার পার্শ্ববর্ত্তী মলিন কাব্যাংশ কবির গৌরব বহুলাংশে অপহরণ করিয়া লয়। জ্ঞানদাসের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার অভাবের দুইটি কারণ আছে বলিয়া বিশ্বাস,—এক, সমসাময়িক যুগপ্রভাব; দুই, প্রতিভা-সম্পর্কে তাঁহার সচেতনতার অভাব। জ্ঞানদাস নিঃসংশয়ে প্রথম শ্রেণীর পদকার, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রতিভাসচেতন কিনা সন্দেহ। তাঁহার পদে ভাষার পারিপাট্য, সংযত সুমিত ভাষণ-কৌশল, ন্যূনতম শব্দসহায়ে ভাবের মর্ম্মভেদ ও মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবার শক্তি দেখাইয়া কেহ হয়ত এ বিষয়ে প্রতিবাদ করিতে পারেন। তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য, ভাষার ঐ পরিপাট্য বা সংযমটুকু না থাকিলে তিনি কবিই হইতে পারিতেন না, আমরা তো তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর পদকার বলিয়া মানি। ভাষার পরিপাট্য আছে সত্য, কিন্তু ভাষার নির্ব্বাচন? আমরা জানি, জ্ঞানদাস বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদরচনা করিয়াছেন। তাঁহার বাংলা পদ অবিসংবাদিত ভাবে শ্রেষ্ঠ, অথচ নিম্নস্তরের ব্রজবুলি পদরচনাও অল্প নয়। যেখানে বাংলা পদে প্রতিভা চমৎকারিত্ব লাভ করিতেছে, সেখানে ব্রজবুলিকে গ্রহণ

কেন? ইহাই কি তাঁহার প্রতিভাগত অচেতনতার লক্ষণ নহে? জ্ঞানদাস তাঁহার কবি-ভাষা সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই, বাংলা ও ব্রজবুলির মধ্যে ঢুলিয়া বেড়াইয়াছেন। ইহার জন্য অবশ্য যুগপ্রভাব দায়ী। সে যুগে ব্রজবুলিতে পদরচনা করা রীতি, আলঙ্কারিকতার অনুবর্তন স্বাভাবিক; যুগপ্রভাবের জন্য কবির সীমাবদ্ধতার কথা সহানুভূতির সহিত স্মরণ করিয়াও বলিতে হইবে, জ্ঞানদাসের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ছিল। যাঁহারা বলেন, যাহা ভাষা তাহাই কাব্য, ভাষা ও ভাবে পার্থক্য নাই, ভাব উপযুক্ত হইলে ভাষাকে টানিয়া বাহির করিবে, তাঁহারা একেবারে ভ্রান্ত নহেন। কাব্যের স্বয়ংবর সভায় ভাব উপযুক্ত ভাষার কণ্ঠে মাল্যার্পণ করে; যদি না করে বুঝিতে হইবে কোনোখানে ভাবের অসম্পূর্ণতা ছিল। মহাকবি বা শ্রেষ্ঠ কবিদের ভাষায় সেই অব্যর্থতা—নিঃসংশয় বিশ্বাসের সুর আছে। পদাবলী সাহিত্যে গোবিন্দদাস যখন ব্রজবুলি ভাষা ব্যবহার করেন, প্রচুর অলঙ্কার গ্রহণ করেন, তখন কাহারো বলিবার অধিকার থাকে না, ঐ ভাষা বা অলঙ্কার অনুচিত। কবি আপনার কাব্যের স্বপক্ষে সেই বিশ্বাসটুকু জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিভাষা সম্বন্ধে একই কথা বলা চলে। কিন্তু জ্ঞানদাসে ইহা সত্য হয় নাই। বাংলা যথার্থতঃ তাঁহার কাব্য-বাহন, অথচ তিনি ব্রজবুলির দিকেও ঝুঁকিয়াছেন।

সংশয় এখনো থাকিয়া যায়, একই বাংলাপদের মধ্যে শক্তি-স্ফুরণে পার্থক্য থাকে কেন? এখানেও এক উত্তর। কবি যেমন তাঁহার কবি-ভাষা সম্পর্কে স্থিরমতি হইতে পারেন নাই, তেমনি রীতির বিষয়ে। সেই যুগটা ছিল আলঙ্কারিকতা-মুখ্য কবিত্বের যুগ। যুগাগত উপমা-উপমানের সাহায্যে কবিরা কাব্যজগৎ নিরাপদে নির্মাণ করিতেন, মৌলিক রসদৃষ্টিতে সাদৃশ্য-দর্শনের অভিপ্রায় তাঁহাদের বিশেষ ছিল না। অথচ জ্ঞানদাসের প্রতিভা স্বয়ংচল; তাঁহার ভিতর রোমান্টিক ভাব প্রবল, নিজস্ব ভাবানুসঙ্গ সৃজনের ক্ষমতা যথেষ্ট। এখন এই নিজস্ব সৃজনটুকু কাব্য-সম্পদ হইবে, না আরো কিছুর মিশাল চাই—প্রচলিত আলঙ্কারিক ভাষা ও ভঙ্গির আমন্ত্রণ প্রয়োজন—সে বিষয়ে কবি স্থির-নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। তাই অতি মৌলিক কাব্যাংশ রচনার পর নিতান্ত সাধারণ স্তরের আলঙ্কারিক বাকবিন্যাস ঘটিয়াছে। উদাহরণ পূর্ব্বেই লইয়াছি।

জ্ঞানদাসের মূল কবিধর্ম্ম শেষবারের মত বুঝিয়া লইবার জন্য আমরা 'রূপানুরাগ' গ্রহণ করিতেছি। এই পর্য্যায়ের মধ্যে প্রচলিত কাব্যরীতির অনুসরণের অখণ্ড সুযোগ। রূপানুরাগে রাধা বা কৃষ্ণের রূপদর্শন; সাধারণ ভাবে তাই রূপবর্ণনাই কাব্যের উপজীব্য। গোবিন্দদাস রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

তিনি সত্যকার রূপদর্শন করিয়াছেন, সেই দর্শনের ফল কৃষ্ণ ও রাধার রূপনির্ম্মাণ। নিজ আমিত্বকে পৃথক রাখিয়া যে রূপ তিনি গড়িলেন, ভাষা ভাব ও ছন্দের দিক দিয়া তাহার মধ্যে ক্লাসিক্যাল মাহাত্ম্য ও গাম্ভীর্য্য আছে। জ্ঞানদাসও রূপদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার পক্ষেও ঐ আমিত্ব-বিবিক্ত রূপ-গঠন অসম্ভব ছিল না। তিনি সে পথে অগ্রসর হইলেন না। তাঁহার রূপ নয়, স্বরূপ-দর্শন। রূপানুরাগটুকুই তাঁহার নিকট প্রধান। অথচ চণ্ডীদাসের মত অতখানি আত্মবিস্মৃত কবিও তিনি নন: সুতরাং রূপবর্ণনার একটা বাহ্য প্রয়াস তাঁহার মধ্যে আছেই। কিন্তু উহাকে ভেদ করিয়া আন্তর প্রবৃত্তি—স্বরূপ-ধর্ম্ম উঁকি মারিতেছে। গোবিন্দদাসের নিকট রূপদর্শন যা, রূপনির্ম্মাণও তাই। তিনি দেখিলেন ও গড়িলেন—সর্ব্বাবয়ব নিখুঁত মূর্ত্তি। জ্ঞানদাসের দর্শনে ও নির্ম্মাণে প্রভেদ আছে। তিনি যাহা দেখেন তাহাই আঁকিতে পারেন না। কাব্যের মধ্যে দর্শন-জাত আত্মস্ফূর্ত্তির ছাপটুকু থাকে। ফলে সেখানে রূপ ও স্বরূপ, তন্ময়তা ও মন্ময়তার মেশামেশি, প্রাচীন কবিকুলের শিল্পলোক হইতে আহৃত রত্নরাজি নয়, জ্ঞানদাসের নিজস্ব উপমাদি বাহির হইয়া আসে:

চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ূর পুচ্ছ
ভালে সে রমণী মনোলোভা।
মল্লিকা মালতী মালে গাঁথনি গাঁথিয়া ভালে
কেবা দিল চূড়াটি বেড়িয়া।
হেন মনে অনুমানি বহিতেছে সুরধুনী
নীলগিরি শিখর বাহিয়া॥
কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকিমিকি
কেবা দিল ফাগু রঞ্জিয়া।
রজতের পাত্রে কেবা কালিন্দী পূজিয়াছে
জবা কুসুম তাহে দিয়া॥

কেবল বর্ণনাভঙ্গিতে মৌলিকতা নয়, কৃষ্ণের রূপবর্ণনা করিতে একস্থানে একটি মারাত্মক উপমা আছে—কৃষ্ণের কপালে চন্দনের ঝিকিমিকি—অর্দ্ধচন্দ্র—তাহার উপরে ফাগচূর্ণ—কবি উপমা দিতেছেন, যেন রজতের পাত্র করিয়া জবা কুসুমে কেহ কালিন্দী পূজিয়াছে। বৈষ্ণব হইয়া জবার উপমা!

এই উপমাটুকু কবিকে চিনাইয়া দিবে। তিনি ভক্ত বৈষ্ণব সত্য, কিন্তু তিনি কবি। কাব্যের ক্ষেত্রে সংস্কারের দাসত্ব করিতে প্রস্তুত নন। প্রয়োজন হইলে কেবল

মৌলিক সাদৃশ্য-কল্পনা নয়, নিজ সম্প্রদায়ে অপাংক্তেয় উপমাদিও গ্রহণ করিবেন। অতঃপর যে দৃষ্টান্তটি লইতেছি, তাহার মধ্যে রূপবর্ণনার রীতি অনুসরণের চেষ্টা আছে, তথাপি কবির প্রাণোত্তাপ, হৃদয়-স্পন্দন কি চাপা পড়িয়াছে :

চিকন কালিয়া রূপ মরমে লেগেছে গো
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙাড়িয়া মুখখানি মাজিয়াছে
না জানি কতেক সুধা দিয়া॥
অধরের দুটি কূল জিনিয়া বান্ধুলি ফুল
হাসিখানি মুখেতে মিশায়।
নবীন মেঘের কোরে বিজুরি প্রকাশ করে
জাতিকুল মজাইলাম তায়॥

পূর্ব্বের ও বর্ত্তমানের—উদ্ধৃত দুইটি রূপানুরাগের পদে 'জাতিকুল মজাইবার' বাসনা সত্ত্বেও কিছুটা বাহ্য রূপ আঁকিবার চেষ্টা আছে। 'কত চাঁদ নিঙাড়িয়া' ইত্যাদি অংশ মাধুর্য্যের দিক দিয়া তুলনাহীন। সে যাহা হোক, জ্ঞানদাস রূপানুরাগের অধিকাংশ পদে এতখানি রূপ দেখিবার ধৈর্য্য ধরিতে পারেন নাই। রস-সাগরের তীরে বসিয়া চক্ষু দিয়া সম্ভোগ বা মুখ বাড়াইয়া মধুপান নয়—তাঁহার একদম "ডুব দাও"। জ্ঞানদাস রূপময়ের চকিত দর্শনটুকু মাত্র লাভ করেন, অতঃপর রাধিকার মত তাঁহাকেও কৃষ্ণরূপী "তিমিরে গরাসিল মোরে", "কালো মেঘ ঝাঁপ্যাছিল পথে"। তাঁহার রূপানুরাগ কি, না "রূপের সাগরে আঁখি ডুবি সে রহিল।" ঐ ডুবিয়া যাওয়াটুকুই আসল, পথ হারানোতেই আনন্দ। জ্ঞানদাসের একটি রূপানুরাগের পদ আরম্ভ হইতেছে—"দোঁহে দোঁহা নিরখই নয়নের কোণে"; তাহার ঠিক পরের পঙ্‌ক্তি—"দোঁহে হিয়া জরজর মনমথ বাণে।" অতঃপর জরজর অবস্থার বর্ণনা। জ্ঞানদাস "কি রূপ দেখিলাম কালিন্দী কূলে, অপরূপ রূপ কদম্বমূলে" বলিয়া বেশ খানিকটা রূপ চিত্রণ করিলেন কিন্তু শেষাশেষি নাগাদ আসল কথাটি বাহির হইয়া পড়িল :

হেন মনে লয় বিজুরী হয়ে।
মেঘের সাথে থাকি জড়াইয়ে॥

একবারে মনের কথা। আর একবার রাধা অথবা কবি বলিতেছেন :

দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে।
এক অঙ্গে কত রূপ নয়নে না ধরে॥

বর্ণনার ভঙ্গি ও প্রাণের আকুলতা দেখিয়া পাঠক ঠিক ধরিয়া লয়, ঐ দেখাটুকু আর ভাষায় ফুটাইতে হইবে না, যে রূপ নয়নে ধরিল না তাহার বর্ণনা চলে কি? সুতরাং জাতিকুল ক্রমশঃই অরক্ষণীয় হইয়া পড়িতেছে, এই ভাবটি যে, কাব্যে প্রাধান্য পাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আর একটি পদে; "যত রূপে তত:বেশ"—এইটুকু মাত্র রূপাঙ্কন, অতপর ঃ

ভাবিতে পাঁজর শেষ।
পাপচিতে নিবারিতে নারি ॥

অনিবার্য্য পাপচিত্তের কাহিনীই সমস্ত পদটি ব্যাপ্ত করিয়া রহিল। "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর" যাঁহার রূপানুরাগের পদ তাঁহার কবিপ্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করিতে বিলম্ব হয় না।

গোবিন্দদাস

মধ্যযুগের একজন কবি বিভোর হইয়া একখানি ছবি দেখিতেছেন :

নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব ॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌর-কিশোর।
অভিনব হেম- কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর ॥
চঞ্চল চরণ- কমলতলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর ॥ ইত্যাদি

—দেখিতেছেন ও রূপ দিতেছেন; স্পষ্ট বোঝা যায় কবি একজন পরম ভক্ত—ভাবাকুল হৃদয়; কিন্তু সেই সঙ্গে অদ্ভুত সংযমও তাঁহার আয়ত্তে। হৃদয়ের আকুলতাকে কোথাও তিনি অকূল করেন না। রূপদক্ষ শিল্পীর মত যথাদৃষ্ট রূপকে ভাষার তুলিকায়, অপূর্ব্ব লাবণ্যরসে ডুবাইয়া টানের পর টানে ফুটাইয়া চলেন। একটা পরিপূর্ণ প্রাণ-সংযুক্ত চিত্র স্ফুটপদ্মের মত ভাসিয়া ওঠে।

চৈতন্যোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (শ্রেষ্ঠতম?) পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসের উপরিউদ্ধৃত পদটির বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ-প্রসঙ্গে যে যে লক্ষণগুলির ইঙ্গিতমাত্র করিয়াছি—কবির ভক্তিপ্রাণতা, চিত্রধর্ম্মিতা, আত্মসংযম এবং কাব্যবস্তু অর্থাৎ বিভাবাদি হইতে আর্টিস্টের দূরত্ব বজায় রাখিবার ক্ষমতা—মূলতঃ সেইগুলির সাহায্যেই আমরা গোবিন্দ-দাসের কবিধর্ম্মের স্বরূপসন্ধানে ব্যাপৃত হইব। আর দুইটি লক্ষণ কেবল যোগ করিতে চাই,—নাটকীয়তা ও আলঙ্কারিকতা।

গোবিন্দদাস নিঃসংশয়ে বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ কবি—আধুনিক কাল ধরিলেও। কাব্যশিল্পের সর্ব্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য না হউক—যাহা নিতান্তই দুর্লভ,—এক বিশেষ দিক হইতে তাঁহার উৎকর্ষ শ্রেষ্ঠত্বের প্রান্তসীমা স্পর্শ করিয়াছে, তাহা হইল রূপশিল্প।

গোবিন্দদাসের মত সচেতন শিল্পী বিরল। এ বিষয়ে পূর্ব্বযুগের বিদ্যাপতি এবং পরযুগের ভারতচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ মাত্র তাঁহার তুলনাস্থল। মধুসূদনের কাব্যেও চূড়ান্ত আর্টকর্ম আছে, কিন্তু আর্টিস্ট স্বয়ং তাঁহার সৃষ্টি সম্বন্ধে অর্দ্ধচেতন। গোবিন্দদাসের কাব্যের রূপসম্পূর্ণতা কেবল কাব্যে সীমাবদ্ধ নয়, কবির মানসপ্রকৃতিতেই একপ্রকার সজ্ঞান সীমাবোধ আছে, যাহাকে কেবল উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভার স্বাভাবিক সংযম বলিলে যথেষ্ট হয় না; বস্তুতঃ উহা গোবিন্দদাসের কবিধর্ম্মের মূলগত বৈশিষ্ট্য। এই সংযমবুদ্ধির ফলে গোবিন্দদাসের কাব্যে যে বিশেষ বস্তুটির আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাহাকে কাব্যের স্থপতিবিদ্যা বলা চলে। তাঁহার অধিকাংশ পদ যেন কুঁদিয়া তৈয়ারী —'কুন্দে যেন নিরমাণ।' প্রতিভার আলোড়নক্ষণে অর্দ্ধবাহ্যদশায় আত্মসংবিতের বিলয়-মুহূর্ত্তে প্রেরণার হাত ধরিয়া কবি তাঁহার কাব্য সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার কবিভাবনা কাব্যের সবকয়টি প্রয়োজনীয় বস্তুর সমাবেশ করিয়া অপরিসীম রসবোধ ও তীক্ষ্ণ শিল্পদৃষ্টির সহায়ে একটির পর একটি পদ রচনা করিয়া গিয়াছে। ফলে কোথাও কোথাও ভাবাবেগের উত্তাপের অভাব হয়ত হইয়াছে কিন্তু কাব্যের রূপ-সম্পূর্ণতা যাহাকে বলে, সেই finish-এর অসৌকর্য্য কোথাও ঘটে নাই।

কাব্যের ভাবাবেগের কথা আসিল বলিয়া একটি প্রশ্নের সমাধান প্রয়োজন; একথা সত্য গোবিন্দদাসের কাব্যের ভাবোত্তেজনা চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির পদ অপেক্ষা অল্প। অন্ততঃ সাধারণ পাঠক তাহাই অনুভব করে। তদুপরি আছে কবির আলঙ্কারিকতা। অতএব সাধারণভাবে এমন একটা বিশ্বাস চলিত আছে—গোবিন্দদাস 'নিষ্প্রাণ'। এই বিশ্বাসের মূলে যথেষ্ট বিচারবুদ্ধি ও কাব্যবোধ বর্ত্তমান কিনা সন্দেহ। গোবিন্দদাসের কিছু কিছু পদের বিরুদ্ধে যে নিষ্প্রাণতার অভিযোগ সঙ্গতভাবেই আনা যায় তাহা স্বীকার্য্য এবং কোন্ কবির বিরুদ্ধে আনা না যায়? চরম ভাবতরল কাব্যও প্রাণহীন হইতে পারে। কাব্যে কেবল ভাব থাকিলেই প্রাণ নাচে না। কাব্যের প্রাণ সৃষ্টি করিতে হয়। রূপ এবং রস, ভাব এবং বাণীর পার্ব্বতী-পরমেশ্বর মিলনেই কাব্যের কুমার-সম্ভব। গোবিন্দদাসের কাব্যে বহুক্ষেত্রে সেই রূপরসের সার্থক সঙ্গমলীলা ঘটিয়াছে। তাঁহার অলঙ্কার,-সে তাঁহার ভাবপ্রেরণার অনিবার্য্য উদ্ভব। তাহা বহিরঙ্গ কিছু নয়। ঐ অলঙ্কার রসের প্রযত্নে সিদ্ধ। তবে একথা সত্য, গোবিন্দদাসের কাব্য পাঠ করিতে হইলে তাঁহার কবিভাষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকা চাই। তিনি যে ভাষায় কাব্যরচনা করিতেছেন, সেই ভাষা সম্পর্কে বিশেষ কোন ব্যুৎপত্তি না আনিয়া কবির বিরুদ্ধে দুর্ব্বোধ্যতার অভিযোগ করা যৎপরোনাস্তি অনুচিত। গোবিন্দদাসের কাব্য যথাযথ আস্বাদন করিতে হইলে কাব্য-দীক্ষার প্রয়োজন আছে।

গোবিন্দদাস বিদগ্ধ কবি। বহুযুগের অনুশীলনে এদেশে একটা কাব্যশাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই কাব্যশাস্ত্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া কবি তাঁহার কাব্যরচনা করিয়াছেন। সুতরাং ঐ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করিলে গোবিন্দদাসের কাব্যাস্বাদ সম্ভব নয়। গোবিন্দদাস হাটের মাঠের কবি নহেন।

গোবিন্দদাস সৌন্দর্য্যের কবি। সৌন্দর্য্যসাধনা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, কবি তাঁহার কাব্যের মধ্যে ঠিক সেই বস্তুটির সজ্ঞান অনুশীলন করিয়াছেন। তাঁহার রাধিকা তাঁহার মানসলোকের তিল তিল সৌন্দর্য্যের সমাহারে গঠিতা। কবি যতকিছু সৌন্দর্য্য পারিয়াছেন সঞ্চয় করিয়া, সুবিন্যস্ত করিয়া, রাধারূপের মাধ্যমে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং আমরা একথা বলিব, বহুলাংশে সফলকাম হইয়াছেন। এই রাধা ঠিক লৌকিক জীবনের কোন মানবী নয়। চণ্ডীদাস, এমনকি বিদ্যাপতির মধ্যে মানবিকতার অবসর আছে। কিন্তু গোবিন্দদাসের রাধা একেবারেই অলৌকিক, অথচ অপূর্ব্বসুন্দর। তাহার মধ্যে প্রাকৃত দেহকামনা যতটুকু সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা কাব্যে নিবেশিত হইবার পর পূর্ব্বতন লৌকিক উত্তাপ সামান্যটুকুও বজায় রাখে নাই। তাঁহার দেহকামনা বিদেহ ভাব-বাসনায় রূপান্তরিত। অবশ্য একথা সর্ব্বত্র সত্য নয়; অভিসারের পদে ইহার বিপরীত দেখিতে পাইব। তাহার কারণ অভিসারে চলিষ্ণুতা প্রবল। পথ চলিলে পথের সৌরভ ও জীবনাবেগ অঙ্গে লাগিবেই।

কবির সৌন্দর্য্যসাধনায় সাফল্যের এবং তাঁহার কাব্যের স্থপতি-লক্ষণের কতকগুলি কারণ আছে: প্রথমতঃ তাঁহার রূপানুরাগ। আমার নিজের বিশ্বাস, গোবিন্দদাসের সমগ্র কাব্যসাধনার মূলে আছে এই তীব্র রূপাসক্তি: যে কোন পর্য্যায়ের কাব্যই হোক, কবি কোথাও রূপকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বৈষ্ণব হইয়া পারিবেনই বা কিরূপে? বৈষ্ণব যে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ, গুণ দেখিয়া বিভোর। তাহার তো বৈরাগ্য নয়, রাগের, জ্ঞানের নয়, রসের সাধন। এখানে একটি লক্ষণীয় বিশেষত্বের কথা মনে আসে। গোবিন্দদাস ভক্ত কবি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ ভক্তিকাব্য ভাবের দিক দিয়া যত গুরুতরই হোক, সৌন্দর্য্যাংশে সেরূপ নয়। ভক্তকবি আপন প্রাণের গভীর আকুতি এমন প্রবলবেগে কাব্যের মধ্যে পরিবেশন করেন যে, উপযুক্ত হাত হইতে বাহির না হইলে তাহা সুলভ উচ্ছ্বাসের রূপ ধারণ করে। কিন্তু গোবিন্দদাসের কাব্যে বিপরীত ঘটিয়াছে, অথচ সেই বৈপরীত্যের পশ্চাতে তাঁহার ভক্তিপ্রাণতার সমর্থন আছে। এ বস্তুটি ঘটে কেমন করিয়া? ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের মনে হয়, চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষ তত্ত্ব-প্রকৃতি ইহার

জন্য দায়ী। বাস্তবের কথা জানি না, ধর্ম্ম-শাস্ত্রের দিক হইতে বৈষ্ণব সাধকগণ কেহই ভাগবতী রাধাকৃষ্ণলীলার সহিত একাত্মতা লাভ করিতে পারেন না। বড় জোর তাঁহারা সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলীলার মঞ্জরিত্ব লাভের অধিকারী। বৈষ্ণবমতে সখীসাধনাই মানবজীবনের শেষ সাধনা। সাধন-ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে সখীভাব কবি বা সাধককে আশ্রয় করিবে। আর সখিত্বের মূল কথা হইল, আত্মভোগ নয়—কৃষ্ণ-ভোগ বা রাধা-ভোগ। তাঁহাদের আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা নয়, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা। সম্পূর্ণ অহংলয় চাই অথচ রূপবিভোরতা না থাকিলে নয়। গোবিন্দদাস ভক্ত এবং বিদগ্ধ কবি, বৈষ্ণব-দর্শনের অন্যতম বোদ্ধা। সুতরাং যতই করুন, কৃষ্ণলীলার সঙ্গে নিজেকে মিশাইয়া ফেলা সম্ভব হয় নাই, রাধার বেদনার মধ্যে নিজ বেদনা ঢালিয়া দিতে পারেন নাই; তাঁহার ভক্তি যত বাড়িয়াছে—সাধনস্তরে উন্নীত হইয়াছেন—ততই ঐ রূপমুগ্ধতা এবং পরেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা প্রবল হইয়া তাঁহার রূপসাধনাকে সম্পূর্ণতার দিকে আগাইয়া দিয়াছে। কিন্তু চণ্ডীদাসের ক্ষেত্রে অন্যরূপ ঘটিয়াছে। বহুসময় রাধার কথা চণ্ডীদাসের কথা; রাধার বেদনা আকূতি বা উল্লাস—পাঠক স্পষ্টই অনুভব করে—তাহা ঐ কবিরই মর্ম্মভেদ করিয়া নিঃসৃত হইয়াছে, কবি রাধিকার সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছেন। এই অবস্থা—আমাদের ধারণা—চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণব-দর্শন ও সাধনমার্গকে স্বীকার করিলে কোন কবি বা সাধকের জীবনে আসিবে না। পরবর্ত্তী কবিরা রাধাকে দর্শন করিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তীরা করিয়াছেন আত্মসাৎ। আভ্যন্তর ভাব-প্রেরণার প্রকৃতি বিচার করিলে পদাবলীর চণ্ডীদাস যে চৈতন্য-পূর্ব্ব যুগের, এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা কিয়দংশে উপলব্ধি করা যায়।

কবির ভক্ত-হৃদি কেবল আত্মস্বতন্ত্র রূপানুরাগ নয়, তাঁহার কাব্যে অন্য একটি বস্তুর সমাবেশ অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কবির অলঙ্কার-প্রিয়তার কথা বলিয়াছি কিন্তু তাঁহার পক্ষপাতের অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান করি নাই। কবির মাণ্ডনিকতার মূলে আছে তাঁহার আভিজাত্য ও ঐশ্বর্য্যবোধ। ইহা ভক্তিরই আর এক দিক। রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে কবি কাব্য-উপাদান করিয়াছেন সত্য, এবং কবিপ্রাণের স্বধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া অনিবার্য্যভাবে তাহার মধ্যে সাধারণ নর-নারীর প্রেমলীলার ইতিবৃত্তই পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। কেবল সেই ইতিহাসটুকু থাকিলে তাহা প্রাকৃত প্রেমকাব্য হইত। কবি তাই তাঁহার কাব্যে 'ইতিহাসলোক' নির্ম্মাণ করিলেন। সেই বেষ্টনীর মধ্যে যে লীলাবিলাস, তাহা লৌকিক না থাকিয়া অলৌকিক হইয়া পড়িল। ভাষার ঐশ্বর্য্য ও অলঙ্কৃতি, ভাবের গূঢ়ত্ব ও গাম্ভীর্য্য, ছন্দের বিত্ত ও নৃত্য-দ্বারা গোবিন্দদাস তাঁহার রূপলোক নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ভাষা ভাব এবং ছন্দকে সাধারণ

জীবন হইতে উর্দ্ধে উঠাইয়া যখন কবি তাঁহার কাব্যরচনা করেন, তখন স্বভাবতঃই কাব্যবস্তু পাঠকের ব্যক্তিগত কামনাবাসনার নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া যায়। সেই দূরস্থিত লীলা চক্ষুগোচর হয় বটে, তথাপি মাঝখানে আছে অনতিক্রমনীয় ব্যবধান, সেখানে উপস্থিত হইবার কোন উপায় নাই। অর্থাৎ দূর হইতে চক্ষু ও মনের আস্বাদ ঘটিবে, সংলগ্ন হইয়া সম্ভোগ করা চলিবে না। প্রিয়ের সহিত নির্ব্বাধ নিরন্তর মিলন সম্পূর্ণ করিতে রাধিকা শেষ অলঙ্কারটুকুও বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন; সেই অপ্রাকৃত মিলন-লোক এবং প্রাকৃত মন-লোকের ব্যবধান বিস্তৃত করিতে গোবিন্দদাস কেবলই অলঙ্কারের পর অলঙ্কার চড়াইয়া গিয়াছেন। কাব্যের বিষয়বস্তুর সংগ্রহ হয় দুই স্থান হইতে: এক বিশ্বলোক, দুই শিল্পলোক। মানব-জীবনাশ্রয়ী কবি বিশ্বলোকের উপাদান গ্রহণ করেন—গ্রহণ করেন স্বয়ং দেখিয়া শুনিয়া, নিজের সব কয়টি ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় রাখিয়া। আবার নিছক সৌন্দর্য্যাশ্রয়ী কাব্যের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু শিল্পলোক হইতে সংগৃহীত হয়। না হইয়া উপায় নাই। বাস্তব জীবন অতি-বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যবোধ জাগাইতে পারে না। সেখানে নৈর্ব্যক্তিক সৌন্দর্য্য-ভাবনার সহিত পার্থিব জীবনের মৃত্তিকালিপ্ত আর পাঁচটা বস্তু মিশিয়া আর্টিস্টের কল্পনামূর্ত্তিকে অবিশুদ্ধ করিয়া ফেলে। তাই অবিকৃত রূপলোক নির্ম্মাণ করিতে হইলে প্রাচীন কবি-গৃহীত উপমা-উপমান, রূপ-প্রতিরূপ, ভাব-বিভাবের সঞ্চয় গ্রহণ করিতে হয়। প্রত্যেক কবিই পুরাতন উপমাদি গ্রহণ করেন, তবে বিমিশ্র ভাবে। যেমন বিদ্যাপতি। কিন্তু যিনি নিছক প্রাচীন কবিকৃত শিল্পলোকের সাহায্যে তাঁহার কাব্য-লোক নির্ম্মাণ করেন, বুঝিতে পারি, বর্ত্তমানকে অতিক্রম করিয়া স্বতন্ত্র আনন্দনিকেতনে তিনি পাঠকচিত্তকে উত্তীর্ণ করাইতে চান। গোবিন্দদাস তাঁহার ভাষা ছন্দ ভাব ও অলঙ্কারের বিশেষ প্রকৃতির সহায়তায় রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃতলোকে প্রাকৃত জনকে দৃষ্টি মেলিবার অবসরটুকু দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকাব্য আলোচনা করিতে গিয়া জনৈক সমালোচক যে কথা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করিতে বলি। 'ক্ষণিকার' কবি ছিলেন মানবজীবনরসের কবি। সে কবি যখন বর্ত্তমানের পশ্চাৎ-দ্বার উন্মোচন করিয়া প্রাচীন ভারত-কবি-লোকের অন্তরপুরীতে প্রবেশ করিতে চাহিলেন, তখন তাঁহার পক্ষে গতযুগে ব্যবহৃত কবিকথনের—ভাব-ভাষা ও ছন্দের—সাহায্যগ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর রহিল না। সেই প্রাচীন কবিকৃতির আভিজাত্য ও ঐশ্বর্য্যকে পুনরায় নিজের সৃষ্টির মধ্যে আমন্ত্রণ করিয়া তবে তিনি অর্দ্ধ-বিস্মৃত ভারতের সৌন্দর্য্যসভাতলে আসনগ্রহণের অধিকার লাভ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের লীলা-বৃন্দাবনে প্রবেশ করিতে গোবিন্দদাসকে তাহাই করিতে হইল। আমরা—যাহারা পদাবলীকে কাব্য হিসাবে

সাধারণভাবে পাঠ করিয়া থাকি—আমাদের অপেক্ষা যাঁহারা আসরে নূতন জগৎ সৃষ্টি করেন, সেই কীর্ত্তনিয়ার দল গোবিন্দদাসের এই বিশেষ কৃতিত্বটুকু অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করেন। কীর্ত্তনিয়ার নিকট গোবিন্দদাসই সর্ব্বাধিক প্রিয় কবি; তাঁহারা দেখেন, এই একমাত্র কবি, যাহার পদ সুর চড়াইলে একেবারে মেঠো হইয়া পড়ে না, একটা ঐশ্বর্য্যের আবেশ শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকে।

তদুপরি ছিল গোবিন্দদাসের সঙ্গীত-গুণ। গোবিন্দদাস খাঁটি অর্থে লিরিক কবি নন, অথচ সঙ্গীতের অবিচ্ছিন্ন স্রোতে একেবারে ডুবাইয়া দিতে তাঁহার মত সে যুগে কেহই পারেন নাই, এ যুগেও এক রবীন্দ্রনাথই পারিয়াছেন। এই সঙ্গীত-অঙ্গ অথবা সুরাঙ্গ-সৃষ্টির প্রেরণা কবি পাইয়াছেন আর এক বাঙালী কবির নিকট—তিনি কান্ত-পদাবলীর শ্রীজয়দেব। ঠিক এই সূক্ষ্ম সঙ্গীতবোধ—কাব্যের সুর-চেতনা—ভারতবর্ষে বঙ্গেতর অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যে মিলিবে কি না সন্দেহ। ভারতীয় সাহিত্যে সুর-সমর্পণ বাঙালীর শ্রেষ্ঠ সমর্পণ বলিতে দ্বিধা নাই। রবীন্দ্রনাথ একদা কালিদাসের কাব্যের ভাব-গভীর অথচ আপাত-অমসৃণ কাব্যাংশের শ্রেষ্ঠত্ব জয়দেবের অতি-ললিত অতি-মধুর পদাবলীর সহিত তুলনা করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। সেই অতি-যথার্থ সমালোচনার বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু ইহাও স্বীকার্য্য, ঐ অখণ্ড সঙ্গীতহিল্লোল একমাত্র জয়দেবের, অন্য কাহারও নয়। অনেকের ধারণা, বিদ্যাপতির নিকট গোবিন্দদাস এই সঙ্গীত-প্রাণতার জন্য ঋণী। বস্তুতঃ তাহা সত্য নয়। বিদ্যাপতির নিকট গোবিন্দদাসের ঋণ ছন্দের জন্য, সুরের জন্য নয়। বিদ্যা-পতির অনেক পদ বাহ্যরূপে অপেক্ষাকৃত ছন্দ-পরুষ, অথচ তাহাদের ভাবগৌরবের তুলনা নাই। সেখানে গোবিন্দদাস অনেক পিছনে। তথাপি গোবিন্দদাসের চূড়ান্ত প্রতিভা—অর্থাৎ সুর-প্রতিভার প্রশ্নে বিদ্যাপতির স্থান নিম্নেই।

গোবিন্দদাসের কাব্যের ক্লাসিক্যাল গাম্ভীর্য্যের সহিত এই সুর-মিশ্রণ ব্যাপারটা কিছু অদ্ভুত। আমাদের মনে হয়, ইহার জন্য অনেক সময় তাঁহার কাব্যে ভাবের অমর্য্যাদা ঘটিয়াছে। যতই হোক, মন এবং কান সমভাবে একসঙ্গে এককালে সক্রিয় থাকিতে পারে না। উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটিলে প্রথম-দ্বিতীয় স্থানভেদ হইবেই। সুরে যেখানে কান ডুবিয়া গিয়াছে, মনকে সেই সুরশয্যা হইতে জাগাইয়া সক্রিয় করা রীতিমত কঠিন; মন কেবলই গহনতলে ডুব দিতে চায়, ভাসিতে চায় না। সুখনিদ্রার অবসর কে ত্যাগ করে? তখন পরম পরিতৃপ্তিতে বা—আঃ বলিয়া একটি সুদীর্ঘ টান দিয়া আবেশে মনের দলগুলি মুদিত হইয়া আসে। সুরাধিক্যের এই এক বিপদ—ভাবের কবিত্ব হইতে বঞ্চনার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। কিন্তু সম্পদও কি নাই?

আছে। না বুঝিয়া বহুতর জন গোবিন্দদাসকে শ্রেষ্ঠ কবির আসন দেয়। কারণ আর কিছুই নয়, গোবিন্দদাসের সঙ্গীত কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—অন্তত: মরমে না পশুক,—সে সম্পর্কে ঠিক ঠিক সচেতনতা থাকে না,—কানের মাধ্যমে প্রাণকে যে মাত করিয়া দেয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গোবিন্দদাসের কাব্যের একটা রীতিমত ভার আছে—বস্তুভার। সযত্নে রচিয়া তোলা সেই কঠিন-গুরু বস্তুটিকে গানে দোলাইতে পারা কম কৃতিত্ব নয়। এই সুর-পক্ষে ভর করিয়া গোবিন্দদাসের পদ-পর্ব্বত নিরুদ্দেশ মেঘ হইতে চাহিয়াছে। স্থিতি এবং গতি, ক্লাসিক এবং মিউজিকের অপূর্ব্ব এই সমন্বয়কে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করিয়া বুঝাইতে চাই। বনস্পতি সম্পর্কে কবি বলিতেছেন:

পূর্ণতার সাধনায় বনস্পতি চাহে উর্দ্ধপানে;
পুঞ্জ পুঞ্জ পল্লবে পল্লবে
নিত্য তার সাড়া জাগে বিরাটের নিঃশব্দ আহ্বানে
মন্ত্র জপে মর্ম্মরিত রবে।
ধ্রুবত্বের মূর্ত্তি সে যে, দৃঢ়তা শাখায় প্রশাখায়,
বিপুল প্রাণের বহে ভার।
তবু তার শ্যামলতা কম্পমান ভীরু বেদনায়
আন্দোলিয়া ওঠে বারংবার।

'ধ্রুবত্বের মূর্ত্তি' গোবিন্দদাসের কাব্যই আবার 'কম্পমান ভীরু বেদনায়'—এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, পারিয়াছি বলি না।

গোবিন্দদাস খাঁটি লিরিক কবি নহেন, কাব্যের মধ্যে তাঁহার অবতরণ ঘটে নাই। তিনি অন্যের বেদনাকে—তাহার লীলা ও রসকে প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহা শেষ পর্য্যন্ত অপরের রহিয়া গিয়াছে। চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের মধ্যে রাধার সহিত একাত্ম হইবার প্রচেষ্টা বহুস্থলে; তাই অন্যের বেদনা বা আনন্দ বাহ্যত: তাঁহাদের কাব্যের উপজীব্য হইলেও যথার্থত: কবির প্রাণবেগ তাহাতে মুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বহুক্ষেত্রে তাহা মন্ময় গীতিকবিতার রূপ ধারণ করিয়াছে। গোবিন্দদাসের কাব্যে ইহা ঘটে নাই। ঘটিয়াছে কি, না দুটি বস্তু—নাটকীয়তা ও চিত্রধর্ম্মিতা। ইহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। কবি স্বয়ং কাব্যের বিভাব নন বলিয়া তাঁহার কাব্য উৎকৃষ্ট চিত্ররসের আধার হইতে পারিয়াছে এবং সেই নিশ্চল চিত্ররাজি বিশেষ কাব্যপর্য্যায়ে চলৎশক্তি লাভ করিয়া নাটকীয়তার সৃষ্টি করিয়াছে। গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব যে

যে পদপর্য্যায়ে, তাহার কোনটিতে হয় চিত্রধর্ম্ম, নয় নাটকীয়তা—ইহার যে কোন একটি অনুস্যূত। কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়ের মিলন। গৌরচন্দ্রিকায় উভয়ের মিলন, রূপানুরাগে চিত্র-রসের প্রাধান্য, অভিসারে নাটকীয়তা, মহারাসেও তাই।

গোবিন্দদাস সম্পর্কে সাধারণভাবে যে কথাগুলি বলিলাম, এখন সেগুলি যথাসাধ্য উদাহরণ-সংযুক্ত করিতে চেষ্টা করিব। আরম্ভে স্বতঃই গৌরচন্দ্রিকা।

গৌরচন্দ্রিকার পদে গোবিন্দদাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সংশয় জাগাইবার উপযোগী দ্বিতীয় পদকর্ত্তা নাই, একথা সর্ব্বথা গ্রাহ্য। গৌরচন্দ্রকে অগণিত মানুষ ভজনা করিয়াছে কিন্তু চন্দ্রিকাটুকু একমাত্র প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছেন পরম ভক্ত কবিরাজ গোবিন্দদাস। 'লোকে বলে' গোবিন্দদাস নাকি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে শ্রীচৈতন্যকে আঁকিয়াছেন। 'লোকে কি না বলে'। আমাদের মনে হয়, 'গৌরতনু' গোবিন্দদাসের মারফৎ আপনার 'লাবণি' আপনি কিছুটা আস্বাদ করিতে পারিয়াছে। গোবিন্দদাসের দর্পণটি বড় উজ্জ্বল, বড় স্বচ্ছ। দর্পণের মধ্যে আমিত্ব কিছু থাকে না, অথবা যদি কিছু থাকে তাহা গুণের মধ্যে মলিনতা-পরিহার ব্যতীত আর কিছু করিতে পারে না। গোবিন্দদাসের সাধনা সেই মালিন্য-মুক্তি ও দ্যুতি-ধারণের সাধনা। তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া তাই শ্রীচৈতন্যের একখানি পরিপূর্ণ রূপ-বিম্ব পাইয়াছি। কোন্ চৈতন্য?—যিনি ভক্তের ভগবান্, বৈষ্ণবের রাধা-কৃষ্ণ, বিভেদের শাস্তা,—প্রেমের অবতার। এই যে পরিপূর্ণ মানবত্ব এবং অতিমানবত্ব, ইহার যথাসম্ভব প্রকাশ পাইয়াছি অন্যত্র, একমাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজের মধ্যে। শ্রীচৈতন্যের পূর্ণরূপ তিনি দর্শন করিয়াছেন এবং নিজ কাব্যের দীর্ঘ পরিসরে অপরিসীম ভাবগৌরব ও অনুভবশালিতার সহিত তাহার রূপদানও করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার মধ্যে ভাব অপেক্ষা রস অল্প, কবিত্ব কাহিনীর তুলনায় গৌণ, দর্শন-গাম্ভীর্য্য সুর-রহস্যকে অতিক্রম করিয়া প্রতিষ্ঠিত। আমি একথা বলিতেছি আপেক্ষিক বিচারে; নচেৎ কবিরাজ গোস্বামীর কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। বরং আমি ইহাই বিশ্বাস করি, অতিরিক্ত রস-তারল্য তাঁহার কাব্যের ক্ষতি করিত, আরব্ধ ব্রত অসমাপ্ত থাকিয়া কবিতালক্ষ্মী পূজা পাইতেন, তাহা চৈতন্যচরিতামৃত হইত না, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল হইয়া দাঁড়াইত। জীবনী রচনার ক্ষেত্রে কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যের যে রূপাঙ্কন করিয়াছেন, কাব্যের ক্ষেত্রে গোবিন্দদাসের উপজীব্য তাহাই অর্থাৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাবমূর্ত্তিই গোবিন্দদাস কবিরাজের মধ্যে রসমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্য-সম্পার্কিত বৈষ্ণবশাস্ত্রের তাত্ত্বিক ধারণার অনুপম কবিত্বমণ্ডিত প্রকাশ গোবিন্দদাসের গৌরচন্দ্রিকায় মিলিবে। কেবল তাত্ত্বিক ধারণার পুঞ্জ নয়,

প্রাণরসও তাঁহার কাব্যে। ভাব এবং রস গোবিন্দদাসের পদে এমন সর্বাঙ্গীণ সুষমায় মিলিয়াছে,—যে-ভাব আবার সম্পূর্ণরূপে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র অনুমোদিত,—যে উভয়কে পৃথক করা অসম্ভব। সাধারণ পাঠক তত্ত্বের দিকে না চাহিয়া—চাহিবার কোন প্রয়োজন নাই—ঐ রস আস্বাদন করে। তথাপি তত্ত্ব আছে। গোবিন্দদাসের কাব্যের স্থপতি-লক্ষণের যে কথা বলিয়াছি, সেই স্থপতি-বিদ্যার প্রয়োগ কেবল রূপ-নির্মাণে নয় ভাব-দেহ গঠনেও; তাঁহার কাব্যের কোন অংশ যে অপরিবর্তনীয়, সে কেবল কাব্যের দেহসংস্থানের দিক হইতে নয়, ঐ পরিবর্তনে দেহের পশ্চাদবস্থিত ভাবপুরুষ আঘাত পাইবে বলিয়া। আমি এই জিনিসটি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আলোচনার প্রারম্ভে গৌরচন্দ্রিকার যে পদটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিতে বলি—ঐ 'নীরদ-নয়নে' পদটি। উক্ত পদটির রসের প্রশ্ন স্থগিত রাখিতেছি, তত্ত্ব ও তথ্যের দিক দেখা যাক।

"নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে"—ইহা চৈতন্যদেবের ঐতিহাসিক মূর্তি। "পুলক মুকুল"—তাহাও। মহাপ্রভু আকুল কণ্ঠে প্রার্থনা করিতেন (এবং সাধনা ও সিদ্ধি উভয়ের বিগ্রহ তিনি)—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

মহাপ্রভুর প্রার্থনা-মূর্তি ও গোবিন্দদাস-অঙ্কিত ভাবমূর্তির ঐক্য প্রদর্শনের আর প্রয়োজন নাই। কিন্তু একটা কথা মনে হইতেছে, ঐ "নীরদ নয়নে", ইহার অর্থ কি মহাপ্রভুর নীরদ নয়ন হইতে নীরসিঞ্চন হইতেছে, না রাধার মত এই রাধাভাবিত মানুষটিও "চাহে মেঘপানে না চলে নয়ন তারা",—"নীরদ" অর্থাৎ মেঘরূপী কৃষ্ণ মহাপ্রভুর "নয়নে" লাগিয়াই আছে, আর সেই নীল নীরদ হইতে অবিরত প্রেমবারি সিঞ্চিত হইয়া চৈতন্য-কদম্বকে পুলক-কণ্টকিত করিতেছে। তাহার পর: "স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকশিত ভাব-কদম্ব"। 'স্বেদ' অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের বিকার-বিশেষ—ভাবোন্মত্ত মহাপ্রভুর দেহ বাহিয়া স্বেদ অঝোরে ঝরিত। কিন্তু "ভাব-কদম্ব"? সুনিশ্চিতভাবে ভাবাবস্থায় কদম্ব-কোরকের সমতুল রোমাঞ্চ-শিহরিত তনুদেহের কথাই বলা হইতেছে। তথাপি যদি বলি—ব্যঞ্জনার দিক হইতে—কদম্বতলে 'ভাব' বিকশিত হইতেছে—নিত্য বৃন্দাবনের কদম্ব বৃক্ষের নিম্নেই মহাভাব-রূপা রাধারাণীর আত্মবিকাশ; রাধাভাবিত চৈতন্যের কি একই অবস্থা? অতঃপর

"কি পেখলুঁ নটবর গৌরকিশোর"। বাহ্য অর্থ অতি সহজ, কিন্তু গৌরকিশোরের 'কিশোর' কবি পান কোথায়, বৃন্দাবনের চিরকিশোর না কি? তারপর—

"অভিনব হেম-কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর।"

যুগপরিবেশে চৈতন্যপ্রেমের অভিনবত্ব ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না। মহাপ্রভুর হেমকান্তি, কল্পতরুবৎ আচরণ—কেমন কল্পতরু, যিনি সঞ্চরণ করিয়া বেড়ান, যাচিয়া ডাকিয়া করুণা করেন, আসিতে হয় না,—সুরধুনী-তীরে তাঁহার প্রেমাবস্থা—এ সকলই তথ্যঘটিত সত্য। 'অভিনব' ইত্যাদির সমর্থন আছে বৈষ্ণব-দর্শনে—অনর্পিতচরীংচিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ—অনর্পিত বস্তু যিনি দান করেন তিনি অভিনব কল্পতরু বটে। অতঃপর "চঞ্চল চরণ কমলতলে ঝঙ্করু ভকত-ভ্রমরগণ ভোর"—কীর্ত্তনরত চরিতাখ্যান-প্রবৃত্ত ভক্তবেষ্টিত চৈতন্যের একেবারে বাস্তব ছবি। (পরবর্ত্তীকালের একটি শাক্তগীতিকায় অনুরূপ পদাংশ—হয়ত উৎকৃষ্টতর 'মজিল মোর মনভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে')। চঞ্চল চরণ-কমল কেন, না এই কমল সৌরভ বিলাইয়া ভাসিয়া বেড়ায়; নবদ্বীপ হইতে নীলাচল, বৃন্দাবন হইতে দক্ষিণের ব্রহ্মগিরির পথধূলি পদকমল-রেণুতে পবিত্র। ইহার পর: "পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই"—বৈষ্ণব-দর্শন অনুসারে অবতারী সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য—সুরাসুরের ধাবনে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। আর: "অহনিশি রহত অগোর"—দিব্যোন্মাদ মহাপ্রভু।

"অবিরত প্রেম-রতনফল বিতরণে
অখিল-মনোরথ পুর।"

—শ্রীকৃষ্ণের রাধাভাব-আস্বাদনের কালের সহিত ভূভার-হরণের কালও মিলিয়া গিয়াছিল; সুতরাং পঞ্চম পুরুষার্থ অকৈতব প্রেম-রতন-ফল বিতরণ। সর্ব্বশেষে: "তাকর চরণে দীন হীন বঞ্চিত গোবিন্দদাস রহু দূর"—একেবারে খাঁটি বৈষ্ণবীয় উক্তি। মহাপ্রভুর সময়ে কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা অপ্রাকৃত বলিয়া স্বীকৃত; গোবিন্দদাসের সময়ে চৈতন্যের বাস্তব-লীলা অপ্রাকৃতত্ব লাভ করিয়াছে, সুতরাং "গোবিন্দদাস রহু দূর।"

পদটির তত্ত্ব ও তথ্যঘটিত দিক উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিলাম। এই তত্ত্ব-ব্যাখ্যা সত্য হউক বা না হউক, পদটির কাব্যত্ব ঐ তত্ত্বের উপর একান্ত-নির্ভর নহে। ইহার কবিত্ব স্বতঃসিদ্ধ। "নীরদনয়নে"—সুরু করিলেই মন মজিয়া যায়। যে মহাজীবনের গাথা কবি রচনা করিতেছেন, তাহার অনুপম-সুন্দর মাধুরীতে হৃদয় ভরিয়া উঠে। সুর এবং ছন্দের মারফৎ শ্রীচৈতন্যের যে চিত্রটি ফুটিল তাহা যেমন

অপূর্ব্ব তেমন সত্য। রবীন্দ্রনাথ যেখানে মহাজীবনের বন্দনা করিতেছেন—"কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্ম্মের নিয়ম" ইত্যাদি, সেখানে কবির প্রকাশভঙ্গির উৎকর্ষটুকু উদ্দিষ্ট ভাবকে মর্ম্মগোচর করায়, রামচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব সেখানে অনেকটা abstract—বাস্তব জীবনের দৃষ্টান্ত-সংযুক্ত নহে। অথচ এখানে মানব চৈতন্য,—অতি-মানব চৈতন্যও, কোথাও হারায় নাই। তাঁহার করুণা, প্রেম, ভাব-ভক্তি সকলই জীবনের আশ্রয় লাভ করিয়াছে। অবশ্য কবিতাটির উৎকর্ষের অন্যতম কারণ গোবিন্দদাসের সহজাত কবি-প্রকৃতির মধ্যে পাওয়া যাইবে—পদটি চিত্ররসাত্মক। সে চিত্র জীবন্ত হইতে পারিয়াছে কবির রসসৃজন শক্তির গুণে।

গৌরচন্দ্রিকার পদগুলিতে তত্ত্ব এবং তথ্য মিলাইয়া শ্রীচৈতন্যের পরিপূর্ণ ভাব ও রূপ-বিগ্রহ নির্ম্মাণে কবির যে সামর্থ্যের উল্লেখ করিতেছিলাম, তাহার অধিক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই, কেবল নিম্নের সামান্য কয়টি পঙ্‌ক্তি হইতে চৈতন্য-ব্যক্তিত্বের আভাস পাওয়া যাইবে:

বিপুল পুলককুল- আকুল কলেবর
গরগর অন্তর প্রেমভরে।
লহু লহু হাসনি গদগদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥
নিজ রসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত
গায়ত কত কত ভকতহি মেলি।

বা—পতিত হেরিয়া কান্দে থির নাহি বান্ধে
করুণ নয়ানে চায়।......
বরণ-আশ্রম কিঞ্চন-অকিঞ্চন
কার কোন দোষ নাহি মানে।
কমলা-শিব-বিহি- দুলহ প্রেমধন
দান করয়ে জগজনে॥

বা—পুলক বলিত অতি ললিত হেম-তনু
অনুখন নটন বিভোর।
কত অনুভাব অবধি না পাইয়ে
প্রেমসিন্ধু-বহ নয়নহি লোর॥



চৈতন্যতত্ত্বের ছন্দোময় প্রকাশ :

জয় নন্দ-নন্দন গোপী-জন-বল্লভ
রাধানায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন নদীয়া-পুরন্দর
সুরমুনিগণমন মোহন ধাম ॥
জয় নিজ কান্তা- কান্তি কলেবর
জয় জয় প্রেয়সীভাব বিনোদ।······

গৌরচন্দ্রিকার আলোচনার শেষে, এই সকল পদে পূর্ব্বকথিত কবির ভক্তি-প্রাণতা এবং তদ্জাত কবির অহং-বিলয়, চিত্রধর্ম্মিতা, ভাব-প্রতিষ্ঠিত সুদৃঢ় কাব্যাবয়ব ও তদন্তর্গত সঙ্গীত-লাবণ্য যে কিরূপে ও কিভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হয়ত সাধারণভাবে দেখাইতে পারিয়াছি। এখন অন্য যে যে রসপর্য্যায়ে কবির শ্রেষ্ঠত্ব, সে গুলির বিচারে আসা যাক। যথা রূপানুরাগ।

পূর্ব্ব মন্তব্যের সমর্থন করিয়া পুনর্ব্বার বলিতেছি, গোবিন্দদাসের কবিপ্রাণতার মূলে আছে রূপানুরাগ এবং উহা তাঁহার স্বাভাবিক ভক্তিপ্রাণতার একটি দিক। কেবল রূপানুরাগ-নামাঙ্কিত কাব্যপর্য্যায় নয়, সকল শ্রেণীর পদেই রূপের প্রতি পরমাসক্তির নিদর্শন মিলিবে। রূপানুরাগের আর এক শ্রেষ্ঠ কবি জ্ঞানদাস। কিন্তু জ্ঞানদাসের রূপানুরাগের পদে অনুরাগটি কতখানি রূপের প্রতি, আর কতখানি স্বরূপের প্রতি, তাহা নির্দ্ধারণ করা শক্ত। শক্তই বা বলি কেন, আসলে তাহা স্বরূপানুরাগই। চণ্ডীদাসেও তাই। এ বিষয়ে গোবিন্দদাসের একমাত্র তুলনা বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি সত্যকার রূপানুরাগের পদ লিখিয়াছেন; কারণ তাঁহারও গোবিন্দদাসের অনুরূপ আত্মবিবিক্তির শক্তি ছিল; গোবিন্দদাস কৃষ্ণ বা রাধার রূপ দেখিয়া "সে কথা কবার নয়" বলিয়া হাল ছাড়িয়া দেন নাই, রূপ দর্শন ও চিত্রণ করিবার চিত্তস্থৈর্য্য তাঁহার ছিল। এই ধৈর্য্য আবার তাঁহাকে ভক্তিই দিয়াছে। দেবতার মূর্ত্তি যে শ্রদ্ধা লইয়া ভক্ত-শিল্পী তিল তিল করিয়া গড়িয়া তোলে, সেই শ্রদ্ধা দ্বারাই গোবিন্দদাস তাঁহার রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন। যতই ভক্তির আবেশ আকুলতা থাক, ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার দ্বারা ভক্ত-আর্টিষ্ট কখনো দেবমূর্ত্তিকে বিকৃত করিতে পারে না। ভক্তি-স্পন্দন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, আর্টিষ্টের তন্ময়তাও সেই অনুপাতে বাড়িতে থাকে, আপন আরাধ্য দেবতার যুগাগত মূর্ত্তিকে যথাযথ রূপায়িত করিতে নিবিষ্ট-চিত্ত হইয়া পড়েন; তাঁহার ভক্তিও যত—আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মসংহরণও তত। একটি পদ গ্রহণ করা যাক :

নবঘন পুঞ্জ পুঞ্জ জিতি সুন্দর
অনুপম শ্যামর-শোভা।
পীত বসন জনু বিজুরী বিরাজিত
তাহে চাতক মনোলোভা ॥
পেখলুঁ সুন্দর নন্দকিশোর।
কালিন্দীতীরে তীরে চলি আওত
রাধারতিরসে ভোর।
মণিময় হার বিরাজিত উরপর
ভালে এক সিন্দূর-বিন্দু।
নীল গগনে জনু নখত বিরাজিত
তাহে উজোরল ইন্দু ॥
ভুজযুগ কালভুজগ জনু দোলত।······
পদপঙ্কজ পর মণিময় নূপুর
চলত নাচন ঘন বাজে।······

পদটির কবিত্ব স্বতঃপ্রকাশ, ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। কিন্তু রূপবর্ণনায় খুঁটিনাটির দিকে কী লক্ষ্য। প্রথমে সামগ্রিক দেহরূপ "নবঘনপুঞ্জ" ইত্যাদি। তাহার পর পীত বসন, কালিন্দী-তীর বাহিয়া চলিবার ভঙ্গিটুকু,—রাধা-প্রেমে বিভোর, তাই একটু মত্ত পদক্ষেপ। বক্ষের হার, ললাটের সিন্দূর-বিন্দু, কৃষ্ণ ভুজযুগ, পদ-নূপুর এবং তাহার ঝঙ্কার—কিছুই কবির চোখ এড়ায় নাই। এমন অপূর্ব্ব রূপ কবি দেখিলেন, অথচ—তাঁহার ব্যক্তি আমির কথা বলিতে পারি না—আর্টিষ্ট-আমি কোথাও আত্মহারা হইল না। কবির বিস্ময় প্রকাশ পাইয়াছে উচ্ছ্বাসের মধ্যে নয়, তাঁহার চিত্ত-স্ফূর্ত্তির পরিচয় আছে বর্ণনাভঙ্গিতে, উপমা-নির্ব্বাচনে। তাঁহার বিস্ময় আর্টিষ্টিক বিস্ময়,—বিস্ময় যত গাঢ় হয়, ততই উপমা-উৎপ্রেক্ষা নির্ব্বাচনের অব্যর্থতা বাড়িয়া যায়—ভাব-অর্থ শব্দ-বিদ্ধ হয়। কবির চিত্ররস-সৃজনের দক্ষতাও আশাতীতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে—অলঙ্কার-নৈপুণ্যও। পদটির গাম্ভীর্য্যও অদ্ভুত,—"নবঘন পুঞ্জ পুঞ্জ জিতি সুন্দর" পড়িলেই মনে সুগম্ভীর তান উত্থিত হয়। এই ধরণের আর একটি রূপবর্ণনার পদ, যাহা গোবিন্দদাস-চিহ্নিত :

অরুণিত চরণে রণিত মণিমঞ্জীর
আধ আধ পদ চলনি রসাল

কাঞ্চন-বঞ্চন বসন-মনোরঞ্জন
অলিকুল-মিলিত ললিত বনমাল ॥
ভালে বনি আওয়ে মদন মোহনিয়া।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম
রঙ্গিম ভঙ্গিম নয়ন নাচনিয়া ॥

নন্দনন্দন চন্দচন্দন
গন্ধনিন্দিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর কম্বু কন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর-ভঙ্গ ॥—ইত্যাদি

পদের গৌরব যদিচ ছন্দ-চাতুর্য্যে এবং গোবিন্দদাসের নিজস্ব অপরূপ সুর-মাধুর্য্যের জন্য, তথাপি পদটির শেষ পর্য্যন্ত কবি রূপানুরাগের একনিষ্ঠ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। অবশ্য গোবিন্দদাসের এমন পদও আছে যেখানে নিছক রূপাঙ্কন হইতে ঐ রূপ-জনিত ভাবোদয় কবির কাব্যোপজীব্য ঃ

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক ন তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ ॥
সজনি অব কি করবি উপদেশ।
কানু-অনুরাগে মোর তনুমন মাতল
না শুনে ধরম-ভয় লেশ ॥ ইত্যাদি

—তথাপি সন্দেহ থাকে না, এই রূপঘটিত চিত্ত-বিস্ফার, ইহা শ্রীমতী রাধিকারই, কবির নয়।

খাঁটি রূপানুরাগের পদে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব। রূপানুরাগের নামাঙ্কিত অথচ আসলে যাহা স্বরূপানুরাগ ব্যতীত আর কিছু নয়, তেমন পদে অবশ্য চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের উৎকর্ষ দূর-প্রসারী। জগদানন্দ দু'একটি পদে এ বিষয়ে গোবিন্দদাসকে অনুসরণ করিতে পারিয়াছেন। নিম্নের পদাংশে গোবিন্দদাসের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ঃ

ঘন গঞ্জন চিকুর-পুঞ্জ
মালতী-ফুল মালে রঞ্জ

অঞ্জনযুত কঞ্জ নয়ন
খঞ্জন গতিহারী।
কাঞ্চন-রুচি রুচির অঙ্গ
অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ
কিঙ্কিণী-কর কঙ্কণ মৃদু
ঝঙ্কৃত মনোহারী॥ ইত্যাদি

অবশ্য তাবৎ বৈষ্ণবসাহিত্যে অন্য আর একজন কবির রচিত এমন একটি পদের সন্ধান পাওয়া যায়, যাহাকে খাঁটি রূপানুরাগের পদ না বলিয়া উপায় নাই, অথচ ভাবগৌরবে ও চিত্রণ-দক্ষতায় পদটি গোবিন্দদাসের পদের তুলনায় কোনমতে নিম্নস্তরের নয়। গোবিন্দদাসের রূপমুগ্ধতা উহাতে না থাকিলেও কবি রাধিকার রূপবিভোরতা এমন এক অপূর্ব্ব চাতুর্য্যের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মন মুগ্ধ হয়। বসু রামানন্দের পদটি তুলিয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না:

বেলি অবসান-কালে একা গিয়াছিলাম জলে
জলের ভিতরে শ্যামরায়।
ফুলের চূড়াটি মাথে মোহন মুরলী হাতে
পুন শ্যাম জলেতে লুকায়॥
পুন জলে ঢেউ দিতে বিম্ব উঠে আচম্বিতে
বিম্বের মাঝারে শ্যামরায়।
চূড়ার টালনি বামে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম-ঠামে
জাতিকুল মজাইলাম তায়॥
পুন জলে দিতে ঢেউ কোথায় না দেখি কেউ
জল স্থির হইলে দেখি কানু।
ধরি ধরি মনে করি ধরিবারে নাহি পারি
অনুরাগে জলে ডুবেছিনু॥
কর বাড়াইয়া যাই শ্যামের নাগাল নাহি পাই
কাঁদিতে কাঁদিতে আইলাম ঘরে।
হায় আমি অভাগিনী না পাইলাম শ্যাম গুণমণি
সেই দুখে হৃদয় বিদরে॥
বসু রামানন্দের বাণী শুন শুন ঠাকুরাণী
অকারণে জলে ডুবেছিলে।

বুঝিতে নারিলে মায়া জলে ছিল অঙ্গ-ছায়া
শ্যাম ছিল কদম্বের মূলে ॥

পূর্ব্বরাগও যথার্থতঃ রূপানুরাগ পর্য্যায়ে পড়ে, অন্ততঃ গোবিন্দদাসের কাব্যে। বিদ্যাপতিরও। রূপ-দর্শন করিয়াই রাগ জন্মে। গোবিন্দদাস এই প্রাকৃত সত্যটিকে মান্য করিয়া চলিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস বা জ্ঞানদাস করেন নাই। চণ্ডীদাসে নাম শুনিয়াই রাগ—তিনি পূর্ব্বজন্মের প্রীতিকে পরজন্মের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ফলে রাধিকা জন্ম হইতে "মহাযোগিনীর পারা," কিংবা "পরাণে পরাণে নেহার" বোদ্ধা। কাব্যোৎকর্ষের দিক দিয়া চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের স্থান পূর্ব্বরাগ-পর্য্যায়ে গোবিন্দদাস অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধে। তাহা সত্য, কারণ গোবিন্দদাসের পূর্ব্বরাগে দেহের ভাগ অধিক, মন অবর্ত্তমান। বিদ্যাপতিরও একই অবস্থা। শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগে বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের অবস্থা অতি শোচনীয়। নারীর পূর্ব্বরাগে রূপলালসা অপেক্ষা মর্ম্মপীড়ন অধিক। চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসে ঐ মর্ম্মপীড়নের কাব্যরূপ অতুলন। অপরপক্ষে পুরুষের জন্য নারীর রূপলালসা এবং তাহার চিত্রণ উৎকৃষ্ট কাব্যের আধার হইতে পারে না। পুরুষ-সৌন্দর্য্য—যতই হোক—নারী-সৌন্দর্য্যের অনুরূপ বর্ণন-উৎকর্ষ লাভ করে না। অথচ বিদ্যাপতি বা গোবিন্দদাসের পক্ষে—তাঁহাদের প্রতিভাধর্ম্ম অনুযায়ী—কৃষ্ণরূপের বর্ণনা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সুতরাং তাঁহাদের এই বিষয়ের কাব্যও অসুন্দর। অন্যদিকে পুরুষের চোখ দিয়া নারীকে দর্শন এবং দর্শন-ফল উত্তম কাব্যরূপ ধারণ করিতে পারে। তাই কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, যাহার ভিতর কৃষ্ণের দৃষ্টির মাধ্যমে রাধারূপের উপভোগ আছে, সেখানে কাব্যসৌন্দর্য্য বঞ্চনা করে নাই। এই কারণে কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগে বিদ্যাপতির হাত হইতে "গেলি কামিনী গজহুঁ গামিনী," "যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই"—ইত্যাদি কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর পদ পাইয়াছি। এ ব্যাপারে গোবিন্দদাসও পিছাইয়া নাই। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ-বিষয়ক কয়েকটি ভাল পদ তাঁহারও আছে। পদগুলির শ্রেষ্ঠত্বের কারণ সেই একই—কবির রূপের প্রতি অনুরাগ; এগুলিকে পূর্ব্বরাগের পদ না বলিয়া রূপানুরাগের পদও বলিতে পারি :

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোথি ॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত ॥···
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল বন ভরই ॥

যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুসুম পরকাশ ॥…

বা—

চম্পকদাম হেরি চিত অতি কম্পিত
লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তরে জাগয়ে নিরন্তর
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ ॥…

গোবিন্দদাসের কয়েকটি রাসের পর আছে—ইহাদের জুড়ি বৈষ্ণব সাহিত্যে নাই। আনন্দ নয়, সুখ নয়, তৃপ্তি বা সন্তোষ নয়—একেবার উদ্দাম উল্লাস,—পদগুলির মধ্য দিয়া উল্লাস যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। শারদ পূর্ণিমার রজনী, অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ, বর্ষণ-ক্ষান্ত স্বচ্ছ সুনীল আকাশে মুক্তির অফুরন্ত অবসর, এমন সময়ে কৃষ্ণের বাঁশি বাজিল—বাজিল, না, হৃদয়যন্ত্রটাকে বাজাইয়া দিল। নৃত্যচ্ছন্দের প্রত্যেক পদপাতে লাজলজ্জা, মানঅভিমান, কুলগোকুল—সব মাড়াইয়া গুঁড়াইয়া গোপীরা ছুটিয়া আসিতেছে—আজ আকাশে উল্লাসে, বাতাসে উল্লাস, হাসিতে উল্লাস, বাঁশিতে উল্লাস, দেহে উল্লাস, 'নেহে' উল্লাস—কবির সুরে ছন্দে ভাবে ভাষায় উল্লাস—এ যেন উল্লাসের মাথায় মাতনের ঘূর্ণী লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে—মহারাসের মহারাগ কবিকে একেবারে উন্মত্ত করিয়া ফেলিয়াছে :

ওরে কবি আজ তোরে করেছে উতলা
ঝঙ্কার-মুখরা এই ভুবন-মেখলা
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা। (চঞ্চলা)—বলাকা

যে পদটি উদ্ধৃত করিতেছি, বোধকরি তাহার মত উল্লাস-রসের এমন ত্রুটিলেশশূন্য অনবদ্য কাব্যাংশ আর মিলিবে না। প্রথম প্রকৃতির পটভূমিকা :

শরদ-চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ
ফুল্ল মল্লী মালতী যূথী
মত্ত মধুপ ভোরণী।

এহেন সময়ে :

হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি

মুরলী-গান পঞ্চম তান
কুলবতী চিত চোরণী ॥

এ পর্য্যন্ত একটি সংবাদ পাইয়াছি, সময় বুঝিয়া পঞ্চমে কৃষ্ণের বাঁশি বাজিয়াছে—যে বাঁশি কুলবতী-চিত-চোরণী, যে বাঁশি বাজিলে "কুলবতী-ধরম কাচ সমতুল"। পরের শ্লোকে দেখিব, কৃষ্ণের সেই বাঁশি অপ্রবুদ্ধ মোহাচ্ছন্ন বৃন্দাবনের কানে কানে উঠিবার—উঠিয়া ছুটিবার বার্ত্তা কানাকানি করিয়া গেল। কৃষ্ণ-করুণায় আজি বৃন্দাবনের সহসা-জাগরণ—তন্দ্রাজড়িমা এখনো কাটে নাই—স্বপ্ন ভাঙিয়া নির্ঝর শৈলগাত্রে প্রথম আঘাত করিয়াছে—শ্লোকটির মন্থর-ছন্দে, সংযত শব্দ-বিন্যাসে ভাঙিয়া পড়িবার পূর্ব্বের ভাব-স্তব্ধতা ফুটিয়াছে :

শুনত গোপী প্রেম রোপি
মনহি মনহি আপনা সোঁপি
তাহি চলত জাহি বোলত
মুরলীক কললোলনী।

অতঃপর আর বাধা মানিল না—কি গোপীর প্রাণ-ভঙ্গি, কি কবির ছন্দোভঙ্গি,—নির্ঝরের কেবল স্বপ্ন ভাঙে নাই, বন্ধও টুটিয়াছে। সেই অভূতপূর্ব্ব আনন্দোল্লাসের চিত্র :

বিছুরি গেহ নিজহু দেহ
এক নয়নে কাজর রেহ
বাহে রঞ্জিত মঞ্জীর এক
এক কুণ্ডল দোলনী।

শিথিল ছন্দ নীবিনিবন্ধ
বেগে ধাওত যুবতীবৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
গলিত বেণী লোলনী ॥

চিত্র-দক্ষতা, সেই চিত্রের মধ্যে চলিষ্ণুতা আনিয়া দিবার শক্তি, নাটকীয়তা এবং রূপমুগ্ধতা—গোবিন্দদাসের নিজস্ব কয়েকটি শক্তির সম্মিলন, পূর্ব্বোদ্ধৃত পদটিতে পাইয়াছি—তদুপরি উহার উল্লাসোচ্ছ্বাস। নিম্নের পদাংশগুলিতে অনুরূপ উৎকর্ষের সন্ধান না মিলিলেও এগুলি প্রশংসাযোগ্য :

ধনি ধনি অপরূপ রাস-বিহার।
থির বিজুরী সঞে চঞ্চল জলধর
রস বরিখয়ে অনিবার॥
কত কত চান্দ তিমিরপর বিলসই
তিমিরহু কত কত চান্দে।
কনক লতায়ে তমালহু কত কত
দুহুঁ দুহুঁ তনু তনু বান্ধে॥

কিংবা:

শ্যামরু অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম
ললিত ত্রিভঙ্গিমধারী।
ভাঙ বিভঙ্গিম রঙ্গিম চাহনি
রঙ্গিনী বয়ান নেহারি॥

"শরদ চন্দ" পদটি একেবারে অনলঙ্কৃত, উপরিউদ্ধৃত অংশগুলিতে অলঙ্কারের আপেক্ষিক আধিক্য।

মহারাসের পদগুলি আস্বাদ করিবার সময় মনে হয়, এই পদগুলি এতদূর উৎকর্ষ পাইল কিরূপে? এগুলির মূল ভাব মিলনের, কিন্তু গোবিন্দদাসের মিলন-মূলক পদ এমন চমৎকার নয়। সেখানে আলঙ্কারিক কৃতিত্ব এবং সূক্ষ্ম রীতিনৈপুণ্য আছে বটে, তথাপি এমন প্রাণশক্তি নাই। তাহার কারণ মনে হয়, মিলনে একটা বদ্ধতা আছে। সীমাবদ্ধ ভোগের চিত্র কাব্যহিসাবে সার্থকতা লাভ করিতে পারে না, যদি তাহার মধ্যে আত্মবিস্তৃতির বিপুল অবকাশ না থাকে। বিরহ সেই মুক্তির অবসর দেয়। ভোগের মধ্যেও বিচ্ছেদ, পাওয়ার মধ্যেও হারাই হারাই ভাব, আলিঙ্গনের মধ্যে আশঙ্কার শিহরণ (তুঃ "রম্যাণি বীক্ষ্য"—কালিদাস; "মেঘালোকে ভবতি"—কালিদাস; "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে"—জ্ঞানদাস; "জনম অবধি হাম" বিদ্যাপতি, ইত্যাদি) পদ্যচ্ছন্দকে কাব্যরূপ দান করে। গোবিন্দদাস কিন্তু সেই বেদনার কবি নহেন। সাধারণভাবে তাঁহার কাব্য-নায়িকা আশ্লেষ-মুহূর্তে অশ্রুবর্ষণ করে না। তাই মিলন-বর্ণনায় নয়—মিলনমূলক অন্য পদে গোবিন্দ-দাস শ্রেষ্ঠ, যেমন রাস। রাসে বিরহবোধ নাই সত্য কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির উদার পটভূমিকা আছে। সেই প্রকৃতি কবিচিত্তকে আপন বিশাল বিস্তারের ভিতর ছুটাইয়া নাচাইয়া ফিরাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মেঘদূতের সমালোচনা প্রসঙ্গে ঐ কথাই বলিয়াছেন। মিলনের দিনে বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিকা ছিল না বলিয়া তাহাতে আনন্দ

জাগে নাই; তাই কালিদাসকে রামগিরি হইতে অলকা পর্য্যন্ত বিরহশ্বসিত পথটিকে সৃজন করিতে হইয়াছে। মহারাসে কেবল বিশ্বপ্রকৃতির পৃষ্ঠরক্ষা নয়, তদুপরি আছে চলিষ্ণুতা—গতিবেগ। গতি ও বেগের ক্ষেত্রে গোবিন্দদাসের কবি-প্রতিভা একটা স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি আবিষ্কার করে। অভিসারের পদে তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত মিলিবে।

অভিসারের পদে গোবিন্দদাস রাজাধিরাজ। তাঁহার একাধিপত্যে সন্দেহ জাগাইবার মত দ্বিতীয় বৈষ্ণব কবি নাই। সমকক্ষতা তো দূরের কথা, কাছাকাছি আসিতে পারেন এমন কবিও দেখি না। বিদ্যাপতির কয়েকটি পদে ["বরিস পয়োধর ধরণী বারি-ভর রয়নি মহাভয়ভীমা"; "গুরুজন নয়ন অন্ধ করি আওল বাঁধব তিমির বিসেখ"; "চকিত চকিত কত বেরি বিলোকই" (?)] এবং রায়শেখর ও অনন্ত-দাসের দুইটি পদে ("গগনে অবঘন মেহ দারুণ সঘনে দামিনী ঝলকই"; "ধনি ধনি বনি অভিসারে";) অভিসারের ভাব ভালই ফুটিয়াছে, তবে গোবিন্দদাসের সঙ্গে তুলনীয় হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে নাই।

অভিসারের পদে গোবিন্দদাসের অতুলনীয় চমৎকারিত্বের কারণ কি? সংক্ষেপে, তাহা কবির স্বকীয় প্রতিভাধর্ম্ম—তাঁহার চলিষ্ণুতা ও চিত্র-রস-রসিকতা এবং পরোক্ষ অভিজ্ঞতা-রস। কবির নিজ কবি-মর্ম্ম কাব্যের রূপ-নির্ম্মাণে শক্তি দিয়াছে এবং শ্রীচৈতন্য-জীবনের অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা সেই শক্তিকে সার্থকতার পথ প্রদর্শন করিয়াছে।

অভিসারের পরিকল্পনা কিছু মৌলিক নয়, মৌলিক হইতে পারে না। সৃষ্টির আদি মুহূর্ত্ত হইতে বিবর্ত্তনের পথে মানবজীবনের অগ্রগতির সহিত অভিসারের পরিকল্পনার এতই ঘনিষ্ঠতা যে, যাহা কিছু দীর্ঘ কৃচ্ছ্রসাধনায় লভ্য, সংগ্রামে অঙ্গীকার্য্য, তাহাকেই অভিসার—জীবনাভিসার বলিয়া আসিয়াছি। পৃথিবীর যেমন দুই গতি, আহ্নিক ও বার্ষিক, একটি স্ব-বৃত্ত অন্যটি সূর্য্য-বৃত্ত, তেমনি মানব-জীবনেরও দুই গতি; একটি হইল অসীম অতীত হইতে অনন্ত ভবিষ্যতের অভিমুখে পথ-পরিক্রমা, অন্যটি সেই পথে চলিতে চলিতেই আত্মপ্রেম—স্বীয় কামনাবাসনার চতুর্দ্দিকে চক্রমণ। মানবীয় প্রেমের জন্য তেমন স্ব-বৃত্ত-গতি বহুপূর্ব্বকালেই অভিসার আখ্যা পাইয়াছে। সংস্কৃত কাব্যে—বিশেষতঃ কালিদাসের মধ্যে তাহার দৃষ্টান্ত আছে। যথা:

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্বীং
তোয়াৎসর্গস্তনিতমুখরো মাস্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ॥

গীতগোবিন্দের কবিও কোমল-করুণ সুরে অভিসারের কথা বলেন :

ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।...
নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্॥...
পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরম্ রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্॥

জয়দেবের ধীর-ললিত মৃদুকম্পিত ছন্দহিল্লোলে অভিসারের প্রাণোত্তাপ ফুটে নাই। জয়দেবের গান এ ঘর হইতে ও ঘরে যাইবার গান, ঘর হইতে বাহিরে যাইবার নহে। অথচ অভিসারের মধ্যে আছে একটা অনিবার্য্য প্রাণাবেগ, দুর্জ্জয় আত্মবিশ্বাস, অতন্দ্র সাধন-দীপ্তি, অপরিসীম উৎকণ্ঠার যন্ত্রণাময় আকূতি। তাহা কেবল প্রেমের লীলা-বৈচিত্র্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই- তাহা কেবল আহ্নিক-গতির আত্মপরিক্রমা নহে—জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকাব্যগুলিতে তাহা সৌরাবর্ত্তনের গতিবেগ লইয়াছে। অনন্তের জন্য অন্তহীন পদক্ষেপ অভিসারের রূপ ধরিয়াছে। কখনো পথের রূপ দেখিয়া যেন পথিক আর্ত্তনাদ করিয়া ওঠে—ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি; সে আর্ত্তকণ্ঠে পরক্ষণে আহ্বানের সিংহগর্জ্জন বাজিয়া ওঠে—চরৈবেতি চরৈবেতি—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। চলিতে চলিতে চলৎ-শক্তির গোপন রহস্যটুকু প্রকাশ করিয়া দেয়—গীতার অভ্যাসযোগের কথা আসে ;—সমস্ত মিলিয়া মানবপ্রাণের নিত্যযাত্রার একটা রূপ ধরা পড়ে। যোগী বলে, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যোগমগ্ন, পরমপুরুষের আবির্ভাবকে সে সমাসন্ন করিবে। বৈষ্ণবের নিকট পরমের অবতরণ-সাধনা অপর একটি রূপ গ্রহণ করে। বৈষ্ণব লীলাবাদী, সে কোথাও থামিয়া নাই, চলিতে চলিতে সে তাহার কৃষ্ণ-সন্ধান করে। পথও তাহার, পরমও তাঁহার। তাহার ভগবান্ দাঁড়াইয়া নাই ; তিনি বাঁশি বাজাইয়া আগাইয়া আসিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ অনুপম কাব্যশ্রীমণ্ডিত করিয়া তত্ত্বটি প্রকাশ করিয়াছেন :

"অপূর্ণ যখন চলেছে পূর্ণের দিকে
তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে
আনন্দের নব নব পর্য্যায়।
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে ;...
যে অভিসারিকা তারই জয়,
আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে।

ভুল বলা হোল বুঝি।
সেও তো নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ,
সে যে বাজায় বাঁশি, প্রতীক্ষার বাঁশি,
সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলেছে একই তালে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে
সমুদ্র দুলেছে আহ্বানের সুরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, কখনো ভগবান্ চুম্বক, ভক্ত ছুঁচ—ভগবান্ আকর্ষণ ক'রে ভক্তকে টেনে লন। আবার কখনো ভক্ত চুম্বক পাথর হন, ভগবান্ ছুঁচ হন, ভক্তের এত আকর্ষণ যে, তার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ভগবান্ তার কাছে গিয়ে পড়েন। অলক্ষিত কৃষ্ণের আকর্ষণে ধরা দিয়া পথ চলিবার ইতিহাসই অভিসার-পর্য্যায়।

গোবিন্দদাসের অভিসার-পদে অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত নানা অভিসারিকা-ভেদের চিত্র আছে (যেমন—দিবাভিসারিকা, তিমিরাভিসারিকা, গ্রীষ্মাভিসারিকা, জ্যোৎস্না-ভিসারিকা ইত্যাদি), কিন্তু ঐ বৈচিত্র্য-সৃষ্টিই তাঁহার কবিত্বশক্তির নিরিখ নহে। কবি সেগুলিকে কাব্য করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। এই পদগুলিতে দুইটি বস্তু প্রবল: চিত্রধর্ম্ম ও নাটকীয়তা। এক কথায় ইহাদের নাটকীয় চিত্র বলিতে পারি। তদুপরি গোবিন্দদাস-সিদ্ধ সঙ্গীত-হিল্লোল তো আছেই। অভিসারের পদে অধিক নাটকীয় অবসর সৃজনের মধ্যে কবির গভীর সঙ্গতিবোধের প্রমাণ আছে। অভিসারের সাধনা বাস্তবের সাধনা। তাহার যে কষ্ট তাহা মানস-সৃজিত নহে। তাহা অনেকাংশে লৌকিক কষ্ট। সুতরাং সেই কষ্টকে যখন কাব্যরূপ দান করিতে হইতেছে, তখন অধিক নাটকীয় না হইয়া উপায় নাই। এখন দু'একটি পদ গ্রহণ করা যাক। প্রথম কৃচ্ছ্রসাধনার চিত্র:

কণ্টকগাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি
গাগরি-বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।
মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি
দূতর পন্থ- গমন ধনী সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি।

রাধিকা প্রস্তুত হইতেছেন, তাহারই একটি অতিশয় বাস্তব চিত্র। ইহা অধ্যায়শ্রী, আসন্ন সাধনায় সিদ্ধিলাভের উপযোগী হইবার অভ্যাসযোগ, দেহে মনে সামর্থ্য-সংগ্রহের প্রস্তুতি-অধ্যায়। কেবল জল ঢালিয়া, কাঁটা মাড়াইয়া সাধনা নয়, যেখানে সর্ব্বাধিক ভীতি ও সর্ব্বাধিক প্রীতি, সেই উভয়কে জয় করিতে হইবে। তবেই না চরম আলিঙ্গন। অলঙ্কারের প্রতি নারীর স্বাভাবিক প্রীতি এবং সর্পের প্রতি সাধারণ ভীতি। অলঙ্কারের মূল্যে আশঙ্কা-নিরাকরণের প্রচেষ্টা:

করকঙ্কণপণ ফণীমুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু পাশে।

কিন্তু সর্প-সিদ্ধি কাজে আসে না; পথ চলিতে রাধা মন্ত্রে সরীসৃপকে বশীভূত করিবার কথা ভুলিয়া যান, তখন চক্র-দোলায়িত সর্পের সম্মুখে রাধিকার কিবা আচরণ? গোবিন্দদাসের মুখের কথা বহুপূর্ব্বে অনুমান করিয়া তদীয় গুরু বিদ্যাপতি লিখিয়া গিয়াছেন:

দেখি ভবনভিতি লিখল ভুজগপতি
জসু মনে পরম তরাসে।
সো সুবদনী করে ঝঁপইত ফনীমণি
বিহুসি আইলি তুঅ পাশে॥

রাধিকা তো প্রস্তুত—এই প্রস্তুতি কি যথেষ্ট? কত দূর-দুর্গম পথ, সিদ্ধি কত কঠিন, বিঘ্নবিপদ বাধাবন্ধ কত সুদুস্তর, কবি তাহা স্মরণ না করাইয়া পারেন না। কেবল কি সমাজ বা সংস্কারের বাধা, বিশ্বপ্রকৃতি যে বিরূপ। গোবিন্দদাস অভিসারিকা রাধিকার সম্মুখে পরিব্যাপ্ত বিশ্বপ্রকৃতির চিত্র আঁকিতেছেন; শব্দমন্ত্র, ধ্বনিগুণ, ভাবগৌরব মিলিয়া মিশিয়া সে বর্ণনাকে অনির্ব্বচনীয় স্তরে তুলিয়া দিয়াছে:

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তঁহি অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত॥

"দশদিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার॥

যাহার কান আছে সে এই সঙ্গীত শুনিবে, যাহার প্রাণ আছে সে সঙ্গীতাশ্রিত ভাবহিল্লোলে আপ্লুত হইবে। বৈষ্ণব কাব্যে—ধ্বনিমন্ত্র যেখানে সিদ্ধবস্তু—সেখানেও এমনটি সুলভ নয়। শুধু—জ্ঞানদাসের পদের একটি অংশে—তাহাও বর্ষার বর্ণনা—এই ধ্বনি ফুটিয়াছে। সেখানের বর্ষা এ বর্ষা নয়; সেখানে 'রিমিঝিমি বরষা'—"রিমিঝিমি শবদে বরিষে।" ঐ রিমিঝিমি পদটির মত শব্দচিত্র রবীন্দ্রযুগেও বোধ করি বিরল। বর্ষার অন্য যে রূপ—আকুল উত্তাল স্বরূপ—তদুচিত শব্দ চয়নে ও বয়নে এখানে গোবিন্দদাস পাঠকের মর্ম্মে একেবারে বিদ্ধ করিয়া দিতে পারিয়াছেন। আষাঢ়ের নববর্ষা নয়, শ্রাবণের যৌবনমত্ত দিনগুলি। চকিত আগমন নয়—ঝাঁপিয়া আসা। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিকে বেড়িয়া, ঢাকিয়া, বর্ষার মন্দ্রধ্বনি গুরু গুরু করিয়া উঠিতেছে। শুধু বারি নয়, বায়ুসনাথ আগমন। সমগ্র প্রকৃতি দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। ক্ষণেকের জন্য হয়ত শ্রাবণের দীর্ঘধারা ঝঞ্ঝার ঝাপটে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পুনরায় প্রবল বেগে নামিয়া আসিল। আর অমনি মত্ত-সাগরের উত্তাল তরঙ্গের মত তরঙ্গায়িত আবেগে ঐ ধারাবর্ষণ দুলিতে লাগিল—তাহারই একটি আশ্চর্য্য শব্দ-চিত্র :

তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল।

কেবল বাদর দোলে না, মনও দোলে—আশঙ্কায় দোলে আর আশায় ভোলে, আশ্বাসে কাঁপে আর নৈরাশ্যে ভাঙে :

সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার॥

আবৃত্তির সময় 'করবি অভিসারের' 'ক'-তে দীর্ঘ টান দিয়া 'রবিঅভিসার' একসঙ্গে পড়িয়া গেলে এই মানস দোলনটি শ্রুতিগোচর পর্য্যন্ত হয়। অতঃপর ঘনবর্ষণ বজ্রপাত—বিদ্যুৎচমক :

ঘনঘন ঝনঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত॥
দশদিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার॥

ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছে, আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুতের তরবারি ছুটাছুটি করিতেছে—পথে যে নামিয়াছে, হয়ত পথ হারাইয়া সর্ব্বনাশা

আকাশের পানে ক্ষণে ক্ষণে সে ভয়চকিত দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছে—এ সবই কয়েকটি মাত্র শব্দের মধ্যে এমনি অমোঘ উপায়ে কবি ধরিয়া দিয়াছেন যে, গোবিন্দদাসের পর কয়েকশত বৎসর কাটিয়া গেল—বাংলা কাব্যসাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি হইল—তথাপি পদটি নিজক্ষেত্রে অনতিক্রান্ত রহিয়া গিয়াছে।

তাহা হইলে বিশ্বপ্রকৃতি কি শ্রীমতীর পথ-বন্ধক হইবে? যত দুর্যোগ হোক, প্রেম অল্প বেগময় নয়; আমরা স্মরণ করিতে পারি শ্রীরাধিকার সুদৃঢ় আত্মঘোষণা:

কুলবতী কঠিন কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠক বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু-সঞে পঙারলুঁ
তাহে কি তটিনী অগাধা॥

আজি আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে রাধিকার যে মনের অবস্থা, আমরা জানি আষাঢ়স্য প্রশম দিবসেও তাহা পরিবর্তিত হইবে না:

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমির ন হেরি নিজ দেহ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছলল মনহি মনোভব সিন্ধু॥

কেবল বর্ষা, কেবল রাত্রি? অভিসারের জন্য গ্রীষ্ম নয় কেন,—কেন দিবস বাদ থাকে? রাধিকার সাধনা কি দিনক্ষণ দেখিয়া ঘটিবে, সুযোগ বুঝিয়া সুরু হইবে, সম্ভাবনা বিচার করিয়া যাত্রা করিবে, না, শ্মশানের মধ্যেও সে বাসর জাগে, বিরূপের রূপ দেখিয়া আত্মহারা হয়, ভয়ঙ্কর কৃষ্ণকে অভয়ঙ্কর শ্যামরূপে বরণ করে। সে যে কি করে আমরা জানি না, বোধহয় সে লীলার অতন্দ্র দ্রষ্টা আমাদের কবি জানিলেও জানিতে পারেন:

মাথহি তপন- তপত পথ-বালুক
আতপ দহন বিথার।
ননীক পুতলি তনু চরণকমল জনু
দিনহি কয়ল অভিসার॥
হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার।
কানু-পরশ-রসে অবশ রসবতী
বিছুরল সবহুঁ বিচার॥

ভীতক চিত ভুজগ হেরি যো ধনী
চমকি চমকি ঘন কাঁপ।
অব আঁধিয়ারে আপন তনু ঝাঁপই
কর দেই ফণীমণি ঝাঁপ ॥

সুন্দরী হরি অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে গোরী ভেল শ্যামরী
কুহু যামিনী ভয় ভাগি ॥
নীল অলকাকুল অলিক হিলোলিত
নীল তিমিরে চলু গোই।
নীল নলিনী জনু শ্যামরস-সায়রে
লখই ন পারই কোই ॥

অতএব দেখিতেছি রাধিকা পথে বাহির হইয়াছিলেন এবং বিঘ্নজয়ী তাঁহার তপস্যা পথান্তে যে শ্যামমোহন হাসিতেছেন, তাঁহার চরণতলে সমাপ্ত হইয়াছিলও। উপনীত-সিদ্ধি রাধিকা নিজ পথাতিক্রমণ বর্ণনা করিতেছেন—রসোদ্‌গারের মত ইহাকে অভিসারোদ্‌গার বলিতে পারি। ভাবগৌরব, শব্দচিত্র, নাটকীয় গতিবেগ এবং উর্দ্ধতর অনুভূতির আলোকে মেশামেশি হইয়া পদটি "আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা" :

মাধব কি কহব দৈব-বিপাক।
পথ-আগমন কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ ॥
মন্দির তেজি যব চারি পদ আয়লুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির-দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে
পদযুগে বেড়ল ভুজঙ্গ ॥

লক্ষ মুখেও যে পথাতিহাস বিবৃত করা সম্ভব নয়, একমুখে শ্রীরাধিকা তাহার যতটুকু পারেন করিতেছেন ; মন্দির হইতে বাহির হওয়া প্রথমত কত কঠিন—মন্দির দ্বারের কঠিন কপাট ; মন্দিরের কপাট শুধু নয়, কুলমরিযাদ এবং নিজ মরিযাদের কপাট ; যদি দ্বার খুলিয়া পথে নামিলেন, বাহিরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, পথ দেখাইবার কেহ নাই, কাহাকে ডাকিতেও পারেন না—সব ভাসাইয়া যে রাধারাণী

চলিতেছেন। পথ কেবল তিমির-গহন নয়, তাহা বিষাক্ত সর্পাকুল—'পদযুগে বেড়ল ভুজঙ্গ'; অতঃপর :

একে কুল-কামিনী তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝরঝর
হাম যাওব কোন পুর॥

অন্ধকার নিশির বিপদও যথেষ্ট হইল না, প্রবল বর্ষা নামিল। রাধার ধৈর্য্যবাঁধ টুটিয়া যায়, কোথায় তাঁহার দয়িত? না, তিনি রাধিকা—চির আরাধিকা; কৃষ্ণকে তিনি পান না, অর্জ্জন করেন :

একে পদপঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জরজর ভেল।
তুয়া দরশন-আশে কছু নাহি জানলুঁ
চিরদুখ অব দূরে গেল।
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহসুখ আশ।
পন্থক-দুখ তৃণহুঁ করি না গণলুঁ
কহতহি গোবিন্দদাস॥

গোবিন্দদাস 'কহিয়াছেন' বটে; এমন করিয়া অভিসারিকার পথ চলা—এত অল্পে, এমন অব্যর্থভাবে—আর কেহ ফুটাইতে পারেন নাই। পথ চলাটুকু যেন স্বচক্ষে চাহিয়া দেখিলাম। "একে পদপঙ্কজ…"—কী বেদনা—অপরিসীম যন্ত্রণা, অথচ কিবা আনন্দ! "তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল…"—কত যুগের কত অবারণ পথগতির স্মৃতিতে মন পর্য্যাকুল হইয়া ওঠে; প্রেমের জন্য,—সে প্রেমের অশেষ বৈচিত্র্য,—কত মানুষ ঘর ছাড়িয়াছে, ঘরকে বাহির আর বাহিরকে ঘর করিয়া তুলিয়াছে; দয়িতের জন্য প্রেম, দেশের জন্য প্রেম, আদর্শের জন্য প্রেম, ধর্ম্মের জন্য প্রেম—যখনই মুরলীধ্বনি বাজিয়া ওঠে, ক্ষুরধারের ন্যায় নিশিত ও দুর্গম পথে লোকাভাব হয় না :

"তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে,…

তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন,...
তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে।"

লক্ষ লক্ষ গানের একটি গান গোবিন্দদাসের এ একটি শ্রেষ্ঠ গান।

গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠ রসপর্য্যায়গুলি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য বলিয়াছি। গোবিন্দদাসের প্রতিভার দুইটি দিক আছে—একটি তাহার চলতা; দুই, তাহার আকার-সৌষ্ঠব ও ক্ল্যাসিক্যাল গাম্ভীর্য্য। রাস অভিসার প্রভৃতি পর্য্যায়ের মধ্যে গোবিন্দদাসের প্রতিভার চলিষ্ণুতা কাব্যরূপ ধারণ করিয়াছে। ঐ সকল অংশ অবশ্য দেহসৌষ্ঠবের দিক হইতে ন্যূন নহে, বাঙ্‌নির্ম্মিতিতে ত্রুটি আবিষ্কার করা দুরূহ। তথাপি সমগ্র মিলিয়া একটা গতিবেগ অনুভব করা যায়। আর রূপানুরাগ প্রভৃতি স্থানে গোবিন্দদাসের স্থির-গম্ভীর রূপনির্ম্মাণ দক্ষতা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সেখানে কবি একের পর এক শব্দ গাঁথিয়া তাঁহার কাব্য-মন্দির গড়িয়া তুলিয়াছেন। গোবিন্দদাসের অলঙ্কার-প্রাণতা এই কবি-স্থাপত্যের পক্ষে বড়ই উপযোগী হইয়াছে। অলঙ্কারের ঠাসবুনানিতে বহু পদে শিথিলতার অবসরমাত্র নাই। তথাপি একথা স্বীকার্য্য, নিছক অলঙ্কার-কৌশলের উপরে গোবিন্দদাসের প্রতিভার ঐকান্তিক নির্ভরতা নাই। ইতিপূর্ব্বে যে সকল পদ বা পদাংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, সেগুলির মধ্যে অলঙ্কার-চাতুর্য্য খুব বড় আসন গ্রহণ করে নাই; অলঙ্কার যদি থাকেই, তবে তাহারা অনিবার্য্য যোগ্যতায় স্থান লইয়াছে। কতকগুলি তো প্রায় অনলঙ্কৃত ("রূপে ভরল দিঠি"; "মাধব কি কহব দৈব বিপাক"; "শরদ-চন্দ পবন মন্দ"; "মন্দির-বাহির কঠিন কপাট")। ঐ সকল পদে "পদপঙ্কজের" মত সামান্য অর্থালঙ্কার, কি অন্যত্র শব্দালঙ্কার যাহা কিছু আছে, সেগুলিকে অলঙ্কার বলিয়া বোধ হয় না, কবিতার সাধারণ ভাষাই তো ঐ। বিদ্যাপতির "সরসিজ বিনু সর সর বিনু সরসিজ" কিংবা "অঙ্কুর তপন-তাপে যদি জারব" ইত্যাদির মত গোবিন্দদাসের ঐ সব পদ নিছক অলঙ্কার-নির্ভর বা অলঙ্কার-প্রাণ নয়। সাধারণভাবে অলঙ্কৃত বাক্যখণ্ডের

মধ্যে গোবিন্দদাস কিভাবে চাতুর্য্য ও মাধুর্য্যের যুগপৎ সংমিশ্রণ ঘটাইতে পারেন, নিম্নের পদে তাহার একটি দৃষ্টান্ত মিলিবে :

আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে
যব হরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটি কুসুম-শরে জরজর
রহত কি যাত পরাণ ॥
সজনি জানলু বিহি মোহে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম ॥
সুনয়নী কহত কানু ঘনশ্যামর
মোহে বিজুরী সম লাগি।
রসবতী তাক পরশ-রসে ভাসত
হামারি হৃদয়ে জলু আগি ॥

অলঙ্কার অনেক ক্ষেত্রে কাব্যের সম্পদ; বিপদও ঘটায় না তাহা নয়। বিরহ পর্য্যায়ে অতিরিক্ত অলঙ্কৃতি গোবিন্দদাসের কাব্যকে নষ্ট করিয়াছে। গভীরতম বেদনার বাণী সহজ সরল, তাহা প্রায়ই অর্দ্ধমূর্চ্ছিত গদগদভাষ। কিন্তু গোবিন্দদাস বিরহবেদনা প্রকাশ করিতে রাধিকার মুখে যখন চরম অলঙ্কৃত বাণী স্থাপন করেন, তখন তাহাতে হয়ত কবি-চাতুর্য্য প্রকাশ পায় কিন্তু তাহা কাব্য হয় না। আসলে গোবিন্দদাস বেদনার কবি নহেন, আরাধনার কবি। যেখানে আরাধনা মুখ্য, সেখানে গোবিন্দদাস অনতিক্রম্য। গোবিন্দদাস ভক্ত বৈষ্ণব কবি। রাধাভাব তাঁহার সাধনা নহে; সুতরাং রাধার বেদনাদর্শনও তাঁহার পক্ষে শক্ত হইয়াছে। তিনি রাধার বেদনা দর্শন করিতে পারেন নাই, কিন্তু বৃন্দাবনের বেদনা অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছেন - ঐ বৃন্দাবনের পথে একজনা লীলামুগ্ধ পথিক তিনি। কৃষ্ণ-বিরহিত বৃন্দাবনের চিত্র তাঁহার কাব্যে তাই অপরূপ রসরূপ ধারণ করিয়াছে। এখানে গোবিন্দদাসের কবি-স্বভাবের বিশেষ সুযোগ—ছবির মারফৎ পটভূমিকা রচনার অবসর :

মাধব তুহুঁ সে রহলি ব্রজপুর।
ব্রজকুল আকুল দুকূল কলরব
কানু কানু করি ঝুর ॥

যশোমতী নন্দ অন্ধসম বৈঠত
সাহসে উঠই ন পার।
সখাগণে ধেনু বেণু সব বিছুরল
বিছুরল যমুনা-কিনার॥
সারি শুক মূক কপোত না ফুকরত
কোকিল না পঞ্চম গান।
কুসুম তেজি অলি ভূমিতলে লুণ্ঠই
তরুগণ মলিন সমান॥

নাথ-হারা বৃন্দাবনের মলিন বিপর্যস্ত মূর্ত্তির অঙ্গস্বরূপ হইয়া শ্রীরাধিকা বিরাজ করিতেছেন—তাঁহার সম্বন্ধে একটি পঙ্ক্তিই যথেষ্ট ঃ

বিরহিনী রাই বিরহ জ্বরে জারল।

উপরোক্ত কৃষ্ণ-হারা বৃন্দাবনের চিত্রাঙ্কনে কবির কৃতিত্ব আছে। কিন্তু যেখানে রাধার বেদনার কথা আসে, সেখানে কবি অসমর্থ। সে বিষয়ে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব। চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস রাধার বেদনাকে আত্মস্থ করিয়া আপনার ব্যথিত স্পন্দিত হৃৎপিণ্ডকে খুলিয়া ধরিয়াছেন—রাধার বেদনা কবির বেদনা হইয়া কাব্যরূপ ধারণ করিয়াছে ঃ

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলেতো ভাল॥ (চণ্ডীদাস)

বিদ্যাপতিও রাধার বেদনাকে প্রকাশ করিয়াছেন, তবে রাধার বেদনা তাঁহার আত্মবেদনা হইয়া ওঠে নাই, সৃষ্টির সহিত ব্যক্তিগত হৃদয়ানুভূতির একটা পার্থক্য রক্ষিত ছিলই। তথাপি দৃষ্টির গভীরতা, অসামান্য অনুভবশালিতা, সর্ব্বোপরি বিরল কবি-প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করিয়া বিদ্যাপতির কয়েকটি বিরহ পদ ("সজনি কো কহ আওব মধাঈ" ; "এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর" ; ইত্যাদি) উৎকর্ষের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে।

গোবিন্দদাসের কবিপ্রতিভার মূল সুরকে নানাভাবে নানাদিক হইতে ছুঁইতে চেষ্টা করিয়াছি! তাহাতে গোবিন্দদাসের প্রতিভার প্রতিষ্ঠা নূতন করিয়া সম্ভব

হোক বা না হোক, গোবিন্দদাস-সম্পর্কে আমার মনোভাব অন্ততঃ অগোচর নাই। গোবিন্দদাস যে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি, তাহাও প্রমাণের প্রয়াস পাইয়াছি। সেই সঙ্গে স্মরণ করি গোবিন্দদাসকে একজন খাঁটি বাঙালী কবি হিসাবে। কাব্যে বাঙালীত্বের দ্বিবিধ প্রকাশ—এক, ঘরোয়া মৃদুকরুণ আবেষ্টনী-সৃজনে, দুই, সঙ্গীত-সৌন্দর্য্যে। প্রথমক্ষেত্রে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস শ্রেষ্ঠ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গোবিন্দদাস। প্রথমটি বেদনার ক্ষেত্রে, দ্বিতীয়টি আরাধনার। বলিয়াছি তো, গোবিন্দদাস আরাধনার কবি। দেবতার মন্দিরে বসিয়া তিনি গান গাহিতেছেন। সেখানে ঘরোয়া আবেষ্টনী সৃজনের অবকাশ নাই। সামনে শ্যামসুন্দর বঙ্কিম ভঙ্গিতে হাসিতেছেন; তাঁহার বামে আত্মসমর্পণের দেহচ্ছন্দে রাধারাণী হেলিয়া। রাধা ও কৃষ্ণ—শ্যাম ও শ্রীমতী—যুগ যুগ ধরিয়া কত অশ্রু আর হাসি, কত উল্লাস আর আনন্দ ঐ চারি রাঙাপায়ে আছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই হাসি আর অশ্রুর মিলিত ধারায় গোবিন্দদাসও আপন অনুরাগতপ্ত দেহমন মিশাইয়া দিলেন। মিশাইলেন বটে, তবু সবটুকু মিশিল না, দুইটি অতৃপ্ত নয়ন আয়ত হইয়া চিরদিনের মত ঐ মদনমোহন মূরতির পানে বিস্ফারিত হইয়া রহিল; আর কণ্ঠ জাগিয়া রহিল। রূপ আর সুরের বন্যা নাচিয়া নাচিয়া উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। গোবিন্দদাস জানিতেন—"আমার সুরগুলি পায় চরণ তোমার আমি পাইনা তোমারে।" গোবিন্দদাস কবিরাজ ভক্ত কবি, বৈষ্ণব কবি।

বলরামদাস

৬

বলরামদাসের কবি-বৈশিষ্ট্য একটিমাত্র লক্ষণের মধ্যে প্রকাশ করা যায়—তিনি বাৎসল্য রসের কবি। তার অর্থ নয় যে, তিনিই বাৎসল্য রসের শ্রেষ্ঠ কবি। বৈষ্ণব বাৎসল্য রসের পদে অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব কাহারো নাই। বাৎসল্যের পদবিচারে বলরামদাসের ভূমিকা আমাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করে, এই পর্য্যন্ত।

তবে কি বলরামদাস নিতান্ত মধ্যম শ্রেণীর কবি? সেরূপ হইলে তিনি আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হইতেন না। বলরামদাসের জন্য প্রথম শ্রেণীর দাবী যেমন বাড়াবাড়ি ঠেকিবে, তেমনি একেবারে মধ্যম শ্রেণীর বলিলে উন্নাসিকতার অপবাদ বর্ত্তিবে। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অংশে বলরামের স্থান। কাব্যের কি উচ্চ-মধ্যবিত্ত কোন শ্রেণী নাই?

বলরামের পদগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিব, পদপর্য্যায় সম্বন্ধে কবি প্রায় সমদৃষ্টি—সকল বিষয়েই কিছু না কিছু পদ লিখিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে ঈষৎ ছেদ সত্ত্বেও (যাহা পদলুপ্তির জন্য ঘটিতে পারে) পদগুলির মধ্যে ঘটনাগত ধারাবাহিকতা আছে। আরো দেখি, সকল শ্রেণীর পদেই একটা মোটামুটি কবিত্ব বজায় আছে, অথচ কবি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমুচ্চ মার্গে উঠিতে পারেন নাই। মনে হয়, অতি উচ্চ-স্তরের কবি নন বলিয়া কাব্যসৃষ্টির জন্য তাঁহাকে সুদুর্লভ কবি-প্রেরণার মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতে হইত না। এবং কবি সম্ভবতঃ নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া প্রধান প্রধান রসপর্য্যায়ে অধিক পদ লিখিবার বাসনা দমন করিয়াছেন। কবির আত্মসচেতনতা আমরা ক্রমে লক্ষ্য করিব।

এই সচেতনতার একটি প্রমাণ অন্ততঃ এখনি দেওয়া চলে। কবি হৃদয়াবেগের স্বর্ণমুহূর্ত্ত-সৃষ্টি অপেক্ষা বর্ণনার দিবালোককেই অধিক বিশ্বাস করিয়াছেন। এই বর্ণনারস বলরামের কাব্যে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। সংযত গম্ভীর ও অনুচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে তিনি বর্ণনা করিয়া যান, সর্ব্বক্ষেত্রে সে বর্ণনা চিত্র অথবা ভাবরসে পৌঁছয় এমন নয়, তথাপি তাহা বহুক্ষেত্রে ব্যর্থ আলঙ্কারিক চতুরালি অপেক্ষা পাঠকচিত্তকে অধিক আকর্ষণ করে। বলরাম স্বীয় শক্তির সীমাবদ্ধতা জানিতেন ও মানিতেন।

যে লক্ষণগুলির কথা বলিলাম—কবির বাৎসল্য-প্রীতি, আত্মসচেতনতা, বর্ণনা ক্ষমতা—এগুলির একটু বিস্তৃত আলোচনা করিলে বলরামের কাব্যের সকল প্রকার

বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটিত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। বলরাম অধিকন্তু রসোদ্‌গারের বিশিষ্ট কবি। কবির রসোদ্‌গার-ক্ষমতার কারণ উপরোক্ত লক্ষণগুলির মধ্যেই খুঁজিয়া পাইতে পারিব মনে করি।

বাৎসল্যরস বৈষ্ণব পঞ্চ রসের অন্তর্গত অর্থাৎ সাধ্য বস্তু। সর্ব্বোত্তম মধুর-রসের নিম্নেই বাৎসল্যের স্থান। বৈষ্ণব কাব্য মুখ্যত মধুররসের কাব্য। সেই মধুররসের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে বাৎসল্য ও সখ্যরতি। শান্ত ও দাস্যকে কাব্য হইতে বৈষ্ণব কবিরা বাদ দিয়াছেন। এমনকি সখ্য বা বাৎসল্যরসও বৈষ্ণব সাহিত্যে যথোপযুক্ত মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নয়। বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সাধকের নিকট ননীচোরা বালগোপাল রূপে আবির্ভূত হইতে পারেন, কবিদের নিকট কিন্তু তাঁহার চিরকিশোর চিরযৌবন মূর্ত্তি—রসিকশেখর রাধারমণ তিনি। বিষয়-বৈচিত্র্যের জন্যই যেন বাৎসল্য বা সখ্যরসের (সখ্য আবার বাৎসল্যের সহিত মিশিয়া আছে) অবলম্বন।

সাধনা-ব্যাপারে গোপালভাব যথেষ্ট আদৃত হইয়াও কাব্যের দিকে অবহেলিত হইল কেন, সে প্রশ্ন জাগিবে। অবশ্য মধুররসই চিরকাল সকল সাহিত্যের প্রাণরসস্বরূপ। কিন্তু আপেক্ষিক বিচারেও বৈষ্ণব বাৎসল্যের পদ সেরূপ উৎকর্ষ লাভ করে নাই। তাহার একটি কারণ মনে হয়, বৈষ্ণব বাৎসল্যরসে মাতৃহৃদয়ের সত্যকার বেদনাবোধের স্থান সঙ্কুচিত। "স্নেহ পাপ আশঙ্কা করে", মাতা সকল সময় সন্তানের অশুভ-ভীতিতে অস্থির, অতএব কৃষ্ণের জন্য যশোদার যন্ত্রণা। পুত্রকে গোষ্ঠে যাইতে দিতে কিছুতে প্রাণ চায় না; কত কাতরতা, কত উদ্বেগ। পুত্র দোষ করিয়াছে, শাস্তি দিতে হয়, অথচ কাঁদে কে বেশী—পুত্র না মাতা, বলা শক্ত। মাঝে মাঝে মনে হয়, এ বেদনা অতিরঞ্জিত, গোষ্ঠ-গমনে এহেন আশঙ্কা গোপপরিবারে অস্বাভাবিক, কিন্তু অনতি-বিলম্বে পাঠকচিত্ত সঙ্গতি খুঁজিয়া পায়—প্রতীক বাৎসল্যে অতিরঞ্জন থাকিবেই; অথবা উহা অতিরঞ্জনও নয়, মানবী মাতার বুকেই যেখানে পুত্রের জন্য পৃথিবীর যত ভীতি জমাট বাঁধিয়া থাকে, সেখানে নিত্য বৃন্দাবনে নিত্য মাতার শিহরণ নিশ্চয় সীমা মানিবে না। তবু এই বেদনাবোধ মাতৃহৃদয়কে যে পরিমাণে চিনাইয়া দেয়, ঠিক সেই পরিমাণে কি পাঠককে বিচলিত করে? মাতার ক্ষেত্রে যে বেদনা সত্য, পাঠককে সেই বেদনার অংশ দিতে হইলে ঐ বেদনাবোধের কারণটিকে আরও বাস্তব করিয়া তুলিতে হইবে, পুত্রের যথার্থ বিপদের হেতু জানাইতে হইবে। সত্যকার বিপদ শিশু কৃষ্ণের জীবনে বহুবার ঘটিয়াছিল এবং সেই বিপদের বর্ণনা যে-কাব্যে রহিয়াছে, সেখানে মাতার ব্যথিত ব্যাকুল মূর্ত্তিটি আমাদের অন্তরে কাটিয়া বসে। আমি শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বলিতেছি। বাংলার বৈষ্ণব কবিদের পক্ষে কিন্তু ঐ সকল ঘটনার

পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা শক্ত। ঐখানে কেবল কৃষ্ণের বিপদ নয়, সম্পদও আছে—অলৌকিক ঐশ্বরিক শক্তির ঐশ্বর্য্যে কৃষ্ণ বিপদ অতিক্রম করিয়াছেন। বারবার কৃষ্ণের সত্য পরিচয় বুঝিয়াও যশোদাকে ভুলিতে হইয়াছে, মায়া সত্যকে ঢাকিয়া মর্য্যাদা দিয়াছে। নচেৎ কাব্য হয় না। কৃষ্ণের সেই ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ বাংলার বৈষ্ণব কবির নিকট গ্রাহ্য নয়। সুতরাং বিপদ কাহিনীগুলিরও ব্যবহার চলে না। বৈষ্ণব কবিকে একটি যন্ত্রণার কথাই কেবল ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতে হইয়াছে—কৃষ্ণ যে গোষ্ঠে যায়, যশোদা যে কাঁদে।

এতৎসত্ত্বেও একটি ঘটনাকে ঐশ্বর্য্যবিমুখ বাঙালী বৈষ্ণব কবিগণ অস্বীকার করিতে পারেন নাই—কালীয়দমনের ঘটনা। এ ক্ষেত্রে যশোদার নিষ্ঠুর মর্ম্মপীড়ন, বাঁধভাঙা ব্যাকুলতা চিত্রণের পূর্ণ সুযোগ। কৃষ্ণের অন্য বিপদগুলি অতর্কিতে আসিয়াছে এবং বিপদ কাটিবার পরেই সব শুনিয়া স্নেহোচ্ছলা জননী নিবিড় মমতায় পুত্রের মুখচুম্বন করিয়াছেন। কালীয়দমনের ক্ষেত্রে সংবাদ পূর্ব্বেই পাওয়া গেল, কৃষ্ণ বিষদহে নিমজ্জিত, দর্শন মিলিতেছে না। তাই যশোদা বিশ্ব ভুলিয়া ছুটিয়া আসেন, কূলে দাঁড়াইয়া বুক চাপড়াইয়া বারে বারে ঝাঁপ নিতে যান—পুত্রহারা জননীর হৃদয়চ্ছিন্ন মূর্ত্তিটি আঁকিবার বড় সুযোগ। এই সুযোগ যে, পদকারগণ প্রাণভরিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, মনে হয় না। কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্তভাব। বাল্যলীলার ক্ষেত্রে ঐশ্বর্য্য-ভাব সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতে না পারিলেও লীলাবিষয়ের নির্ব্বাচন-পদ্ধতিতে বর্জ্জনের একটী রীতিমত চেষ্টা দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য, মৃত্তিকাভক্ষণ, ননীচুরি, চাঁদধরা এবং গোচারণ—এই সকল নিরীহ বিষয়েই অধিক মনোযোগ।—

নাচত মোহন নন্দদুলাল।
রঙ্গিম চরণে মঞ্জীর ঘন বাজত
কিঙ্কিণী তাহি রসাল॥

* * *

মায়ে দেখি মাটি ফেলে না খাই না খাই বলে
আধ আধ বদন ঢুলায়।

* * *

চাঁদ মোর চাঁদের লাগিয়া কান্দে।

—ইহারই রসে বৈষ্ণব কবি বিভোর। পসারিণী ফল বিক্রয় করিতে আসিয়াছে; পৌরাণিক কাহিনীতে পাই, শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া সে ফলগুলি তাহার হাতে

তুলিয়া দিল। আরো পাই, পরিবর্ত্তে কানু মুঠিভরা তণ্ডুল আনিয়াছে; বালহস্তের গলিত মুষ্টি হইতে ছিন্ন অঞ্চলে স্খলিত প্রত্যেকটি তণ্ডুলকণা স্বর্ণকণায় রূপান্তরিত। বৈষ্ণব কবি কাহিনীর ঐ শেষাংশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন মানেন নাই—তাহার পূর্ব্বেই পসারিণী শিশুমুখের জ্যোৎস্নায় আত্মহারা—উহাই যথেষ্ট। তবে মৃত্তিকাভক্ষণই হউক, আর ননীচুরিই হউক, কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের প্রতীতি মনে না থাকিলে যে, এই সকল লীলার পূর্ণরস আস্বাদন সম্ভব নয়—অন্ততঃ সাধারণ পাঠকের পক্ষে—তাহাও সত্য। বাংলার বৈষ্ণব কবিগণও এমনকি ঐ ঐশ্বর্য্যপ্রচ্ছায় পুরোপুরি এড়াইতে পারেন নাই।

তাই বৈষ্ণব বাৎসল্যরস নিছক লীলারস; পূর্ণ আনন্দের রসপান। ইহাতে বিচ্ছেদ নাই, যন্ত্রণা নাই। গোষ্ঠগমনাদিতে যেটুকু যাতনা, তাহা কেবল মাতৃহৃদয়ের এবং মায়ের প্রাণ ঐরূপ বোধ করিবেই। কাব্যের তরফে ইহাতে গভীরতার অভাব ঘটে। যথার্থ মর্ম্মপীড়নের অবকাশ বাল্যলীলায় মাত্র দুইক্ষেত্রে। একটির উল্লেখ করিয়াছি—কালীয়দমন। অন্যটি, যখন কৃষ্ণ বৃন্দাবনের স্বপ্ন ভাঙিয়া মথুরায় প্রস্থান করিলেন, সেই মাথুর। সেখানেও যশোদা অনুপস্থিত। বাৎসল্য তো বৈষ্ণব মতে চরম রস নয়, তাই তখন কৃষ্ণের রথচক্র ব্রজগোপীদের বুকের উপর দিয়া চলিয়া যায়, রাধিকার রক্তসিক্ত হৃদয় সেই পথে লুটাইয়া লুটাইয়া চলে। তখন মধুর মধুর প্রেমরস। রবীন্দ্রনাথ যেমন একস্থলে অন্ততঃ বলিয়াছেন—কম্পমান দীপশিখাটি কেমন :

"সেই আলোটি নিমেষহত
প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের
ভয়ের মতো দোলে।"

বৈষ্ণব কবির পক্ষে ঐ প্রকার প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়া ও মায়ের প্রাণের ভয়কে এক করিয়া দেখা কোন ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় নাই।

শাক্তগীতিকার সঙ্গে বৈষ্ণব বাৎসল্যপদের তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। সমগ্রতঃ শাক্তগীতিকা কাব্যাংশে বৈষ্ণবপদাবলীর সহিত কোনমতে তুলনীয় নয়। শাক্তগীতিকা স্বরূপতঃ সাধনসঙ্গীত। বৈষ্ণব পদাবলী সাধনসঙ্গীত হইয়াও মানবজীবনগীতি। কেবল এই একটি ক্ষেত্রে—এই বাৎসল্যরসের ব্যাপারে—শাক্তগীতিকাকে আমরা উচ্চে স্থাপন করিতে পারি। তাহার কারণ অবশ্য এই যে, মাতৃভাব এবং অঙ্গাঙ্গি বাৎসল্য-ভাব শাক্তপদের মুখ্য আশ্রয়, কিন্তু বৈষ্ণবপদের নয়। শাক্তগীতে কবি হয় পিতা, নয় পুত্র, গৌরী হয় কন্যা, নয় মাতা। যখন আগমনী বিজয়ার গান হয়, তখন গিরিরাজ ও

মেনকার মধ্যে স্বয়ং কবি "বাসা বাঁধেন; যখন তাহা মাতৃতত্ত্বের সঙ্গীত হয়, তখন বিশ্বমাতাকে ঘরের মা করিয়া কবি "মান-অভিমান, আদর-আবদারে বসেন। এই অনুভূতির নিবিড়তা বৈষ্ণব পদে নাই। আবার বৈষ্ণব বাৎসল্যরস যেখানে ব্যক্তি-জীবনের সাধনার ধন, সেখানে সমগ্র জাতীয়' জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা শাক্তগীতিকায় প্রস্ফুটিত। শরতে মা যখন আসেন, তখন সব বাঙালীর ঘরে স্বর্ণদীপ জ্বলে, যখন বিদায় নেন, সে দীপ নিভিয়া আঁধার নামে ঘরে ঘরে। তাই কবিরা যদি অশক্তও হন, আগমনী-বিজয়ার গানে বাঙালীর উদ্‌গ্রীব প্রাণ উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ তুলিয়া কবির পাশে হাজির হয়। আরো আছে। শক্তি-সঙ্গীতের মর্ম্মজ্বালার বাস্তবতা। ঐ মেনকা আর কেউ নন, বাঙালী মাতা, ঐ গিরিরাজ বাঙালী পিতা—বৃদ্ধ উদাসীন নেশাসক্ত শ্মশানচারীর হস্তে মাতা নিজ অঙ্ক, পিতা নিজ বক্ষ হইতে ছিন্ন করিয়া অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাটিকে গৌরীদান করিয়াছে, সে কন্যা-জামাতার উপর তত্ত্ব চাপাইয়া কতখানি ভুলিয়া থাকিতে পারি,—শরৎকাল হইতে না হইতে মাতৃহৃদয়ের আনন্দাশ্রু আগমনীর আলোয় টলটল করে, তিনদিন যাইতে না যাইতে বিজয়ার বৈতরণী কূলে ঝরিয়া পড়ে,—এ কি বিশ্বতত্ত্ব, না গৃহতত্ত্ব!

শক্তিসঙ্গীতের দুঃখবোধ তাই মাতৃপ্রাণের স্নেহসৃষ্ট আতুরতা মাত্র নহে। উহা নাড়ী-ছেঁড়া ধনের জন্য নাড়ী-ছেঁড়া গান। বৈষ্ণব বাৎসল্য রসের পদে এই গভীরতার সন্ধান নাই। বাঙালী মেয়ে তো গোষ্ঠে যায় না, সে স্বামীর সঙ্গে শ্মশানে যায়।

সীমাবদ্ধতা স্বীকার করিয়া আমরা যখন বৈষ্ণব বাৎসল্যপদের আলোচনায় নামিব, দেখিব, উহারই ভিতর কবিগণ যথার্থ কাব্যসৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আলোচনার প্রারম্ভে এই বাৎসল্য-ব্যাপারে আমরা বলরামদাসের জন্য একটি বিশেষ স্থান দাবী করিয়াছি। রায়শেখর, বংশীবদনাদি কয়েকজন উত্তম পদ রচনা করিলেও বলরামকেই আমরা এই পর্য্যায়ে সর্ব্বাধিক মানসিক-প্রস্তুতিযুক্ত কবি বিবেচনা করি। বলরামের কাব্যের মধ্যে সর্ব্বত্র একটা বয়স্থ মন খুঁজিয়া পাওয়া যায়। প্রৌঢ় কবিমন বলিতে যে উচ্চশ্রেণীর মানসিকতা বোঝায়, তাহা নয়, বলরাম বয়োসুলভ প্রবীণতা অনেকাংশে কবিধর্ম্মের উপর চাপাইয়াছেন। এই মানসিক প্রৌঢ়ত্ব বাৎসল্য-রসের পদসৃষ্টির পক্ষে বড়ই উপযোগী। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাকে কেবল যশোদার স্নেহে দর্শন নয়,—ঐ স্নেহকে যথোপযুক্তভাবে দেখাইবার স্নেহদৃষ্টি কবিরও থাকা চাই। বলরামের তাহা আছে। এবং শুধু যশোদা বা কবি নন। বলরামের কাব্যে শ্রীদাম সুদাম পর্য্যন্ত নিজ নিজ সখ্যভাব ঘুচাইয়া স্নেহ-বাৎসল্যের চক্ষে কৃষ্ণকে দেখিয়াছে। স্নেহের এই ত্রিবেণী-মধ্যে কৃষ্ণকে স্থাপন করিয়া তবে কবির শান্তি।

বলরামের বাৎসল্যপদে কাহিনীর একটা ক্রমপরম্পরা খুঁজিয়া পাই, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কৃষ্ণের গোষ্ঠগমনের উদ্যোগ, যাত্রার পূর্ব্বে যশোদার বিবিধ সাবধানবাণী, শ্রীদামের সান্ত্বনা ও যশোদার সান্ত্বনাহীন আশঙ্কা, মানত, দেবতার নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা, ও ভীতি-প্রাবল্যে মূর্চ্ছা, এবং মূর্চ্ছাভঙ্গে কৃষ্ণের শুভাশুভের ভারগ্রহণের জন্য বলরামের প্রতি অনুনয়,—এই সকল ক্রমিক চিত্র মিলিতেছে। এগুলি পূর্ব্ব-গোষ্ঠভুক্ত। অতঃপর গোষ্ঠগত ক্রীড়াক্লান্ত রাখালদের প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ, মাতাকে স্মরণ ও তাঁহার উৎকণ্ঠার কথা ভাবিয়া উদ্বেগ, রাখাল-দলসহ প্রত্যাবর্ত্তন, কৃষ্ণকে পাইয়া শঙ্কাপীড়িত যশোদার স্বস্তিলাভ, গোষ্ঠলীলা সম্বন্ধে বলরামের স্নেহস্নিগ্ধ বিবৃতি এবং সকলকে একত্র লইয়া যশোদার উল্লাস ও ভোজনের ব্যবস্থা—এই সবগুলি বলরামদাস-অঙ্কিত উত্তরগোষ্ঠের চিত্র। ইহার মধ্যে বাৎসল্যের দুইটি রূপ পাই—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। যশোদা যখন কৃষ্ণের জন্য উৎকণ্ঠিত, তখন প্রত্যক্ষ রূপ, আর যখন যশোদার উৎকণ্ঠা কৃষ্ণে সঞ্চারিত হইয়া গোষ্ঠের আনন্দকোলাহলের মধ্যে কৃষ্ণকে চঞ্চল ও উন্মনা করিয়া তোলে, তখন পরোক্ষ। পরোক্ষ হইলেও বাৎসল্যের এই রূপ যেন আরো মোহন,—সদা-উদাসীন ক্রীড়ামুগ্ধ গোপালকে যে প্রেম এমন করিয়া বাঁধে, না জানি সে কেমন। এইবার কিছু পদ বা পদাংশ উদ্ধৃত করিতে পারি।

বিপর্য্যস্ত মাতাকে সান্ত্বনা দিতে স্নিগ্ধকণ্ঠে শ্রীদাম বলিতেছে :

নন্দরানী যাও গো ভবনে।
তোমার গোপাল এনে দিব বেলি অবসানে ॥
লৈয়া যাইছি তোমার গোপাল রাখি বসাইয়া।
আমরা ফিরাব ধেনু চাঁদমুখ চাইয়া ॥
লৈয়া যাইতে তোমার গোপাল পাই বড় সুখ।
বেণুতে ফিরাব ধেনু এ বড় কৌতুক ॥

যশোদা তাঁহার প্রাণনিধি সঁপিয়া দিয়া বড় কাতর কণ্ঠে বলেন :

হের আয়রে বলরাম হাত দে মোর মাথে।
ধড় রাখিয়া প্রাণ দিলাম তোমার হাথে ॥

রাখালদের প্রত্যাবর্ত্তনের একটি বর্ণনা—চমৎকার চিত্র :

চান্দ মুখে বেণু দিয়া সব ধেনু নাম লৈয়া
ডাকিতে লাগিল উচ্চস্বরে।

শুনিয়া কাঁহাইর বেণু ঊর্দ্ধ মুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥
অবসান বেণুরব বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলল নিজ সুখে।
যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরিয়া একত্র কৈল
চালাইলা গোকুলের মুখে ॥
শ্বেতকান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘন শ্যাম ॥
ঘন বাজে শিঙা বেণু গগনে গোখুর-রেণু
পথে চলে করি কত ভঙ্গে।
যতেক রাখালগণ আবা আবা ঘনে ঘন
বলরামদাস চলু সঙ্গে ॥

এখানে সন্ধ্যাসন্ন গোধূলির কালে গাভীদল ও রাখালদের প্রত্যাগমনের শ্লথ-মন্থর ভঙ্গিটুকু বলরামের মনোধর্মের অনুগত বলিয়া একটি উপাদেয় চিত্র পাইলাম। যখন মাতৃঅঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া উদার আকাশ ও বিশাল প্রকৃতির অঙ্কে রাখালেরা প্রভাতে ছাড়া পায়, তখনকার মূর্ত্তি—সে বড় চঞ্চলতা, বড় উল্লোল কলোচ্ছ্বাসের,—সেখানে বলরামদাসকে আশা করিতে পারি না, চপল লোচনদাস আসিয়া দাঁড়ান:

নটবর নব-কিশোর রায়
রহিয়া রহিয়া যায় গো।
ঠমকি ঠমকি চলত রঙ্গে
ধূলি ধূসর শ্যাম-অঙ্গে
হৈ হৈ হৈ সঘনে বোলত
মধুর মুরলী বায় গো ॥

এ কবিতায় নাকি বলরামের পাঠান্তর আছে—একেবারেই অবিশ্বাস্য। ইহা-ছাড়া বাল্যলীলায় বাৎসল্য-অতিরিক্ত অন্য কোন রসের মিশালও বলরামদাসের অভিপ্রেত নয়। তাই বাৎসল্যের পদে—'মা টানে ঘরপানে, শ্রীদাম টানে বনপানে' —যদুনাথদাসের সঙ্গে এইটুকু অংশে বলরামদাসের ঐক্য আছে, কিন্তু 'ব্রজগোপী

টানে নয়ানে নয়ানে গো'—পর্য্যন্ত নয়। পরিশেষে বাৎসল্যরসের আর একটি পদের উল্লেখ করিব, তৎপূর্ব্বে অন্য কবির একটি পদ উদ্ধৃত করিতে চাই। বলরামের "ঐই যাদবেন্দ্র মাতা যশোদার আকৃতি স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন:

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পুরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসে আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বামভাগে
শ্রীদাম সুদাম তার পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপুভয় আছে॥
ক্ষুধা পাইলে চেয়ে খাইও পথপানে চাইয়া যাইও
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইও কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥ ইত্যাদি

এখানে যশোদার বড় আত্মবিস্মৃত অবস্থা; পুত্রের শুভাশুভের চিন্তায় যেন শালীনতা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন—সকলের মাঝে কৃষ্ণের অবশ্যই থাকা চাই, অথচ সকলেই শিশু। পুত্রের জন্য মাতার এই স্বার্থপরতা স্নেহপূর্ণিমায় কলঙ্কের মত—বড় মনোহর, বড় মধুর। বলরামের একটি পদে যশোদার আত্মসচেতনতার পুনঃ-প্রত্যাবর্ত্তন লক্ষ্য করি। রাণী দুইপুত্রকে আবার ফিরিয়া পাইয়াছেন:

রাণী ভাসে আনন্দসায়রে।
বামে বসাইয়া শ্যাম দক্ষিণে শ্রীবলরাম
চুম্ব দেই মুখ-সুধাকরে॥
ক্ষীর ননী ছানা সরে আনিয়া সে থরে থরে
আগে দেই বলাইর বদনে।
পাছে কাহ্নাঞির মুখে দেয় রাণী মহাসুখে
নিরখয়ে চাঁদ-মুখপানে॥

বলরামের মুখে অগ্রে অর্পণ কেন? কৃষ্ণের প্রতি স্নেহের অতিশয্য দৃষ্টিকটু বলিয়া অথবা কৃষ্ণের বদনে শেষে ভোজ্য দিয়া শেষের আনন্দটুকু নিবিড়ভাবে পাইতে? দুই-ই হয়।

বলরামকৃত বাৎসল্যের যে সকল পদের উল্লেখ ও উদ্ধার করিয়াছি, সেগুলির সাহায্যে তাঁহাকে উক্ত রসের শ্রেষ্ঠ কবি বলিলে অতিরঞ্জনের দোষ বর্তিবে এবং আমার সেরূপ কোন বাসনা নাই। বাৎসল্য বলরামের কাব্যের অঙ্গী রস, ইহাই আমার বক্তব্য। সে কারণে প্রথমেই তাঁহার বাৎসল্যরসের আলোচনা করিলাম। এইবার দেখিব এই রসটি অন্য সকল পর্য্যায়ে কিরূপ অনুস্যূত। কথাটি বিচিত্র ঠেকিবে। অন্য পর্য্যায় অর্থে মধুররসের নানা পর্য্যায়। মধুররসে আবার বাৎসল্যের মিশাল কি? কিন্তু ঠিক তাই। বলরামের প্রেমকাব্যও অনেকাংশে বাৎসল্যরসের কাব্য। বিষয়টি তলাইয়া দেখা যাক।

বলরাম রসোদ্গারের কবি বলিয়া খ্যাত। রসোদ্গার প্রিয়-গৌরবিণী নারীর গর্ব্ব-গৌরবোক্তি। নায়িকা এখানে আর সরলা মুগ্ধা নন, জীবনপাত্র হইতে অমৃতরস মিলিয়াছে,—পূর্ণসৌভাগ্যের নিশান্তে 'এমনটি কাহারো হয় নাই' শ্রেণীর গূঢ় অভিমান জাগিয়াছে। মিলনে বলরাম শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন নাই, কারণ মিলন-বর্ণনার কলাকৌশল অথবা মনোবৃত্তি তাঁহার ছিল না। ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনাকে আলঙ্কারিক বাণীবয়নে চারুত্ব দান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। আবার ভাব-সম্মিলনের প্রাণোল্লাসে পৌছানও তাঁহার সাধ্যাতীত। উভয়ের মাঝখানে রসোদ্গার। ইহা মিলনের মদনমথিত প্রহর নহে, কিংবা ভাবসম্মিলনের কল্পনার দিব্য আবেশও নয়—রসোদ্গারে মিলনের পরবর্ত্তী চিত্র; নিবিড় সুখভোগের অনুসারী আলস্যমধুর সুখস্মৃতির বর্ণনা। বর্ণনাভঙ্গিতেও দ্রুতি নাই, সুখশ্লথ সুর। প্রৌঢ় রসিকমন ভিন্ন এই অবস্থাকে চিত্রিত করা সম্ভব নয়। প্রৌঢ়ত্বের স্নেহের প্রশ্রয়ে তৃপ্তি-অলস মূর্ত্তিকে দর্শন করিবার রসিকতা এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন। সে রসিকতা এবং স্নিগ্ধচক্ষে নরনারীর প্রণয়লীলা দেখিবার মানসিক ঔদার্য্য বলরামের ছিল। তাঁহার বাৎসল্যের স্নেহদৃষ্টিই রসোদ্গারে প্রসৃত। এক কোটিতে বাৎসল্য, অন্য কোটিতে রসোদ্গার। বাৎসল্য মধুরের পূর্ব্বরস, রসোদ্গার প্রণয়ের প্রৌঢ়তম অবস্থা—শ্রেষ্ঠতম অবস্থা নয়। দুই প্রান্তের লীলারস উপভোগ করিয়াছেন প্রবীণ রসিক বলরামদাস।

তথাপি রসোদ্গারে সন্নিবেশিত পদগুলি বিচার করিলে এ ক্ষেত্রে বলরামদাসকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ কবি বলিতে পারিব মনে হয় না। জ্ঞানদাসের কতক উৎকৃষ্ট পদ এ পর্য্যায়ে আছে। রসোদ্গারের কবিরূপে বলরামদাস ও জ্ঞানদাসের (কিয়দংশে চণ্ডীদাসেরও) তুলনার কথা মনে আসে। জ্ঞানদাস মিলনসুখের কথা বলিতে গিয়া বিশুদ্ধ ভাবলোকে প্রস্থান করিয়াছেন, সেখানে 'অনাদিকালের হৃদয়-উৎসের' রাগিণী ধ্বনিত, সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় অনুভূতির নিবিড়তায় সেখানে দেহদুর্গ ভাঙিয়া চিরন্তন

একলোকের কূলে একবার উপস্থিত হই, আবার তথা হইতে বিচ্যুত হইয়া হৃদয়ভেদের হৃদয়ভেদী হাহাকার তুলি। সেখানের যে প্রেম, সে কি শুধুই যৌবনস্বপ্ন?—

শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণে নেহা।

শিশুকাল হইতে সচেতন প্রেম তো জাগে না—তবে কি শিশু গতজীবনের—বহু গতজীবনের স্মৃতি ও সংস্কার বহন করিয়া আনিয়াছে! নহিলে বিধাতার বিরুদ্ধে অভিমান কেন?—

না জানি কি লাগি কো বিহি গড়ল
ভিন্ ভিন্ করি দেহা॥

তাই জ্ঞানদাসের রাধা বলে যে, কৃষ্ণ দেহে দেহে নয়, "নয়ানে নয়ানে মোরে পিয়ে"; বলে সে:

হিয়ার উপর হৈতে শেজে না ছোঁয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥
নিদের আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠিয়ে॥

প্রেমের এই 'লোকলোকান্তরব্যাপ্ত' পটভূমিকা জানিলে একথা অত্যুক্তি মনে হয় না:

হিয়ায় হিয়ায় লাগিবে লাগিয়া
চন্দন না মাখে অঙ্গে।

নিজ প্রাণের অর্দ্ধাংশটুকু হারাইয়া উন্মত্ত অন্ধের মত সে কোন্ অপরিজ্ঞাত অতীতে ছুটিয়া বাহির হইয়াছি—দিন যায়, মাস যায়, বর্ষ যায়, যায় যুগ, যায় কল্প, তবু পাই না—আজ যদি সত্যই পাইলাম, তবে চন্দন মাখিব, বসন রাখিব! প্রাণের কি সজ্জা আছে, আত্মার কি বসন থাকে? বিরহান্তে মিলনের একাকার মোহানায় ব্যথিত আশঙ্কা শুধু বিচ্ছেদের তরঙ্গ তোলে, শুধু করুণ উৎকণ্ঠা দুলিয়া দুলিয়া ওঠে, ঐ—

কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠিয়ে।

জ্ঞানদাসের রসগুরু চণ্ডীদাসেরও এক কথা:

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি॥

সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥

এবং :

আমি যাই যাই যাই বলি বলে তিন বোল।
কত না চুম্ব দেই কত দেই কোল॥
পদ আধ যায় পিয়া চাহে পালটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হৈয়া॥

বলরামদাসের এই গভীরতা নাই। একেবারে নাই বলি না, তবে অনুরূপ নয়। এবং বলরামকৃত রসোদ্গারের পদ অধিক বাস্তবানুগ। তাঁহার প্রেম সম্পূর্ণ বিদেহী নয়। তবে রসোদ্গারের পদে প্রেমের স্মৃতিবর্ণনা হিসাবে একটা পরোক্ষ ভাব, দেহাতিক্রমী প্রেমের সুর থাকে। প্রিয়ের রতি নয়, আরতিই প্রিয়ার স্মরণে আছে। বলরামদাসের পদ কিছু কিছু উদ্ধৃত করা যাক।

বলরামের একটি পদকে রসোদ্গারের সূচনা বলিতে পারি। সখীদের অনুযোগ,—রাধিকা গোপন প্রেমরতন গোপনেই রাখিতেছেন :

প্রেম রতন গোপতে পাইয়া
ভাঁড়িলে কি হবে লাভ॥

* * *

পুছিলে না কহ মনের মরম
এবে ভেল বিপরীত॥

হায়! রাধিকা যে বলিবার জন্য কত ব্যস্ত, তাহা কি সখারা একেবারেই জানে না! সুখ সখা ও সখী চায়। কিন্তু বিনা অনুরোধে মুখ খোলে কিরূপে। তবে সুরু হইলে যে শেষ থাকিবে না, সে কথাও বেশ জানি :

মরম কহিলুঁ মো পুন ঠেকিলুঁ
সে জনার পিরীতি-ফাঁদে।
রাতি-দিন চিতে ভাবিতে ভাবিতে
তারে সে পরাণ কান্দে॥
বুকে বুকে মুখে মুখে চোখে লাগিয়া থাকে
তমু মোরে সতত হারায়।
ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে
আমারে রাখিতে চায়॥

হার নহোঁ পিয়া গলায় পরয়ে
চন্দন নহোঁ মাখে গায় ।
অনেক যতনে রতন পাইয়া
থুইতে সোয়াস্তি না পায় ॥
কর্পূর তাম্বূল আপনি সাজিয়া
মোর মুখ ভরি দেখ ।
হাসিয়া হাসিয়া চিবুক ধরিয়া
মুখে মুখ দেই লেয় ॥
সাজাঞা কাচাঞা বসন পরাঞা
আবেশে লইতে কোরে ।
দীপ লৈয়া হাতে মুখ নিরখিতে
তিতিল নয়ান লোরে ॥
চরণে ধরিয়া যাবক রচই
আউলায়া বান্ধয়ে কেশ ।
বলরাম চিতে ভাবিতে ভাবিতে
পাঁজর হৈল শেষ ॥

* * *

কত নানা বেশ করি পরায় পাটের সাড়ী
সাধে সাধে সমুখে হাটায় ।
দেখিয়া হাটন মোর হইয়া আনন্দে ভোর
দুই বাহু পসারিয়া ধায় ॥
সই তেঞি সে হিয়ার মাঝে জাগে ।
কত কুলবতী যারে হেরিয়া ঝুরিয়া মরে
সেই যোড় হাথে মোর আগে ॥
অতি রসে গরগরি কাঁপে পহু থরথরি
আরতি করিয়া কোলে করে ।
ঘন ঘন চুম্বনে নিবিড় আলিঙ্গনে
ডুবাইল রসের সাগরে ॥
চন্দন মাখায় গায় দেয় বসনের বায়
নিজ করে তাম্বূল খাওয়ায় ।

বিনি ঝাজে কত পুছে কতনা মুখানি মোছে
হেন বাসে দেখিতে হারায় ॥
তুমি মোর ধনপ্রাণ তোমা বিনে নাহি আন
কহে পিয়া গদগদ ভাষে।
যতেক পিরীতি তার জগতে কি আছে আর
কি বলিবে বলরামদাসে ॥

* * *

রাতি দিনে চোখে চোখে বসিয়া সদাই দেখে
ঘন ঘন মুখখানি মাজে।
উলটি পালটি চায় সোয়াস্ত নাহিক পায়
কত বা আরতি হিয়ার মাঝে ॥…
জ্বালিয়া উজ্জ্বল বাতি জাগিয়া পোহায় রাতি
নিঁদ নাহি যায় পিয়া ঘুমে।
ঘন ঘন করে কোলে খেনে করে উতরোলে
তিলে শতবার মুখ চুমে ॥
খেনে বুকে খেনে পিঠে খেনে রাখে দিঠে দিঠে
হিয়া হৈতে শেজে না ছোয়ায়।
দরিদ্রের ধন হেন রাখিতে না পারে স্থান
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায় ॥

* * * *

নয়ানে নয়ানে থাকে রাতিদিনে
দেখিতে দেখিতে ধান্দে।
চিবুক ধরিয়া মুখানি তুলিয়া
দেখিয়া দেখিয়া কান্দে ॥
নিশ্বাস ছাড়িতে গুণে পরমাদে
কাতর হৈয়া পুছে।
বালাই লইয়া মো মরোঁ বলিয়া
আপনা দিয়া কত নিছে ॥
না জানি কি সুখে দাঁড়াঞা সমুখে
যোড় হাথে কিবা মাগে।

যে করয়ে চিতে কে যাবে প্রতীতে
বলরাম চিতে জাগে ॥

* * * *

কিবা সে কহিব বঁধুর পিরীতি
তুলনা দিব যে কিসে।
সমুখে রাখিয়া মুখ নিরখয়ে
পরাণ অধিক বাসে ॥
আপনার হাথে পান সাজাইয়া
মোর মুখ ভরি দেয়।
মোর মুখে দিয়া আদর করিয়া
মুখে মুখ দিয়া নেয় ॥
মরোঁ মরোঁ সই বঁধুর বালাই লৈয়া।
না জানি কেমনে আছয়ে এখনে
মোরে কাছে না দেখিয়া ॥
করতলে ঘন বদন মাজই
বসন করয়ে দূর।
পরশিতে অঙ্গ সকলি সোঁপিলু
ধৈরজ পাওল চুর ॥
মরম বান্ধল নানা সুখ দিয়া
বচন ঠেলিতে নারি।
যখন যেমতি করে অনুমতি
তখন তেমতি করি ॥

উদ্ধৃত পদ বা পদাংশগুলি সর্ব্বাঙ্গীণভাবে প্রথম শ্রেণীর এমন দাবী করি না। তবে একটা কবিত্বের মান বজায় আছে। এই পদগুলির মধ্যে, লক্ষ্য করিলে দেখিব, প্রণয়ের মাদকতা কোথাও নাই। সুখস্মৃতির বর্ণনায় উত্তাল হৃদয়াবেগ আশাও করা যায় না, তবু শিহরণটুকু মধ্যে মধ্যে না থাকিবে কেন? বলরাম তাহাও বর্জ্জন করিয়াছেন। বলরাম বা রাধিকা এ কোন্ কৃষ্ণের কথা বলিতেছেন? রসোদ্গারের প্রেম—গাঢ়ত্বজনিত হারাই হারাই ভাবটুকুর কথা বাদ দিলে—বিরহহীন পূর্ণ মিলনাত্মক। প্রণয়ের এই খণ্ডকালে বিচ্ছেদ বা প্রতারণার ছায়াপাত নাই। নায়কের প্রেমে নায়িকার পূর্ণ আস্থা। সেই পরিপূর্ণ আস্থা কি প্রণয়মত্ত প্রেমিকের নিকট

কোনকালেই আশা করা যায় না? তাহার মধ্যে কি পিতৃত্বের মনোভাব সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া এত প্রয়োজন? অন্ততঃ বলরাম তাহাই মনে করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ 'দুই বোনের' ভিতর প্রেমিকা নারীর দুইরূপ আবিষ্কার করিয়াছেন, একজন মাতা, অন্যজন প্রিয়া। বলরামদাস প্রেমিক পুরুষের মধ্যেও সম্ভবতঃ দুই রূপ আবিষ্কার করিয়াছেন, পতি ও পিতা। রসোদ্‌গারের কৃষ্ণ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রণয়ী। বলরামের সর্ব্বব্যাপক বাৎসল্য এখানেও উপস্থিত। প্রমাণের প্রয়োজন আছে? প্রেমের রসকলার নিদর্শন কোথা—সর্ব্বত্র সেবা শুশ্রূষা পরিচর্য্যা—'সোয়াস্ত' না পাওয়ার কথা। এই অস্থিরতাটুকু প্রেমের গাঢ়ত্ব হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনাকে ছাড়াইয়া স্নিগ্ধ স্নেহের সৃষ্টি করে। দুরন্ত পুরুষের জন্য নারীর এই প্রকার অনুভূতির কথা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু বিপরীত পক্ষও যে আছে, তাহা রসোদ্‌গারের কাব্যপাঠে জানিলাম। নারী রাধিকা তাঁহার হৃদয়ভাব পুরুষ কৃষ্ণের উপর চাপান নাই তো?

ঐ স্নেহপূর্ণ প্রণয়—ঐ সেবা-শুশ্রূষা—ঐ পান খাওয়ান—রাতদিন চোখে চোখে রাখা—ঐ আশঙ্কা—ইহা প্রণয়ের আকৃতি নয়, বাৎসল্যের প্রকৃতি। ইহা ছোটর জন্য বড়র আশঙ্কা—ঐ 'মায়ের প্রাণের ভয়ের মত দোলে,' নচেৎ—

আউলাঞা কবরীভার বেশ করে বারবার
বসন পরায় কুতূহলে।
বসাঞা আপন উরে নূপুর পরায় মোরে
চরণ পরশে করতলে ॥

—গোবিন্দদাসের রসোদ্‌গার-পদের এই অংশের সঙ্গে বলরামদাসের পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশগুলির ভাবঘটিত পার্থক্য কিরূপ স্পষ্ট। গোবিন্দদাসের কৃষ্ণ 'বসন পরায় কুতূহলে', আর বলরামের কৃষ্ণ বসন পরাইয়া 'সাধে সাধে সমুখে হাঁটায়'; কেবল তাহাতেই শেষ নয়, স্নেহব্যাকুল চিত্তে 'দেখিয়া হাঁটন মোর, হইয়া আনন্দে ভোর, দুই বাহু পশারিয়া ধায়।' অথবা যেখানে 'চন্দন মাখায় গায়, দেয় বসনের বায়, নিজ করে তাম্বূল খাওয়ায়', যেখানে 'কতনা মুখানি মোছে', যেখানে 'নিশ্বাস ছাড়িতে গুণে পরমাদে কাতর হৈয়া পুছে, বালাই লইয়া, মো মরোঁ বলিয়া আপনা দিয়া কত নিছে'—সে সকল স্থান রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-পর্য্যায় বলিয়া না দিলে, দিব্য বাৎসল্য রসের অন্তর্গত বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়। একটি চরম দৃষ্টান্ত লওয়া যাক, ঐ—'করতলে ঘন বদন মাজই' অংশটুকু,—এখানে 'বসন করয়ে দূর'-এর মত ব্যাপারেও কবি কোনপ্রকার উত্তাপ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই, বলিতে হয় বলিয়া কোনক্রমে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছেন; নচেৎ অব্যবহিত পরেই রাধিকার যে স্বীকৃতি—'যখন যেমতি

করে অনুমতি তখন তেমতি করি'—এই বাধ্যতা অপস্নিণতবয়স্ক একটি সুশীলা বালিকার তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ঐ একই ব্যাপার যখন গোবিন্দদাস লেখেন, তাঁহার রূপ হয় এই :

যব হরি পাণি- পরশে ঘন'কাঁপসি
ঝাঁপসি ঝাঁপলি অঙ্গ।

বলরামদাস-সম্বন্ধে অবশিষ্ট বক্তব্য কয়েকটি অংশে গ্রহণ করা যায়,—বলরামের বর্ণনারস, কবিভাষা ও রাধিকা-সর্ব্বস্বতা। বর্ণনারসের প্রাধান্যের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, কারণও বলিয়াছি—হৃদয়াবেগের তরঙ্গভঙ্গ সৃষ্টিতে অক্ষম যে প্রৌঢ় মানসিকতা, তাহাই সংযত বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে আত্মপ্রকাশ চাহিয়াছে। এই একই কারণে কবিভাষার আলোচনা বলরামের কাব্যপ্রসঙ্গে মূল্যবান। ভাষা-বিভ্রাটে অনেক বৈষ্ণব কাব্য নষ্ট হইয়াছে। বৈষ্ণব ভাব-আন্দোলনের রসপ্রকাশ ব্রজবুলি ভাষায়। এই ভাষার সম্পদ প্রচুর, সমর্থ হস্তে ব্রজবুলিতে সোনা ফলিয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব পদকারগণ অনেকসময় বিস্মৃত হইতেন যে, আত্মউদ্ঘাটনের রূপ-রীতিতে সর্ব্বজনীনত্ব কখনই সম্ভব নয়। ব্রজবুলি বৈষ্ণব পদের উৎকৃষ্ট বাহন হইতে পারে, কিন্তু উহাকেই একমাত্র বাহন করিলে প্রমাদের শঙ্কা থাকে; বিশেষতঃ যখন দেশের কথ্য বুলি ব্রজবুলি নয়। ব্রজবুলি যতখানি ভাষা, ততোধিক রীতি। গোবিন্দদাস-জগদানন্দের প্রতিভাধার যথার্থতঃ ব্রজবুলি, তেমন চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের অমিশ্র বাংলা। জ্ঞানদাস অনেকক্ষেত্রে এই সত্যটি বিস্মৃত হইয়া গোল বাধাইয়াছেন। বলরামদাসেরও বাহন নিঃসংশয়ে বাংলা অথচ তাঁহার ব্রজবুলিতে রচিত পদ আছে। লক্ষণীয় এই, সাধারণভাবে ব্রজবুলিতে রচিত পদগুলি অপকৃষ্ট। পূর্ব্বে বলরামদাসকে প্রতিভা-সচেতন কবি বলিয়াছি, অথচ বাহন-নির্ব্বাচনের ব্যাপারে এহেন বিভ্রাট কেন? আমার বিশ্বাস, এই বিভ্রাট-সৃষ্টি বলরামের ইচ্ছাকৃত এবং তাঁহার আত্মসজ্ঞানতাই উহার কারণ। আমাদের বক্তব্যে স্বতোবিরোধ আছে মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা নয়। প্রত্যেক রসপর্য্যায়ের প্রাণরস ভিন্নপ্রকার। তাহার রূপসৃষ্টিও ভিন্ন হইতে বাধ্য। কোনটিতে ভাবাকুল সরলতা, কোনটিতে আলঙ্কারিক চাতুর্য্য। অধিকাংশ পদকারের প্রতিভাধর্ম্ম উহার একটির অনুগত হয়, সুমহৎ প্রতিভা ছাড়া উভয়ের সমব্যবহার থাকে না। বলরামের কবিশক্তি বর্ণনাধর্ম্ম অনুসরণ করিতে অভ্যস্ত—সমুচ্চ ভাবোল্লাসে বা রসকুটীল প্রণয়কলার পথে চলিতে অপারগ। তাই বাৎসল্য রসোদ্গার ইত্যাদি পর্য্যায়ে বলরামের প্রতিভা যে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, বিরহ, ভাব-সম্মিলন কিংবা খণ্ডিতা কুঞ্জভঙ্গে তাহা পায় না। অথচ সর্ব্ববিষয়ে পদরচনা করিবার একটা আকাঙ্ক্ষা

বলরামদাসের মধ্যে লক্ষ্য করি। সুতরাং বহুক্ষেত্রে তিনি ভাষার আবরণে নিজ অক্ষমতা ঢাকিতে চেষ্টা করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি? দৃষ্টান্ত লইলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে।

নৌকাবিলাসের একটি পদ আরম্ভ হইতেছে এইভাবে:

কিবা যায়রে শ্যাম-সোহাগিনী।
ধনী ঠমকি ঠমকি চলনি • চরণে মণি-মঞ্জীর বোলনি
পিঠপর বেণী দোলনী॥

—এই সুরে মন সায় দেয়। এখানে রাধিকার যাত্রা অনেকটা আনন্দাভিসারের মত; সখীদের সঙ্গে পথে বাহির হইয়া স্বভাবতঃ যৌবন-গরবিণী রাধিকা উল্লাসবোধ করিবেন। কবিরও ইচ্ছা, সেই উল্লাস ভাবে-ভঙ্গিতে ফুটাইবেন. কিন্তু হায়, সাধ থাকিলেই সাধ্য থাকে না, অতএব ঠিক পরেই সাদামাটা বিবৃতি সুরু হয়:

সাজায়ে পসরা যাইতে মথুরা
যতেক গোপের নারী॥……

কবি যেন কর্ত্তব্যবোধে রাসের পদ লিখিয়াছেন। গোবিন্দদাসের ছন্দে পদ তো আরম্ভ করিয়া দিলেন:

একে সে মোহন যমুনার কূল
আরে সে কেলি কদম্বমূল
আরে সে বিবিধ ফুটল ফুল
আরে সে শারদ যামিনী।

অধিক অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই, প্রথম স্তবকেই গোবিন্দদাসের ছায়ারূপকে দেখি; 'আরে সে, আরে সে' করিয়া কবিকে উৎসাহ বজায় রাখিতে হইয়াছে, এবং ক্রমেই অবশিষ্ট উল্লাস ফিকা হইয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। উল্লাস বোধ করিবার ক্ষমতাই যে কবির নাই; তদুপরি সূক্ষ্ম ধ্বনিজ্ঞান, ছন্দবোধ, ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিবার সামর্থ্যেরও অভাব।

কেবল উল্লাস নহে, গভীর ভাবানুভূতিও কবির আসে না। সুতরাং আক্ষেপানুরাগে তিনি সোজা সরল দুঃখের বর্ণনা করিয়া গেলেন; তাহার অনেকখানি অংশ পাপ ননদিনী ও দারুণী শাশুড়ী ভরিয়া রহিল। সেই আটপৌরে বর্ণনা তো বিরহে চলে না, অথচ বাংলা ভাষায় হাহাকার তুলিতে কবি অক্ষম, তাই ব্রজবুলিতে কিঞ্চিৎ বেদনার বার্ত্তা নিবেদন করিলেন, তাহাতে না সৌন্দর্য্য, না আবেগ।

আবার মণ্ডনকলার অনুস্থতি যেখানে আবশ্যিক, সেই সকল পর্য্যায়েও প্রায়

অনুরূপ অবস্থা। মান বলরামের নিজস্ব ক্ষেত্র নহে, পদও অনুল্লেখযোগ্য। মিলন সম্বন্ধে একই কথা। খণ্ডিতা এবং কুঞ্জভঙ্গ—এ দুটি আলঙ্কারিক চাতুর্য্যসৃষ্টির উর্ব্বর ক্ষেত্র। কবিও যেন তাঁহা মান্য করিয়া ব্রজবলি অবলম্বন করিয়াছেন। অবশ্য কুঞ্জভঙ্গের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গৃহীত বংশীবদনের—

রাই জাগো রাই জাগো শারীশুক বলে।
কত নিদ্রা যাও কালো মানিকের কোলে ॥
উঠহে গোকুলের চাঁদ রাইকে জাগাও।
অকলঙ্ক কুলে কেন কলঙ্ক লাগাও ॥
শারী বলে ওহে শুক, গগনে উড়ি ডাক।
নব জলধরে আনি অরুণেরে ঢাক ॥—

পদটির বর্ণনাভঙ্গি সরল। একটি পদে বলরাম সম্ভবতঃ বিদ্যাপতির অনুকরণে রসসৃষ্টিতে সমর্থ হইয়াছেন :

সহচরিগণ দেখি লাজে কমলমুখী
ঝাঁপি রহল মুখ-আধ।
অলখিতে আধ কমল দিঠি অঞ্চলে
হেরই হরি-মুখ-চাঁদ ॥
হরি হরি মাধবী-লতাগৃহ মাঝ।
কুসুমিত কেলি শয়নে দুহুঁ বৈঠলি
চৌদিকে রমণীসমাজ ॥
গোরিক থোরি বদন বিধু হেরইতে
পহুঁ ভেল আনন্দে ভোর।
ঘন ঘন পীত বসন দেই মোছই
নিঝরই নয়নক লোর ॥

কুঞ্জভঙ্গে তবু আন্তরিক বেদনার স্থান আছে, কেননা রাধাকৃষ্ণের প্রাভাতিক বিচ্ছেদে যদিচ ভোগ-বিরতিজনিত যন্ত্রণাই প্রধান, তবু বিচ্ছেদ তো; কিন্তু খণ্ডিতায় একেবারে প্রবঞ্চিতার মর্ম্মজ্বালা, ঈর্ষ্যার দাহন। সারারাত্রি বাসক সজ্জায় ব্যর্থ প্রহর গণিয়া কাটিয়াছে, প্রভাতে—দিবালোকে—নির্লজ্জ নায়ক গতরাত্রির ভোগস্মৃতি অঙ্গে বহিয়া উপস্থিত—এ:হন সময়ে নায়িকার মুখে যে ভাষা বাহির হইবে, তাহাতে বিষের জ্বালা ও ক্ষুরের ধার, মধুক্ষরণের আশা কেহ করে না। ব্যঙ্গে কণ্ঠ রি রি করিয়া ওঠে :

ভাল হৈল আরে বন্ধু আইলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে॥
বন্ধু তোমার বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদমুখ চাই॥ (চণ্ডীদাস)

বলরামদাস কি বলেন দেখা যাক্। একটি পদ উদ্ধৃত করি, অবশ্য ইহা কিছু উৎকৃষ্ট পদ নহে :

দেখ সখি হোর কিয়ে নাগররাজ।
বিপরীত বেশ- বিভূষিত হেরিয়ে
কোন কয়ল ইহ কাজ॥
ঢুলি ঢুলি চলত খলত পুন উঠত
আওত ইহ মঝু কান্ত।
স্থলপঙ্কজদল নয়নযুগল বর
যামিনী জাগি নিতান্ত॥
মুখ বিধুরাজ মলিন অব হেরিয়ে
অরুণ-কিরণ ভয় লাগি।
অলক-নিকর উড়ু ভাল-গগন পর
নিশি অবসান ভয় ভাগি॥
বান্ধুলী অধরে হেরি জনু নিলীম
কাজর করি অনুমান।
অপরূপ দশন- কাঁতি জনু দরপণ
সে অব রঙ্গিম ভাণ॥
উরপর নখপদ তনু তনু নিরমদ
অনুখন আলসে বিভোর।
যাবক-রাগ দাগ কিয়ে শোভন
ঘন ঘন ভুজযুগ মোড়॥
শ্যামর অঙ্গে নীল অম্বর কিয়ে
জলদে জলদ মিলি গেল।
দুরহি দীগ- বসন জনু হেরিয়ে
ঐছন মরমহি ভেল॥

টলমল চরণ- যুগল মণি-মঞ্জীর
ঝনর ঝনর ঘন বাজে।
কহ বলরাম- দাস ইহ বিপরীত
হেরত নাগররাজে॥

পদটিতে, পরম কৌতুকের ব্যাপার, ইহার অন্তর্নিহিত ভাব-বিরোধ। পদটি খণ্ডিতার। সুতরাং রাধাকর্তৃক কৃষ্ণরূপের বর্ণনা সম্পূর্ণ ব্যঙ্গাত্মক হইবে। কৃষ্ণের রূপের প্রশংসা যদি রাধা করেন, সে শ্লেষতিক্ত কণ্ঠে। প্রথম দিকে তেমন করিবার একটা চেষ্টা আছে বটে। কিন্তু শ্লেষ বা ব্যঙ্গ যে কবির আসে না। তাই ব্যঙ্গের ধার মরিয়া গিয়া পদটি প্রায় রূপানুরাগের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কবি ও রাধিকার মধ্যে মনোভাবের সূক্ষ্ম সংঘাতে রস দানা বাঁধে নাই। বক্তব্যে শ্লেষ ও সুরে স্তুতি। যাহা অভিপ্রেত তাহা অসিদ্ধ রহিয়া গেল।

বলরামের কাব্যপ্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার কবিবৈশিষ্ট্যরূপে উল্লিখিত অবশিষ্ট লক্ষণটির আলোচনা এখন করিতে পারি। বলিয়াছি, বলরামের কাব্য রাধিকা-সর্ব্বস্ব। ইহা কি বলরামের কোন স্বতন্ত্র ধর্ম্ম? রাই বই গীত নাই—সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে কি একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না? সমগ্রের অঙ্গরূপেই তো বলরামের ঐ রাধিকাপ্রীতি। তাহা সত্য। কিন্তু বলরাম ঐ স্বরূপধর্ম্মকে যেমন অনন্যমানস হইয়া অনুসরণ করিয়াছেন, অন্য কবি সেরূপ নন। একজন পদকার আশ্চর্য্য ভাষায় যুগলরূপের বর্ণনা করিতেছেন—"আঁধারে জলয়ে কিবা রসের দীপিকা।" পদে পদে বৈষ্ণব কবি রসের দীপিকা জ্বালিয়াছেন। কিন্তু সে দীপ জ্বলে কৃষ্ণ-নিশীথের বুকে। বলরামের কাব্যে ঐ কৃষ্ণ নাই তাহা নয়, তবে তাহার অস্তিত্ব তিনি যেন যথাসম্ভব বিস্মৃত হইতে চাহিয়াছেন। দীপ জ্বলে তাহাই যথেষ্ট, কোথায় জ্বলে বলরামের তাহাতে প্রয়োজন নাই। দৃষ্টান্তে আসা যাক।

বলরামের কিছু রূপানুরাগের পদ আছে। রূপ কাহার? রাধিকা এবং কৃষ্ণ উভয়ের। রূপ কাহার বেশী? কৃষ্ণ বলে রাধার, রাধা বলে কৃষ্ণের; কবি কিছুই বলেন না, তাঁহার বলিবার অবস্থা নয়। অতএব বৈষ্ণব কাব্যে রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ের রূপবর্ণনা ও রূপপিপাসার কাহিনী নাই। আবার রূপানুরাগের দুটি অংশ: রূপ ও অনুরাগ। যখন শুধু রূপ তখন, কবি পুরুষজাতীয় বলিয়া, রাধারূপ প্রাধান্য পাইবে। রাধা যে নারী; পুরুষ কবির উল্লাস নারীরূপের অঙ্কনে একটু বেশী পরিমাণেই হয়। আশা করি ইহাতে কেহ আপত্তির কিছু দেখেন না। আর যখন অনুরাগ, তখন কবি পুরুষহৃদয়ের আকুলতা অপেক্ষা নারীপ্রাণের ব্যাকুলতায় ঈষৎ অধিক আস্থা

রাখিবেন। অতএব মুখ্যতঃ রূপের দৃষ্টি কৃষ্ণের এবং অনুরাগের দৃষ্টি রাধার—সমগ্র বৈষ্ণব কাব্য ইহার সাক্ষ্য। বলরাম কৃষ্ণ-চোখে রাধার রূপদর্শন-ব্যাপারটুকু প্রায় বাদ দিয়াছেন। "অপরূপ পেখল রামা"—এই 'পেখল'-কর্ম্মটুকু' ছাড়া বৈষ্ণব কাব্যে কৃষ্ণের বিশেষ ভূমিকা নাই। সেই রাধারূপকে যদি বর্জ্জন করা যায়, তবে কৃষ্ণ ঐ রাধিকাকে দেখিবার গৌরব হারাইয়া কাব্য হইতে স্খলিত হইয়া পড়েন। বলরামের কাব্য সেইরূপে কৃষ্ণ-হারা।

তবে কি বলরামের কাব্যে রাধা-রূপের বর্ণনা একেবারে নাই? কবি কি প্রথার আনুগত্য সম্পূর্ণ পরিহার করিলেন? না, তিনি বিপ্লবী নন। কিছু রাধারূপের বর্ণনা অবশ্যই আছে—অতি সাধারণ সুরের—এবং ব্রজবুলি ভাষায়। কবি কি ভাষার আবরণে নিজ অক্ষমতা ঢাকিতে সচেষ্ট নন?

রাধারূপ বর্ণনার ক্ষমতা কবির ছিল না। রূপকে কাব্যরূপ দিতে হইলে যে সতেজ সরস প্রগাঢ় রসদৃষ্টির আবশ্যক, বলরামের মানসিকতা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তদনুযায়ী উহা বলরামের থাকে না। তাই তিনি কৃষ্ণ-দর্শনে রাধার অবিরত হৃদয়-মথনের কাহিনী বলিয়া যান। সুর কোথাও খুব তীব্র নয়। কাব্যের সুরে ভাব-ফোটান বলরামের পক্ষে কঠিন। তিনি নিরাপদ বর্ণনার আশ্রয়প্রার্থী। আকুলতার কথা বারবার বলিতে বলিতে এক সময় আকুলতা আসিয়া যায় ও অল্প ক্ষেত্রে সুকাব্য হইয়া ওঠে; যথা:

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে ঘুমাতে দেখি শ্যামরূপখানি॥
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিল রাঙা নয়ান নাচনে॥
কিবা রূপ দেখিনু সেই নাগর শেখর।
আঁখি ঝরে মন কাঁদে পরাণ কাতর॥

ইহার পরের দুই পঙ্‌ক্তিতে কেবল রাধিকার মনের কথা নয়, নিজ কবি-মন সম্পর্কে একটা বড় সত্য কথা কবি বলিয়াছেন:

সহজে মুরতিখানি বড়ই মধুর।
মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চুর॥

'সহজে মুরতিখানি' রাধিকার ধর্ম্ম চুরি করিয়াছে ও বলরামদাসের কবিধর্ম্ম দান করিয়াছে।

বলরাম রূপচিত্রণে অক্ষম এবং তাঁহার কাব্যে কৃষ্ণ কেহই নয় দেখিলাম। তাই পূর্ব্বরাগ-পর্য্যায়ে কাঁদাই বাহুল্য কৃষ্ণ-বিষয়ে রাধার আকুলতাই উপজীব্য হইবে। বলরামের আবার শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগও আছে। যে শ্রীকৃষ্ণের মানসিক অবস্থা-বর্ণনা বলরামের উদ্দেশ্য নয়, সেই কৃষ্ণের আবার পূর্ব্বরাগ কেন—এই প্রশ্ন পদগুলির অবস্থা দেখিয়া আমাদের সঙ্গে স্বয়ং কবিরও মনে জাগিবে, সেগুলি এতই অপকৃষ্ট। বৈষ্ণব কবির পক্ষে প্রথার বাঁধন বড় বাঁধন।

পূর্ব্বরাগের বিচারে আসিয়া আমরা একটু অসুবিধায় পড়িতেছি। পূর্ব্বরাগে কতক সত্যকার উৎকৃষ্ট পদ আছে। নিন্দার সুযোগ হারাইয়া সমালোচকের যে অসুবিধা, এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্য ঠিক সে অসুবিধা নয়। পদগুলি সুন্দর ও বলরামের প্রচলিত রীতিতে রচিত নয়। আমরা সাধারণতঃ কবির সংখ্যাতত্ত্বকে মর্য্যাদা দিই নাই—এক্ষেত্রে কি দিতে হইবে? বলরাম কয়েকজনই ছিলেন বলিয়া শোনা যায়। আমরা কাব্যের আভ্যন্তর সাক্ষ্যের সাহায্যে বলরামের যে কবিচরিত্র উদ্ঘাটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, এক্ষেত্রে তাহার সামান্য ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। যথা ব্রজবুলিতে রচিত বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের সুরে রাধিকার আত্মবিস্মৃত ভাববিহ্বল মূর্ত্তির উত্তম রূপায়ণ:

শুনইতে কানহি আনহি শুনত
বুঝইতে বুঝই আন।
পুছইতে গদগদ উত্তর না নিকসই
কহইতে সজল নয়ান ॥
সখিহে কি ভেল এ বরনারী।
করহুঁ কপোল থাকিত রহু ঝামরি
জনু ধনহারী জুয়াড়ী ॥
বিছুরল হাস রভস-রস-চাতুরী
বাউরী জনু ভেল গোরী।
খনে খনে দীঘ নিশসি তনু মোড়ই
সঘন ভরমে ভেলি ভোরি ॥
কাতর কাতর নয়নে নেহারই
কাতর কাতর বাণী।
না জানিয়ে কোন দুখে দারুণ বেদন
ঝর ঝর এ দুই নয়ানি ॥

ঘন ঘন নয়নে নীর ভরি আওত
ঘন ঘন অধরহি কাঁপ।
বলরামদাস কহ জানলু জগমাহ'
প্রেমক বিষম সন্তাপ॥

অথবা চপল ঢঙে গভীরের ইসারা, চণ্ডীদাস বা লোচনদাসের অনুরূপ:

ঢুলু ঢুলু ছুটি নয়ান নাচনি
চাহনি মদনবাণে।
তেরছ বন্ধানে বিষম সন্ধানে
মরমে মরমে হানে॥
চন্দন-তিলক আধ ঝাঁপিয়া
বিনোদ চূড়াটি বান্ধে।
হিয়ার ভিতর লোটায়্যা লোটায়্যা
কাতরে পরাণ কান্দে॥

একই প্রকার হালকা শব্দ ও অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে ভাবসৃষ্টির চমৎকারিত্ব:

রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
হেলিয়া পড়িছে বায়।
অঙ্গ মোড়া দিয়া ত্রিভঙ্গ হইয়া
ফিরিয়া ফিরিয়া চায়॥

* * *

হিয়া জরজর পরাণ ফাঁপর
দারুণ মুরলী স্বরে।
ফুটিল হরিণী লোটায়ে ধরণী
কান্দিয়া মরয়ে ঘরে॥

অবশ্য বলরামের সংযত মধুর বর্ণনারসে প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব হয় নাই:

কিরূপ দেখিনু সই নাগর শেখর।
আঁখি ঝুরে মন কাঁদে পরাণ ফাঁপর॥
কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি
জাগিতে স্বপনে দেখি শ্যামরূপখানি॥

এমন কি পুরাতন 'সহজ মুরতি'-দ্বারা ধর্ম্মচুরি পর্য্যন্ত :

সহজে মুরতিখানি বড়ই মাধুরী।
মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চুরি ॥

বলরামের পদের ভঙ্গি-বৈপরীত্যকে ভঙ্গিবৈচিত্র্য বিবেচনা করিয়া সম্ভবতঃ পাঠকগণ সমালোচকের অসুবিধাকে তুচ্ছজ্ঞান করিবেন। বিশেষতঃ একটি-দুটি পদে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নূতন কবির সৃষ্টি করে না। আর বলরাম ব্রজবুলিতে যখন পদ লিখিয়াছেন, তখন সর্ব্বত্রই তাঁহাকে ব্যর্থ হইতে হইবে, অথবা মন্থর সুরে বর্ণনা করেন বলিয়া "চপলতা যদি ঘটে করিও ক্ষমা" বলিবার সুযোগ অন্ততঃ কখনও গ্রহণ করিবেন না, এমন কথা হলফ করিয়া বলা চলে না। পাঠকগণ এরূপ বলিলে খণ্ডন করিতে পারিব মনে হয় না।

সর্ব্বশেষে যে পদটির উল্লেখ করিতেছি, তাহা সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ পদ - বলরামের সর্ব্বোত্তম তো নিশ্চয়ই। সমালোচকের থিয়োরীর উপর চূড়ান্ত আঘাত এখানে অপেক্ষা করিতেছে। ব্যতিক্রম নিয়মের প্রমাণ করে—এই জীর্ণ বচনটুকু আত্মপক্ষ সমর্থনের একমাত্র উপায়। রাধিকা সম্পর্কে কৃষ্ণের উক্তি পদটিতে। বলরাম যে রাধিকা-সর্ব্বস্ব প্রমাণসহ জানাইয়াছি ; এমনই পরিহাস, বলরামের শ্রেষ্ঠ পদ কৃষ্ণাশ্রয়ী। পদটি এই :

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা সিরজিল বিধি ॥
বসিয়া দিবসরাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটী কলপ যদি নিরবধি দেখি ॥
তবু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন-সমান ॥

* * *

যতনে আনিয়া যদি ছানিয়ে বিজুরী।
অমিয়ার ছাঁচে যদি গড়য়ে পুতলি ॥
রসের সায়রে যদি করায় সিনান।
তবু তো না হয় তোমার নিছনিসমান ॥
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতীত।
হারাই হারাই হেন সদা করে চিত ॥

হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈলে বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁর চিত নহে থির॥

কৃষ্ণের মানস-রহস্য যিনি বর্ণনা করিতে পারেন না, তাঁহার হাত দিয়া এ কি বাহির হইল। অথবা কৃষ্ণ-সম্বন্ধে কবিচিত্তের যতকিছু প্রেরণা বেদনা সকলি একটি পদে নিঃশেষ করিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিয়া ছিলেন। অথচ কাব্য কি নিঃশেষ হয়—সুরতরঙ্গিণীর শেষে রসসাগরোর্ম্মি। নচেৎ আষাঢ়-সন্ধ্যায় যুগযুগ-জাগ্রত ব্যাকুল অন্তর্বেদনার রসরহস্যের মধ্যে ডুব দিয়া কেবল কালিদাসের মেঘদূত নয়, বলরামদাসের এই কাব্যটিকে রবীন্দ্রনাথ এমন করিয়া স্মরণ করিতে পারিতেন।—

"কিন্তু একথা মনে হয়, আমরা যেন কোনো এক-কালে একত্র মানসলোকে ছিলাম, সেখান হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছি। তাই বৈষ্ণব কবি বলেন, তোমার 'হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির'। এ কী হইল। যে আমার মনোরাজ্যের লোক, সে আজ বাহিরে আসিল কেন। ওখানে তো তোমার স্থান নয়। বলরামদাস বলিতেছেন, 'তেঁই বলরামের, পহু, চিত নহে স্থির।' যাহারা একটি সর্ব্বব্যাপী মনের মধ্যে এক হইয়াছিল, তাহারা আজ সব বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাই পরস্পরকে দেখিয়া চিত্ত স্থির হইতে পারিতেছে না—বিরহে বিধুর বাসনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে। আবার হৃদয়ের মধ্যে এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু মাঝখানে বৃহৎ পৃথিবী।"

রবীন্দ্রনাথ কেবল একটু প্রভেদ করিয়াছেন; বলরাম বলেন, হিয়ার ভিতর হৈতে বাহির করায় তাঁহার প্রভুর চিত্ত স্থির নহে। রবীন্দ্রনাথ ঐ অস্থিরতা স্বয়ং বলরামের উপর চাপাইয়াছেন—'তেঁই বলরামের, পহু, চিত নহে স্থির।' এই সর্ব্বব্যাপী ব্যাকুলতার দিনে তুমি দূরে থাকিবে কেন, হে কবি, সরিয়া এস, মিশিয়া যাও, তোমার ও তোমার পহুর প্রাণ একসুরে কথা কউক—সব একাকার।

পদটিকে কোন্ রসের বলিব। এমন কিছু বৈষ্ণব পদ আছে যাহা কেবল রসের নয়, রসপর্য্যায়ের সর্ব্বজনীনত্ব লাভ করিয়াছে। অনেকগুলি রসপর্য্যায়ে তাহাদের স্থাপন করা যায়। এটি তেমন। তবে যদি এটিকে রসোদ্গারের পদ বলি—বলরাম যে রসোদ্গারের কবি। কিন্তু কৃষ্ণের রসোদ্গার হয় কি? সন্দেহ জাগিতে পারে পারে, ইহা রাধারই উক্তি, রাধিকার প্রতি পক্ষপাতের ক্ষালন করিতে কবি কৃষ্ণের বেনামীতে চালাইয়াছেন, কেননা রাধিকার রসোদ্গারের সাহত বক্তব্যে ইহার সমূহ ঐক্য। না, একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখিলে, ইহা কৃষ্ণেরই। আমরা বোধহয় বলরামের কৃষ্ণ-সম্পর্কে কিছু অবিচার করিয়াছি; মনে করিয়াছিলাম, রসোদ্গারের রাধিকা

তাঁহার প্রতি কৃষ্ণের প্রেমের গাঢ়ত্ব সম্বন্ধে যে সকল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই প্রাণের অনুরাগপথে নিঃসৃত হইয়াছে। বলরামের কৃষ্ণ ঐ প্রকার গভীর নহে। বলরামের কৃষ্ণের পক্ষে এই পদটি তদুত্তর। রসোদ্গারে রাধিকার উক্তি পুনরায় স্মরণ করিতে বলি: একই কথার ক্লান্তিহীন পুনরাবৃত্তি: "দীপ লৈয়া হাতে, মুখ নিরখিতে, তিতিল নয়ান লোরে"; "রাতদিন চোখে চোখে, বসিয়া সদাই দেখে, ঘন ঘন মুখখানি মাজে"; "উলটি পালটি চায়, সোয়াস্ত নাহিক পায়"; "জ্বালিয়া উজ্জ্বল বাতি, জাগিয়া পোহায় রাতি, নিদ নাহি যায় পিয়া ঘুমে"; "নয়ানে নয়ানে থাকে রাতি দিনে, দেখিতে দেখিতে ধান্দে, চিবুক ধরিয়া মুখানি তুলিয়া, দেখিয়া দেখিয়া কান্দে"; "সমুখে রাখিয়া মুখ নিরখয়ে, পরাণ অধিক বাসে"; ইত্যাদি।—এই যে বারে বারে দর্শন, এমন করিয়া রাধিকা কি দেখিতে পারে; তাহার তো রূপ নয়, রাগ। নাম শুনিয়াই পূর্ব্বরাগের দীক্ষা চণ্ডীদাসের নিকট পাইয়াছে। যে কথা কৃষ্ণের, তাহা একবার মাত্র রাধিকা বলিয়াছেন বিদ্যাপতির কাব্যে—"জনম অবধি হাম রূপ নেহারল, নয়ন না তিরপিত ভেল"; এখানে স্বরের উদ্দীপ্তিতে নারীকণ্ঠ ধরা পড়ে। পুরুষ প্রেমের কথা সচরাচর এমন উদ্দীপ্ত হইয়া বলে না। সাধারণতঃ তাহার স্বর আরো প্রৌঢ় এবং গম্ভীর। বিদ্যাপতির পদের আবেগোত্তেজনা বর্ত্তমান পদে নাই। ইহার প্রথম ও শেষ পঙ্‌ক্তিতে উত্তেজনার কথা মাত্র আছে। শেষ পঙ্‌ক্তির অস্থিরতা শুধু বিবৃতিতে—'চিত নহে স্থির'। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে রাধার কথা বলিতে গিয়া একই কথা কৃষ্ণকে দুইবার বলিতে হইয়াছে,—'তুমি মোর নিধি রাই, তুমি মোর নিধি',—যেন একবার কাঁপিয়া উঠিল, তারপর স্থির স্নিগ্ধ গভীর করুণ কণ্ঠ—প্রত্যেকটি শব্দ ধীরে উচ্চারণ করিয়া, তাহার দ্বারা আপন অনুভূতির চারিপাশে নিটোল রেখা টানিয়া, প্রেমের অপার সিন্ধুর মধ্যে সেই ভাবখণ্ডটুকু ছাড়িয়া দেন। পদটির বক্তব্যে সীমাহীন আকুলতা, ভাব ও স্বরে নিবিড় প্রশান্তি। এ তো সমুদ্র-পৃথিবীর মিলন নয় যে, তটের আঘাতে চাঞ্চল্য, এ আকাশ-সাগরের মালাবদল; অথবা তাহাও নয়, আকাশ নিভৃতি চাহিয়া, ঐ সায়রকে আকর্ষণ করিয়া উর্দ্ধে মৌন গিরিশিখরের স্তব্ধ প্রহরায় মানসসরোবরে মিলিতে চায়; যেন রাধিকার উৎসুক উন্নত মুখের উপর কৃষ্ণের নত নেত্র নামিতে নামিতে এক সময় স্থির হইয়া যায়, পরস্পরের দিকে চাহিয়া কৃষ্ণও তন্ময়, রাধাও তন্ময়—মুখে ভাষা নাই, প্রাণে কেবল তরঙ্গ—সেই অন্তরঙ্গ তরঙ্গধ্বনিকেই কবি যথাসম্ভব ভাষা দিয়াছেন। হেমন্তের রাত্রে শিশির ঝরার মত শব্দহীন শব্দ একটির পর একটি আসিয়াছে; 'জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান'—অনির্ব্বচনীয় স্বপ্নলোকের দ্বার খুলিয়া বলরাম প্রস্থান করিলেন। ইহাই তাঁহার চরম কাব্যসিদ্ধি।

শেখর

রসশেখরের লীলাবৈচিত্র্যের রূপরেখা আঁকিতে গিয়া বৈষ্ণব কবি ভণিতায় নাম-বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রলোভন দমন করিতে পারেন নাই,—কখনো শুধুই শেখর, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিশেখর, নব কবিশেখর, নৃপ কবিশেখর, রায়শেখর, শেখর রায়। এত নাম অথচ ব্যক্তি এক। শুনিতেছি, আসল নাম দৈবকীনন্দন সিংহ। দৈবকীনন্দন ভাগ্যবান ব্যক্তি, যেখানে ভণিতায় নাম এক থাকিতেও কবিব্যক্তিত্বে দ্বিত্ব ত্রিত্ব, চতুত্ব দেখিতে পাই, সেখানে ভণিতায় পার্থক্য, ভাষায় ভাবে ও ভঙ্গিতে পার্থক্য সত্ত্বেও কবি-অদ্বৈতের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। এবং দৈবকীনন্দন কেবল নিজ প্রতিষ্ঠাভূমি অর্জ্জন করেন নাই, সেই ভূমিতে দাঁড়াইয়া সাম্রাজ্যবিস্তারের বাসনাও রাখেন। এই 'ছোট বিদ্যাপতি' 'বড় বিদ্যাপতি'র প্রতি 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি' জাতীয় ধিক্কারের সহিত দু'একটি হৃতপদ পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও করিয়াছেন। 'এ সখি, হামারি দুখের নাহি ওর' পদটি বড়র নয়, ছোটর রচনা। শেখর অথবা রায়শেখর নামে সাধারণ্যে পরিচিত এই কবির সম্বন্ধে সাহিত্যের ঐতিহাসিকের মতামত সঙ্কলন করিতে পারি। ডঃ সুকুমার সেন বলিতেছেন: "যোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন ছিলেন কবিশেখর রায়। ইঁহার অনেকগুলি পদ এখন বিদ্যাপতির বলিয়া চলিতেছে। বাংলা ব্রজবুলি উভয়বিধ পদ রচনায় কবিশেখর প্রাবীণ্য দেখাইয়াছেন। 'কবিশেখর রায়' ইঁহার ছদ্মনাম।......আসল নাম দৈবকীনন্দন সিংহ। গোপাল বিজয় কাব্যে কবি এই আত্মপরিচয় দিয়াছেন।.....

"কবিশেখর সুশিক্ষিত কবি। ইনি সংস্কৃতে ও বাংলায় কাব্য নাটক পাঁচালী ও পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃতে লেখেন 'গোপাল চরিত' মহাকাব্য এবং 'গোপীনাথ বিজয়' নাটক আর বাংলায় লেখেন 'গোপালের কীর্ত্তন-অমৃত' অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ পদাবলী এবং 'গোপাল বিজয়' পাঁচালী।

"কবিশেখরের গাঢ়বন্ধ ব্রজবুলি পদগুলি বিদ্যাপতির পদের সমকক্ষ। সেইজন্য ইঁহার অনেকগুলি ব্রজবুলি পদ এখন বিদ্যাপতির নামে চলিতেছে। বিদ্যাপতির নামে অধুনা বিখ্যাত 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর'—এই উৎকৃষ্ট কবিতাটি কবিশেখরেরই রচনা। প্রচলিত পাঠের ভণিতা হইতেছে, 'বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া'। কিন্তু এখানে ভরা বাদল-নিশীথের কথা হইতেছে, 'দিন

রাতিয়া' আসে কোথা হইতে ? আসল শুদ্ধ পাঠ হইতেছে 'ভণয়ে শেখর কৈছে বঞ্চব সে হরি বিনু ইহ রাতিয়া'। পীতাম্বরদাসের অষ্টরসব্যাখ্যায় (সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ) এই পাঠই পাই। ইহার অপেক্ষা পুরাণো পাঠ পাওয়া যায় নাই।

"কবির বিদ্যাপতি-খ্যাতি আজিকার নয়। ইহার সংস্কৃত কাব্য নাটক এবং বাংলা-ব্রজবুলি পদ ইহাকে জীবৎকালেই যশস্বী করিয়াছিল। কবিশেখর নাম ইনি বোধ করি অল্প বয়সেই পাইয়াছিলেন।······ .

"কবিশেখর ও কবিরঞ্জন দুইজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি ধরিতে আমাদের আপত্তি আছে। দুই জনেই বৈদ্য, শ্রীখণ্ডবাসী, রঘুনন্দনের শিষ্য। দুইজনেই ব্রজবুলি পদ লিখিয়াছেন একই রীতিতে। এতগুলি কাকতালীয় যোগাযোগ বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে প্রামাণান্তর থাকিলে। কিন্তু সে প্রমাণই বা কই।"

শেখর-কবির বিষয়ে অনেকগুলি তথ্য পাইলাম। মোটামুটি সেগুলি মানিতে আপত্তি নাই। কেবল বিদ্যাপতি-সংক্রান্ত মতামত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। শেখর যদি 'ছোট বিদ্যাপতি' নামে নিজকালে খ্যাত হন, তবে ঐ খ্যাতি মূল বিদ্যাপতির সহিত কবিস্বভাবের ঐক্য সম্বন্ধে তাঁহার সমযুগের স্বীকৃতি দেখাইয়া দেয়। কিন্তু যেহেতু বিদ্যাপতির ছোট বড় ভেদ করা হইয়াছে, সে কারণে ঐকালে নিশ্চয় উভয়ের প্রতিভার সামর্থ্যগত ভেদ মানিয়া লওয়া হইত। একজন প্রাচীন, অন্যজন অর্ব্বাচীন, —শুধু এই জন্যই একজন 'বড়', অন্যজন 'ছোট', এইরূপ হয় না। প্রতিভায় বড়—সমকক্ষ পর্য্যন্ত হইলে—অভ্যুদয়কালে শেখর যে উপাধি পাইয়াছিলেন, তাহা পরিণত বয়সে খসিয়া পড়িত। অন্য বহু কবির ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছে। তাই সেযুগের রসবুদ্ধি অন্ততঃ "কবিশেখরের গাঢ়বন্ধ ব্রজবুলি পদগুলি বিদ্যাপতির পদের সমকক্ষ"—এই মত সর্ব্বাংশে গ্রহণ করে নাই।

অবশ্য কেবল সে যুগের বিচার ধরিব কেন, উভয় কবিকে তুলাদণ্ডে চড়াইবার অধিকার এ যুগের সমালোচকের নিশ্চয় আছে। এ যুগেও কি আমরা কবিশেখরকে বিদ্যাপতির সমকক্ষ বলিতে পারি ? মানিতে হইবে, কবিশেখরের কতক পদ বিদ্যাপতির কতক সাধারণ পদের তুল্য, এমন কি চৈতন্যোত্তর যুগের পরিচর্য্যায় স্থান-বিশেষে অধিক মার্জ্জিত মসৃণ। তথাপি প্রতিভার সমুন্নতির ক্ষেত্রে যখন আসি, দেখি, বিদ্যাপতির বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট পদের সহিত কবিশেখরের শ্রেষ্ঠ পদের কোনরূপ তুলনাই চলিতে পারে না। প্রশ্ন উঠিয়াছে বিদ্যাপতির একটি সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর পদ লইয়া। ঐ পদটি শেখরের প্রমাণিত হইলে বিদ্যাপতির মর্য্যাদাহানি অপেক্ষা শেখরের মর্য্যাদা-স্ফীতি বিপুল রকমের ঘটিয়া যায়। পদটিকে শেখরের বলিয়া প্রমাণ করা গিয়াছে কি ?

কবিধর্ম্মের পক্ষে ইহার অবিমিশ্র বিদ্যাপতিত্ব ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গে প্রদর্শন করিয়াছি। ডঃ সেনের মতামত এ ক্ষেত্রে অন্যভাবে যাচাই করা যাক। তিনি বলিয়াছেন, ইহার সর্ব্বপুরাতন পাঠে শেখরের ভণিতা আছে। যদি উহা সর্ব্বপুরাতন পাঠও হয়, তথাপি উহাই কি সর্ব্বপুরাতন উল্লেখ? পুঁথি অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন হইলে কি কাব্যেরও অর্ব্বাচীনত্ব স্বীকার করিতে হইবে? বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুঁথি কি বাংলার প্রাচীনতম কাব্য? "প্রচলিত পাঠকে" ডঃ সেন বাতিল করিয়াছেন আর একটি কারণে—কবিতার আভ্যন্তর প্রমাণে; ভরা বাদল নিশীথের কথায় "রাতিয়া গোঙায়বি" চলিতে পারে, "দিন রাতিয়া" নহে। সত্য নাকি? যেহেতু রাত্রির কথা হইতেছে, অতএব অসহ দিনযামিনীর কথা বলা চলিবে না, দিনটিকে সযত্নে বাদ দিয়া বিশুদ্ধ রাত্রির কথাই বলিতে হইবে? রাধিকার বিরহের যন্ত্রণা কি শুধু ঐ রাত্রির জন্য? এত খণ্ডিত, অব্যাপ্ত? দিনের কথা বলিলেই যদি অনৌচিত্য, তবে, অন্য কাব্যের কথা তুলিব না, এই কাব্যেই "ভুবনভরি বরিখন্তিয়া" একেবারে অচল; কারণ রাধিকার কি এইটুকু বোধবৃত্তি নাই যে তাঁহার ঘরের বর্ষাকে সমস্ত পৃথিবীর উপর অবলীলাক্রমে চাপাইলেন! আর যদি বলা যায়, প্রেমের আবেগে স্থান-কালে গোলমাল হইয়া গিয়াছে, তবে সেই গোলমালের মধ্যে "দিনরাতিয়া" এক স্বরে বলিলেই যত দোষ! বিপরীত পক্ষে, কাব্যের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে দেখিতেছি, প্রিয়-শূন্য মন্দিরের জন্য রাধিকার দুঃখ সমস্ত 'ভাদরের',—আর 'মাহ ভাদর' নিশ্চয় শুধু ভাদ্র রাতগুলি লইয়া নয়।

এই সকল কারণে বাঙালী কবির প্রতি আমাদের পক্ষপাত সত্ত্বেও মৈথিল কবির পদ হস্তান্তর সম্ভব বোধ করি না। শেখরকে প্রথম শ্রেণীর কবি বলিতেও বাধা আছে। তিনি বলরামদাসের সগোত্র না হইলেও স্বপঙ্‌ক্তির কবি, অর্থাৎ কাব্যের উচ্চ মধ্যবিত্ত।

বলরামের পদে আন্তরিক সরলতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার নানা প্রতিবেশ-রূপ পূর্ব্ব প্রবন্ধে লক্ষ্য করিয়াছি। শেখরকে আমরা চাতুর্য্যের কবি বলিতে পারি। অতি সরলার্থ বাক্যাংশও শেখরের কাব্যে সরল-ভাবার্থ নয়। সেই কারণে বৈষ্ণব কাব্যের কলাকুতূহল যে নবসৃষ্ট ভাষার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, শেখরের আত্ম-প্রকাশের ভাষাও সেই ব্রজবুলি। তবে শেখর বলরামের অননুরূপ রূপ-সাধনা করিয়াছেন বলিয়া বলরাম ব্রজবুলি পদে যেরূপ সাধারণভাবে ব্যর্থ, শেখর বাংলা পদে সেরূপ নন।

শেখরের ব্যক্তি-পরিচয়ে তাঁহার বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। সে মানস-

প্রকর্ষকে তিনি সর্ব্ববিধ পদপর্য্যায়ে নিয়োজিত করিয়াছেন। আবার প্রধান রসপর্য্যায়গুলি তাঁহার কাব্যপ্রেরণা নিঃশেষ করিয়া লইতে পারে নাই। কবি অপ্রধান রসপর্য্যায়ে প্রায়শঃ মনোযোগ দিয়াছেন। আমরা শেখরকে অপ্রধান রসপর্য্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি বলিতে পারি।

অপ্রধান রসপর্য্যায়গুলি কাব্যগ্রাহ্য হইবার কিছু কারণ আছে। প্রথমতঃ ইহাতে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি। পূর্ব্বরাগ, মিলন, মান, বিরহ, ভাবোল্লাসের রসসৌন্দর্য্য বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পর নিষ্কাশন করিতে একটু অধিক সাহসের প্রয়োজন। ঐ পথে স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে অগ্রসর হইবার শক্তি কেবল বৃহৎ প্রতিভা ও অল্পবুদ্ধি সাধুলোকের। শেখর কোনদলেই পড়েন না। তাই রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলায় বৈচিত্র্য এবং ব্যাপকতা সৃষ্টি করাই তিনি নিরাপদ ভাবিয়াছেন। গভীরে যেখানে প্রাণ-হরণ নয়, বিচিত্রে সেখানে মনোহরণ তো হয়। দ্বিতীয়তঃ এই সকল অনভিজাত রসপর্য্যায় সৃষ্টির দ্বারা রাধাকৃষ্ণের প্রেমে অধিক মানবিকতার সঞ্চার করা যায়। এবং বাস্তবিক এই সকল ক্ষেত্রে প্রাকৃত আলোবাতাস অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যলোকের বেষ্টনী ভেদ করিয়া রাধাকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শ বেশী পরিমাণে করিয়াছে। সব বৈষ্ণব কবিই মর্ত্ত্যজীবনের জবানীতে দিব্য জীবনবার্ত্তা নিবেদন করিয়াছেন। কিন্তু মানবরস গোপনের একটা চেষ্টাও দৃষ্টিগোচর হয়: কোথাও ভাববিহ্বলতার আতিশয্য, কোথাও অলঙ্করণের মণিদীপ্তি, কোথাও কলারসের অতি-সূক্ষ্মতা। অপ্রধান রসপর্য্যায়ের রাধাকৃষ্ণ সেরূপ নহেন। ইঁহারা মর্ত্ত্যলোকের এবং সেই মর্ত্ত্যের নানা পরিবেশে নিজেদের স্থাপন করিয়া জীবনরস উপভোগ করিতে চান। রাধিকা বা কৃষ্ণ গোবিন্দদাসের কাব্যেও গুরুজনদের ফাঁকি দিয়া পরস্পর মিলিত হইয়াছেন; কিন্তু সে যেন অলৌকিক সৌন্দর্য্যনিকেতনে। শেখরের কাব্যের ছলনা নিতান্ত লৌকিক।

প্রমাণ সন্ধানের চেষ্টা করা যাক। শেখর দেয়াসিনী মিলন, রাধাকুণ্ড মিলন, সূর্য্যপূজার ছলে মিলন, স্বয়ং দৌত্য, জলক্রীড়া প্রভৃতি বিষয়ে অনেক পদ লিখিয়াছেন। বৈষ্ণপদসুলভ গাঢ়বন্ধ লিরিক সৌন্দর্য্য ইহাদের মধ্যে সর্ব্বত্র মিলে না। খুঁটিনাটি বর্ণনা এবং কাহিনীসৃষ্টির দিকে কবির সমধিক আগ্রহ। খুঁটিনাটির প্রতি মনোযোগ অনেকাংশে মঙ্গলকাব্যজাতীয়। কাহিনীর ধারাবাহিকতাও পর্য্যায়গুলিতে রীতিমত রহিয়াছে। শেখরের রাধাকৃষ্ণলীলাত্মক কাব্য হইতে এই পদগুলি সংগৃহীত কি না বলিতে পারি না। যাহা হউক এক্ষেত্রে গুরুজনদের প্রবঞ্চনা করিয়া রাধাকৃষ্ণের মিলিত হইবার পদ্ধতি একেবারে পার্থিব। কবির মিলনোৎসুক রাধাকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ ও প্রতিবন্ধক গুরুজনদের প্রতি বিরাগ ছিল। অতএব নানা পদ্ধতিতে তাঁহাদের

বিভ্রান্ত করাইয়া অবৈধ মিলন ঘটাইয়া কবি যে কেবল কৃষ্ণরাধার সুখসাধন করিয়াছেন তাহা নয়, এক প্রকার কৌতুক স্বয়ং উপভোগ করিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দরের সুড়ঙ্গপথে গোপন মিলন এখানে শাশুড়ী-ননদিনীর নির্ব্বোধ সংশয়ের ভিতর সুড়ঙ্গ কাটিয়া ঘটিয়াছে।

শেখরের এই মানবজীবনপ্রীতি সর্ব্বাবস্থায় সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিতে পারে নাই। ইহার অসৌন্দর্য্যের ইতিহাস আমরা পরে বাল্যলীলা-অধ্যায়ে পর্য্যবেক্ষণ করিব। কিন্তু কবির সকৌতুক সুরসিক ও বিদগ্ধ মনের পরিচয় সম্পূর্ণ লওয়া হয় নাই। শেখরকে চাতুর্য্যের কবি বলিয়াছি। এই চাতুর্য্য অলঙ্কারের—ততোধিক ভাবভঙ্গির। কবি গভীর ভাবাবেগের উপর চপলতার পর্দ্দাটুকু দোলাইয়া দেন। বাহিরের হাসির ছটায় ভিতরের অশ্রুজল শেখরের কাব্যে প্রায়শঃ চাপা থাকে।

শেখর বিদ্যাপতিপন্থী বলিয়া তাঁহাতে আলঙ্কারিক চাতুর্য্যের সবিশেষ প্রাচুর্য্য। রসসৌন্দর্য্যে সচকিত দু' একটি অংশ :

হেমজ্যোতি বরততী তমালের গায়।
তাহা দেখি তরল আঁখি বক্র করি চায়॥
চন্দ্রমুখী ডাকি সখী বলে, দেখ কি।
কানু কোলে করি খেলে কোন্ রাজার ঝি॥

প্রথম পঙ্‌ক্তি পাঠ করিয়া পাঠকচিত্ত উল্লসিত হয়,—রাধাকৃষ্ণের মিলিত মূর্ত্তির এহেন "অনুপাম" উপমা—পল্লবিনী লতা আর সঞ্চারিণী নয়, হেমজ্যোতি ব্রততী বেষ্টনের তমাল খুঁজিয়া পাইয়াছে। হায়, তাহা নয়। আমরা ভাবিয়াছিলাম কৃষ্ণ-রাধা, শ্রীরাধা ভাবিয়াছেন কৃষ্ণ ও অন্য নায়িকা,—শেখর এই বিভ্রমে হাসিয়া অস্থির :

শেখর কবি কহে হাসি ধনী অগেয়ান।
তমাল কোলে লতা দোলে আনে কহে আন॥

বিপরীতের চমক নহিলে স্বাভাবিকের রস পাইনা, তাই রাধা বা কৃষ্ণের মাঝে মাঝে ঐরূপ ভুল হয়; প্রকৃতির মধ্যে প্রিয়-সৌন্দর্য্যের নিত্য উপমান খুঁজিবার এই একটু বিপদ :

দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ধন্দ।
রাই কহে তমাল মাধব কহে চন্দ॥ (অজ্ঞাত)

আবার অন্য বিপদও আছে। সুন্দর-সুন্দরী দেখিয়া মুগ্ধ চিত্তে উপমা সন্ধানের একটা অভ্যাস আমাদের আছে এবং সেই মুগ্ধতা বাড়িতে বাড়িতে যখন চিত্তের বড় বিগলিত অবস্থা, তখন রূপ রূপক হইয়া পড়ে, তখন আর উপমেয় উপমানে ভেদজ্ঞান থাকে না।

কিন্তু সে তো আমাদের নিকট, উপমেয়রও কি ঐ অবস্থা হয়—না কি? কেবল হয় না। হওয়ার সমূহ বিপদও ভোগ করে:

নিজ করপল্লবে অঙ্গ না পরশই
শঙ্কই পঙ্কজ ভাণে।
মুকুরতলে নিজ মুখ হেরি সুন্দরী
শশী বলি হরই-গেয়ানে॥

চন্দ্র-দর্শনে বিরহের বৃদ্ধি, তাই বলিয়া রাধিকা যদি দর্পণে নিজ মুখদর্শন পর্য্যন্ত না করিতে পারেন তো কবির বিরুদ্ধে রাধিকাকে চন্দ্রমুখী বানাইয়া যন্ত্রণা দিবার অভিযোগ আসিবে।

বাঁশী বাজে। কে বাজায় কবি যেন সে প্রশ্নের উত্তর দিতে উৎসুক নন। ঐ "বাঁশী বাজে" কথাটিকে তিনি আক্ষরিক ভাবে লইয়াছেন—কিরূপে বাজে, অনবদ্য ধ্বনিগুণের সহিত তাহার ছন্দটুকু তুলিয়া ধরিতে তাঁহার যত চেষ্টা: বড় সফল চেষ্টা:

পরম মধুর মৃদু মুরলী বোলায়ত
অধর সুধাধরে ধরিয়া।

গুরুত্বপূর্ণ রসপর্য্যায়গুলি যদি গ্রহণ করি, সেখানেও শেখর অশ্রু-হাসিতে মাখা, লাবণ্যে টলটল, কৌতুকে উজ্জ্বল—কিন্তু বেদনায় মন্থর বা গভীরতায় স্থির কদাচিৎ। যেমন পূর্ব্বরাগে -ভাষার কি রঙ্গলীলা:

রহ রহ সখি ভাল করে দেখি
আঁখি না পিছলে মোর।

কৃষ্ণের চিত্রপট দেখিয়া রাধিকার বড় অনুরাগ। রাধিকা বলিতেছেন,—'আঁখি না পিছলে মোর'- কেন? সখী একবার দেখাইয়াই চিত্র সকৌতুকে গোপন করিতেছে, এই কারণে, না কৃষ্ণের কৈশোর তনু এমন তরল-মসৃণ যে আঁখি বসে না। কৃষ্ণ-কান্তি রাধিকার ঐ লীলায়িত নিষেধটুকু ছাড়া আর কিসে এভাবে ফুটিত? পদটির সমাপ্তি অবশ্য অশ্রুপূর্ণ তন্ময়তায়—লাবণ্যতরঙ্গিণী হইতে অশ্রুসমুদ্রে পড়িয়া ভাসিতে ভাসিতে নয়নতারা নয়নতরী—একসময় স্থির হইয়াছে।

আক্ষেপানুরাগের একটি পদে পরম দুঃখার্ত্ত চিত্তে রাধা আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন, জানিনা 'কি গুণে বাড়াইলা, কি দোষে ছাড়াইলা নবীন পিরীতি খানি',—যখন সুদিন ছিল ভালবাসিতে, আজ সে ভালবাসা নাই অথচ ভালবাসার স্মৃতি আছে,—'শঙ্খ-বণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে'। এরূপ দুঃখ রাধিকা কোন একটি পদে

খানিক করেন বটে, কিন্তু পরেই ঐ অক্ষেপ অন্য একটি পদে ব্যঙ্গের জ্বালা লইয়া ফুটিয়া ওঠে :

সেকাল গেল বৈয়া বন্ধু সেকাল গেল বৈয়া।
আঁখি ঠারাঠারি মুচকি হাসি
কত না করিতে বৈয়া ॥
বেশের লাগিয়া দেশের ফুল
না রহিত কিছু বনে।
নাগরীর সনে নাগর হৈলা
আর বা চিনিবা কেনে ॥

অনুভূতি যখন অতিগভীর নয়, আর বিচ্ছেদকে নায়কের ইচ্ছাকৃত অবহেলা ও প্রবঞ্চনা মনে হয়, তখন মনোভাবের অব্যর্থ প্রকাশ শ্লেষে। অথচ ভাষায় যে আলোটুকু দেখিতেছি, তাহা দুঃখের টলটল অশ্রুর উপর ফুটিয়া আছে।

মিলন-রজনীর পরবর্তী প্রভাতচিত্র কবি আঁকিতেছেন; গত রজনীর পানপাত্রের অবশেষ পুনরায় ঢালিয়া দিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই। অতিশয্যহীন বর্ণনায় এমন একটা স্নিগ্ধতা আছে যা প্রভাতের অনুরূপ :

দশদিশ নিরমল ভেল পরকাশ।
সখিগণ মনে ঘন উঠয়ে তরাস ॥
আম্রে কোকিল ডাকে কদম্বে ময়ুর।
দাড়িম্বে বসিয়া কীর বোলেয়ে মধুর ॥
দ্রাক্ষাডালে বসি ডাকে কপোত কপোতী।
তারাগণ সহিতে লুকায় তারাপতি ॥

আমরা বৃন্দাবনে কিরূপ দ্রাক্ষা ফলে সে কূট প্রশ্ন করিব না, রাই-এর প্রতি শারীর প্রীতি সত্য বলিয়াই মানিব, কিন্তু সবচেয়ে উপভোগ করিব কৃষ্ণের প্রতি কবির পরিহাসটুকু, বড় স্নিগ্ধ, বড় মনোরম; নাম-ঐক্যের সুযোগ লইয়া কবি কৃষ্ণের মিতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন :

শেখর শেখরে কহে হাসিয়া হাসিয়া;
চোর হয়ে সাধুপারা রহিলে শুতিয়া ॥

ইহারও উপরে আছে। রাধিকার সরম ও সুখ, কোপ ও ক্ষোভটুকু কবি একবার যে ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—সে রসিকতার তুলনা হয় না; এ রসিকতা বাক্যগত নয়, ভাবগত—চারি পঙ্‌ক্তিতে একটি নিটোল রসচিত্র :

আর একদিন সিনানে যাইতে
আঁচল ধরিল মোর।
তথা দুই চারি নাগরী আছিল
হাসিয়া হইল ভোর॥

শেখরের প্রতিভাস্ফূর্তির যোগ্যভূমি সম্বন্ধে মনে প্রশ্ন জাগিবে। কোনো বিশেষ পদপর্য্যায়ে নয়,—সকল পর্য্যায়েই শেখরের রসপূর পদ রহিয়াছে—সাধারণভাবে চিত্ররস সৃষ্টির ব্যাপারে কবি সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। এই চিত্রাঙ্কনদক্ষতা কোথাও বিরলবর্ণে উদ্দিষ্ট বস্তুটিকে ফটোগ্রাফিক স্পষ্টতা দিয়াছে, কোথাও ধ্বনি ও ভাবরস যুক্ত হইয়া কল্পনাভরে কাঁপিয়াছে। বাস্তব অথবা অবাস্তব—শেখরের চিত্রে ইন্দ্রিয়ের উপভোগ কোথাও উপেক্ষিত হয় না। এইরূপ চিত্র শেখরের কাব্যের সর্ব্বত্র। পূর্ব্বে তাঁহার যে মানবিকতার কথা বলিয়াছি, তাহাই অবাস্তব রমণীয়লোকে "অসম্ভবচিত্রিত লতার উপরে অসম্ভবচিত্রিত পক্ষিখচিত শ্বেতপ্রস্তররচিত কক্ষপ্রাচীর মধ্যে" আত্মনির্ব্বাসন বরণ করিতে বাধা দিয়াছে। আমরা সেই নানারূপী চিত্র-পরিচয় অল্পস্বল্প গ্রহণ করিব।

বাস্তব হইতে তুলিয়া আনিয়া কাব্যে নিবেশিত করিলে যাহা হয়:

দণ্ডবৎ করি মায় চলিলা যাদব রায়
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গোখুর-রেণু
সুর নর হরষিত মন॥
আগে আগে বৎসপাল পাছে ধায় ব্রজবাল
হৈ হৈ শবদ ঘন রোল।
মধ্যে নাচি যায় শ্যাম দক্ষিণে শ্রীবলরাম
ব্রজবাসী হেরিয়া বিভোর॥

আর একটি পদ, সম্ভবতঃ শেখরের, চিত্ররূপে অধিকতর সার্থক:

বরজে পড়িল ধ্বনি শিঙ্গা বেণু রব শুনি
আগে ধায় গোধনের পাল।
গোঠেরে সাজিল ভাইয়া যে শুনে সে যায় ধাইয়া
রহিতে না পারে কেহ ঘরে॥
শুনিয়া মুখের বেণু মন্দ মন্দ চলে ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে।

নাচিতে নাচিতে যায় নূপুর পঞ্চম গায়
পাঁচনি ফিরায় শিশুগণে ॥

শেখর একশ্রেণীর চিত্ররসাত্মক পদে সত্যকার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত direct উপায়ে ইন্দ্রিয়মুখী সৌন্দর্য ও পরিবেশ বর্ণনা করিতে পারেন। ভাষা সরল ও ঋজু, পঙ্‌ক্তি স্বল্পাক্ষর, অলঙ্কারাদি প্রায়শঃ বৰ্জ্জিত। কোথাও এই সকল চিত্র সনেটের সংক্ষিপ্তি ও গাঢ়বন্ধতা পাইয়াছে, কোথাও তাহা বর্ণনা-বিষয় অনুযায়ী পদকাব্যের পক্ষে ঈষৎ দীর্ঘ। জলক্রীড়া বা নৌকালীলার কিছু পদ এই দিক দিয়া অনবদ্য। আধুনিক প্রেমকাব্যে প্রত্যক্ষ বর্ণনায় স্পন্দন-সৃষ্টিকারী কবিত্বের পূর্ব্বসূচিত্ব :

জলকেলি সাধে। চলু ধনী রাধে ॥
উতরল তীরে। পহিরল চীরে ॥
যুবতী সমাজে। শোভে যুবরাজে ॥
সরসি সলিলে। পৈঠলি শিলে ॥
করিণীর সঙ্গে করিবর রঙ্গে ॥
দুহুঁ দুহুঁ মেলি। করু জল কেলি ॥
সখিগণ নিপুণা। বেঢ়ল হঠিনা ॥
কেহ দেই নীরে। কেহ লেই চীরে ॥
কেহ দেই তালি। কেহ বলে ভালি ॥
কানু মুখ মোড়ি। জল দেই জোরি ॥
কেহ কেহ হারি। কেহ দেই গারি ॥
ভাগি ভাগি দূরে চমকি নেহারে ॥
কানু করে বেঢ়ি। ধরল কিশোরী ॥
সলিল অগাধা। লেই চলু রাধা ॥
কানুক অঙ্গে। ভাসত সঙ্গে ॥
পাতল চীরে। বেকত শরীরে ॥
নিরখিতে কান। হানে পাঁচবান ॥
ধনী করি বুকে। চুম্ব দেই মুখে ॥
ধনী কুচ জোড়া। হাস দেই মোড়া ॥
হরি পুরি সাধা। আনলি রাধা ॥
রাখলি তীরে। অলপহি নীরে ॥

এবং আর একটি, উৎকর্ষে কিঞ্চিৎ ন্যূন :

চললি নিতম্বিনী যমুনা সিনানে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী গজগতি ভানে ॥
তৈল হলদি কোই আমলকি নেল।
সুবরণ ঘট লেই কোই চলি গেল ॥
জানি নাগরবর চলু ধীরে ধীরে।
আগুসরি আওল কালিন্দীতীরে ॥
একলি কানু খেলই জলমাহি।
সহচরী সনে ধনী মিলিলি তাহি ॥
আন জন কোই নাহি তব সাথ।
নাগর হেরি ধূনায়ত মাথ ॥
কাহুক জল দেই কাহুক পঙ্ক।
কাহুক চুম্বই ধাই নিঃশঙ্ক ॥
হেরি সব সহচরী চমকিত ভেল।
ঝটিতহি ধাই রাই লেই গেল ॥
কণ্ঠমগন জলে দুহুঁ একঠাম।
পূরল দুহুঁক মনোরথ কাম ॥

নৌকালীলায় বড়ই কবিত্বের অবকাশ। সুন্দরী রমণীরা একতালে নৌকা বাহিতেছে—সেই তাল পড়ে আর কবির হৃদয় তোলপাড় করে ; সব কবির এক দশা। তাহার মধ্যে শেখরের এই অংশ :

নবীন গোপিনী সারি হাতে কেরোয়াল করি
তরণী বাওই অবিরাম ॥
ঝমকি ঝমকি পড়িছে কেরোয়াল
রঙ্গিণীগণ চারু কঙ্কণ বাজে।

শ্রীকৃষ্ণ একদা নারীর জটিল মনস্তত্ত্ব লইয়া বড় বিব্রত বোধ করিয়াছেন,—রাধার ঔৎসুক্যের সীমা নাই অথচ সরমের বাধা টুটে না ; কৃষ্ণ আগ্রহ দেখিয়া অগ্রসর হন, আবার প্রতিক্রিয়ায় প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসেন—'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়, একি তোর দুস্তর লজ্জা' :—

হামে দরশাইতে কতহুঁ বেশ করু
হামে হেরইতে তনু ঝাঁপ।

সুরত শিঙ্গারে আজু ধনী আওলি
পরশিতে থরহরি কাঁপ ॥

আকর্ষণ-বিকর্ষণের আবর্তে পড়িয়া কানু অস্থির, নারীর অর্দ্ধেকটুকু কল্পনা, কিন্তু সে যে এত বড় দুরূহ কল্পনা, কে জানিত :

সকল কাজ হাম বুঝলুঁ বুঝায়লুঁ
না বুঝলুঁ 'অন্তর নারী।

ছোট বিদ্যাপতি বড় বিদ্যাপতিসুলভ এই ভঙ্গি ও ভাষায় তাঁহার বিস্ময়টুকু প্রকাশ করিয়া যদি ক্ষান্ত হইতে পারিতেন। শেখরের মধ্যে একজন কবিচাতুরীর রসিক, আভাসে-ইঙ্গিতে ঠারে-ঠোরে কথা বলিতে ভালবাসেন, অন্যজন কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা পছন্দ করেন না, তাঁহার আহ্বান প্রত্যক্ষ, ভাষায় ছলাকলা নাই, উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট। রাধিকার মান হইয়াছে, কৃষ্ণ সম্ভবতঃ কিছুক্ষণ মানভঙ্গের চেষ্টায় ছিলেন, তারপর ব্যর্থ হইয়া প্রেমের সোজা কথাটা সোজা ভাষায় খুলিয়া ধরিলেন :

তুহুঁ না পরশ যদি মোয়।
পিরীতি কৈছে তব হোয় ॥
ইথে লাগি শরণ তোহোরি।
মানহ পরশ হামারি ॥

আধুনিক কাব্যরসিকেরা প্রেমকাব্যে আর মণ্ডন-বিলাস পছন্দ করিতেছেন না। 'হৃদয়ের দব্‌দবানি' তাঁহারা বড়ই আকাঙ্ক্ষা করেন। শেখরের পূর্ব্বোদ্ধৃত পদগুলি তাঁহাদের তৃপ্তি দিবে ; নিম্নোক্ত অংশটুকুও :

কুসুমিত কুঞ্জে। অলিকুল গুঞ্জে ॥
মলয় সমীরে। বহে ধীরে ধীরে ॥
রসবতী সঙ্গে। রসময় রঙ্গে ॥
ধনী করি বুকে। শুতলি সুখে ॥
ধনী কুচ কলসে। ঘুমল আলসে ॥

শেখরের চিত্ররস-প্রীতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসাবে রূপানুরাগ ও অভিসার গ্রহণ করা যায়। চিত্ররসিক যিনি, তিনি স্বভাবতঃ রূপরসিক। সে কারণে রূপানুরাগের অন্তর্ভুক্তি বুঝি, কিন্তু অভিসার? অভিসারে যে চিত্তবল, চলৎশক্তি প্রধান। আবার শেখর অভিসারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। এই স্থানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে, শেখরের অভিসার গোবিন্দদাস-গোত্রীয় নয়। গোবিন্দদাসের অভিসারেও রূপ আছে। কিন্তু সে চলিষ্ণু রূপ। শেখর অভিসার বাদ দিয়া অভিসারিণী নারীটিকে

দেখিয়া এবং আঁকিয়া বিভোর। শ্রীচৈতন্যের দুঃখ-দুর্গম কৃষ্ণ-লক্ষ্য পথাতিক্রমের পটভূমিকায় বৈষ্ণব যুগে যথার্থ অভিসার বলিতে যাহা বুঝি, শেখরের সেরূপ পদ আছে কিনা সন্দেহ। অভিসারের ভূমিকায় স্থাপন করিয়া রাধার বিমোহন রূপ-রসাস্বাদই কি কবির অভিপ্রেত নয়? অভিসারের পদ উদ্ধৃত করিলে ইহা প্রমাণিত হইবে। তৎপূর্ব্বে রূপানুরাগের পদগুলি লক্ষ্য করিব। কবির রূপানুরাগ খোলে কোথায়?—যদি রাধার রূপ হয় কৃষ্ণ দেখে, যদি কৃষ্ণের রূপ হয় রাধা দেখে; যদি মিলিত রূপ হয়, তবেই কবির দেখা,—রাধার চোখে কৃষ্ণকে বা কৃষ্ণের চোখে রাধাকে নয়,—স্বচক্ষে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি। কবি বারবার যুগলমূর্ত্তি নিরীক্ষণের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই। তার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ দর্শন এইরূপ :

হিরণ কিরণ আধ বরণ
আধ নীলমণি জ্যোতি।
আধ গলে বন- মালা বিরাজিত
আধ গলে গজমোতি॥
আধ শ্রবণে মকর কুণ্ডল
আধ রতন ছবি।
আধ শিরে শোভে ময়ূর শিখণ্ড
আধ শিরে দোলে বেণী॥
কনক কমল করে ঝলমল
ফণী উগারয়ে মণি।

বিশ্বনাগরিক শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়া-নাগররূপে শেখরের রূপ-পিপাসা মিটাইয়াছেন :

উরসি পর নানা মণিহার
মকর কুণ্ডল কানে।
মধুর হাসনি তেরছ চাহনি
হানয়ে মরম বাণে॥
বিনোদ বন্ধন দুলিছে লোটন
মল্লিকা মালতী বেড়া।
নদীয়া নগরে নাগরীগণের
ধৈরয ধরম ছাড়া॥

শেখরের রূপানুরাগের শ্রেষ্ঠ অংশ বোধ হয় অভিসার। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শেখরের অভিসারে গতি নাই, তাহা পরিবেশ পরিবর্ত্তনে রূপ-সম্ভোগের স্বাদসুখ। কথাটি একটু

সংশোধন করিব; অভিসারে যদি গতির বাস্তব বিবৃতি না থাকে, তথাপি একটা মানসিক গতি আছে। সেই মানস বেগই এই চিত্রগুলিতে অতিরিক্ত প্রাণ-সংযোগ করিয়াছে।

গতির যে বাস্তব বিবৃতি নাই, তাহা শেখরের অভিসার-পদ পরীক্ষা করিলে বোঝা যায়। অভিসারের ভাব আছে অথচ যথার্থতঃ রূপানুরাগের পর্য্যায়ে পড়ে এরূপ একটি পদে রাধিকার বর্ণনা :

চলিতে না পারে যৌবন ভরে।
ধাধসে ধরিল সখীর করে॥
নবীন কামিনী কনকলতা।
এ তিন ভুবনে তুলনা কোথা॥

যৌবনভারনত রাধিকার ছবি। 'পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা'র পাশে এ চিত্র তরল। আমাদের প্রয়োজন কেবল ঐ কথাটিতে -'চলিতে না পারে যৌবন ভরে'। শেখরের অভিসারের রাধিকা কোনমতে চলিতে পারে নাই, যাত্রার প্রস্তুতি মাত্র করিয়াছে, আর শেখর সেই আকর্ষিত চাঞ্চল্যের রূপটি প্রাণভরে দেখিয়াছেন। যেমন বৈষ্ণব কাব্যে বিরল কৃষ্ণের অভিসারের একটি চিত্র :

জানল ঘর পর নিদেঁ ভেল ভোর।
শেজ তেজি উঠি নন্দকিশোর॥
সঘন গগনে নখতর পাঁতি।
অবধি না পাওত ছুটত রাতি॥
জলধর রুচিহর শ্যামর কাঁতি।
যুবতীমোহন বেশ ধরু কত ভাতি॥
ধনী অনুরাগিণী জানি সুজান।
ঘোর আন্ধিয়ারে তব করল পয়ান॥
পরনারী পিরীতিক ঐছন রীত।
চললি নিভৃত পথে না মানয়ে ভীত॥

রাত্রির স্তব্ধগম্ভীর মূর্ত্তি সংক্ষেপে অতি চমৎকার। তদুপরি আর একটি প্রায় অপরিচিত বার্ত্তা—প্রেমাবেগে কৃষ্ণের নিশীথ শয়নেও টান পড়ে, তাঁহাকে রাধিকারই মত ছুটিয়া বাহির হইতে হয়। আমরা জানি, রাধিকাই কেবল "ঘর কৈনু বাহির" কিন্তু যাঁহার আকর্ষণে ঐ কুলনাশী ব্যাপারটুকু ঘটে তিনিও যে "বাহির কৈনু ঘর"—সেই বিপরীত পক্ষটি আমাদের দৃষ্টি যেন এড়াইয়া যায়। কবি দৃষ্টির পক্ষপাত দূর করাইবার প্রচেষ্টায় ধন্যবাদের পাত্র।

কিন্তু আমাদের আলোচ্য যে বিষয়—সংবাদ শুনিলাম, শ্রীকৃষ্ণ নির্ভয় হৃদয়ে অভিসার করিয়াছেন;—কিরূপে? জানি না। কবি সেকথা জানান নাই। আর একটি উৎকৃষ্ট অভিসারের পদ—সিদ্ধ ধ্বনিমন্ত্রে যাহার সূচনা—

কাজর রুচিহর রজনী বিশালা।
তছুপর অভিসার করু ব্রজবালা॥…
উনমতি চিত অতি আরতি বিথার।
গুরুয়া নিতম্ব নব যৌবনভার॥
কমলিনী মাঝে খিনি উচ কুচজোর।
ধাধসে চলু কত ভাবে বিভোর॥…
অঙ্গক আভরণ বাসয়ে ভার।
নূপুর কিঙ্কিণী তেজল হার॥
লীলাকমল উপেখলি রামা।
মন্থরগতি চলু ধরি সখী শ্যামা॥

কয়েকবার চলার কথা বলা হইয়াছে বটে কিন্তু সে শুধু বক্তব্যে, রাধিকার পক্ষে চলা যে অসম্ভব কবি তাহাই ভাবে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। পথের নানা বিঘ্নের জন্য রাধিকার গতি-নিবারণ নয়,—গোবিন্দদাসের রাধিকা তো বাঁধনকে সাধন করিয়াছে—কণ্টক নয়, কর্দ্দম নয়, বিষধর অথবা বিষদৃষ্টি গুরুজন কিছুই নয়—রাধিকার যৌবন-পুঞ্জিত লাবণ্যমণ্ডিত দেহই চলিবার পক্ষে পরম প্রতিবন্ধক। কবি যৌবনভারাতুর রাধিকাকে পথে নামাইয়া যেন কৌতুকভরে—ততোধিক সতৃষ্ণ নয়নে—চাহিয়া আছেন; এ দেহ স্থির থাকিয়া কবিকে রূপতৃপ্তি দিয়াছে, যদি অস্থির রূপে তাঁহার সৌন্দর্য্যপিপাসা অধিকতর চরিতার্থ করে। নচেৎ এক পঙ্‌ক্তিতে বলিতেছেন,—'উনমতি চিত অতি আরতি বিথার'—পরের পঙ্‌ক্তিতে এই বলিয়া প্রমাণ করেন যে, তৎসত্ত্বেও চলা কঠিন—'গুরুয়া নিতম্ব নব যৌবনভার'? বলিলেন বটে—'ধাধসে চলু কত ভাবে বিভোর' কিন্তু পূর্ব্ব পঙ্‌ক্তি পাঠ করিলে তাহা যে বিশ্বাসযোগ্য নয় বুঝিতে পারি—'কমলিনী মাঝা খিনি উচ কুচজোর।' যৌবনভারের সঙ্গে ছিল অলঙ্কারভার—নূপুর কিঙ্কিণী হার লীলাকমল সব ত্যাগ করিয়াও হায়, পদের শেষে দেখি 'মন্থর গতি চলু ধরি সখি শ্যামা।' ইহা কিরূপ অভিসারের পদ?

এইবার শেখরের ও তৎসহ সমগ্র বৈষ্ণব কাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ অভিসারের পদ উদ্ধৃত করি:

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পতন শবদ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই ॥
সজনি আজু দুরদিন ভেল।
হামারি কান্ত নিতান্ত আগুসরি
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল ॥
তরল জলধর বরিখে ঝরঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর ॥
সোঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থর থর কাঁপ।
মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ ॥
তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ
জীবন মঝু আগুসার।
রায় শেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার ॥

পদটির কাব্যসৌন্দর্য্য অধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। ইহা সত্যসত্যই অভিসারের পদ। অভিসারের ছদ্মবেশে রূপানুরাগের নয়। এখানে আমরা রাধিকা বা কৃষ্ণের রূপের কোন বর্ণনা পাই না। পদটি সমগ্রতঃ রাধিকার মানস-অবস্থার প্রকাশ। এবং সেই মন যাহা প্রিয়জনকে ঝঞ্ঝাশিরে অগ্রসর দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। অভিসারের প্রাণাবেগ ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে অনুভূত এবং সেই আবেগ একটি পঙ্ক্তিতে সংহত হইয়া বিরল কবিবচনের রূপ ধরিয়াছে—"তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ জীবন মঝু আগুসার।" ইহাতে ধ্বনিগুণ প্রভৃত ও বর্ষার পটভূমিকায় রচিত অন্যান্য উত্তম বৈষ্ণব পদের সহিত সমকক্ষতা দাবী করিতে পারে।

এই সকল কথা সত্য এবং যেখানে জীবন আগুসার সেখানে দেহ চলিল কি না তাহা বিচার্য্য নয়, কারণ যথার্থতঃ মনই চলে। তথাপি বৈষ্ণব অভিসারের পদে একটা বাহ্য পথচলার ইতিহাস আছে। সেটুকু বিস্মৃত হওয়া যায় না। তীব্র মানস-

গতি যদি তীব্র দেহগতির মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া না যায়, তবে উহা অন্য পদপর্য্যায়কে অলঙ্কৃত করিলেও যথাযথ অভিসারের পদ হয় না। এ ক্ষেত্রে কি "ত্বরিতে চল অব" —শুধু এইটুকুই পাই না? মন চলিলেও শেখরের কাব্যে দেহ চলিতে চায় না, অর্থাৎ শেখর পূর্ণাঙ্গ অভিসারের কবি নহেন। বর্ত্তমান পদটিতে চিত্ররসে একটু অধিক পরিমাণে ভাবরসের মিশাল ঘটিয়াছে এই পর্য্যন্ত।

সর্ব্বশেষ প্রসঙ্গরূপে শেখরের বাল্যলীলা ও বাৎসল্যরসের আলোচনায় আসিতে পারি। এই ক্ষেত্রে তিনি অন্যতম বিশিষ্ট কবি বলিয়া খ্যাত। কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য পদ সে খ্যাতি সমর্থন করিবে। চিত্ররসের দৃষ্টান্ত হিসাবে পূর্ব্বোদ্ধৃত কৃষ্ণাদির গোষ্ঠ-গমনের চিত্রটি স্মরণ করিতে বলি। "জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর" কৃষ্ণকে "ভায়্যা ভায়্যা" বলিয়া ডাকিতে শুনিয়া বৈষ্ণবের কী সুখ। অন্য একটি পদে প্রভাত চিত্র—চন্দ্রাস্ত এবং সূর্য্যোদয়—সখারা গৃহদ্বারে অথচ কৃষ্ণ নিদ্রাচ্ছন্ন—যশোদার কৃষ্ণকে ডাকিবার ভঙ্গিটুকু অবিকল বাঙালী গৃহজীবন হইতে উদ্ধার করিয়া কবি পরিশ্রম বাঁচাইলেন:

কাহে নাহি ভাঙত নয়ানক ঘুম।
আওত ব্রজশিশু করতহি ধূম॥

একটি পদে শয্যা ছাড়িয়াই গত রাত্রির শেষ স্মৃতি চন্দ্রের জন্য কৃষ্ণের কান্না। ইহাতে মাধুর্য্য সৃষ্টির চেষ্টা আছে। অবশ্য এ বিষয়ে তুলনীয় একটি শাক্ত পদ কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট।—

অতি অবশেষ নিশি
গগনে উদিত শশী—
　　বলে উমা ধরে দে উহারে।……
আমি কহিলাম তায়
চাঁদ কিরে ধরা যায়।
　　ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে॥

প্রভাতে উঠিয়া চাঁদের জন্য কৃষ্ণের কান্নায় কবিচাতুরীই অধিক। ইহাতে বাস্তবরস নাই। কিন্তু উমা গগনাঙ্গনে সদ্য চন্দ্রোদয় দেখিয়া তবে চাঁদ ধরিতে চাহিয়াছে। তমিস্রালুপ্ত আকাশপ্রান্ত উদ্ভাসিত করিয়া সহসা চন্দ্রোদয় এবং তাহা দেখিয়া ঐ দুর্ল্লভ বস্তুটির জন্য—বিনিদ্র দুরন্ত কন্যাটির অস্থির আকাঙ্ক্ষা—ইহাতে পরমাশ্চর্য্য রসসৃষ্টি। যদুনাথদাসের যশোদা যখন বলেন, "চাঁদ মোর চাঁদের লাগিয়া কান্দে"—তখন সেখানেও কোন অস্বাভাবিকত্ব নাই, কারণ আকাশের চাঁদ ও কোলের চাঁদকে এক করিয়া যাহা দেখিয়াছে, তাহার নাম মাতৃহৃদয়—তাহা ঐরূপই

দেখে। বলরামদাসের অনুরূপ একটি পদে শেখর মাতৃচিত্তের আর্ত্তিকে সরল ও মর্ম্মস্পর্শীরূপে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন :

রাম পানে চায় রাণী গোপাল পানে চায়।
কি বলে বিদায় দেব মুখে না বাহিরায়॥
সকালে আসিহ গোপাল ধেনুগণ লইয়া।
অভাগিনী রইল তোর চাঁদমুখ চাহিয়া॥

"রাণীর চরণধূলি সভে লইয়া শিরে" যখন বাহির হইয়া পড়িল তখন শেষ পঙ্‌ক্তিতে শেখর তাঁহার মানবরস এবং বস্তুপ্রীতির পরিচয়টি শেষ বারের মত জানাইয়া দিলেন :

শেখর কহয়ে হিয়া সংবরিতে নারে।
(রাণী) পাছু পাছু গমন করিল কতদূরে॥

এতৎসত্ত্বেও শেখরের বাল্যলীলা ও বাৎসল্যের পদ সম্বন্ধে একটু গুরুতর আপত্তি উত্থাপন করিব। শেখর তাঁহার বাল্যলীলার পদগুলিতে একটু অধিক পরিমাণে আদিরস ঢালিয়াছেন। বাল্যলীলা বলিতে আমি গোষ্ঠলীলা পর্য্যন্ত ধরিয়াছি। রাধাকৃষ্ণের প্রেম স্বরূপতঃ না হইলেও নামতঃ কিশোর-কিশোরীর প্রেম। অতএব গোষ্ঠগত কৃষ্ণ-রাধার প্রণয়লীলা প্রদর্শন অনুচিত নয়। আমরা তাহা মানি। যখন বৃন্দাবনের কিশোর রাখাল ও কিশোরী রাজকুমারীর মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের পালা চলে,—তাহা যদি নিভৃতে ঘটে তবে আপত্তি করি না,—কিন্তু ঐ প্রণয়লীলায় কৃষ্ণ-সখাদের অংশগ্রহণ কি শ্রেয়ঃ? অন্ততপক্ষে তত্ত্বতঃ নয়। কারণ সখ্যরস মধুররসের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। সখ্যের পর বাৎসল্য, বাৎসল্যের পর মধুর। সখ্যে সম্ভ্রমশূন্যতা থাকিলেও মধুররসের পোষক হইবার পক্ষে একটি মানসিক বাধা আছে। বৃন্দাবনের একমাত্র পুরুষ কৃষ্ণের এই একান্তলীলায় আমরা অন্য পুরুষের সাহচর্য্য চাই না। রাধা-সখীদের কথা স্বতন্ত্র, কারণ তাঁহারা মধুররসের সহচরী।

অবশ্য যেহেতু গোচারণকালে রাধাকৃষ্ণের রসলীলার একটা অংশ সম্পন্ন করাইতে হয়, সেকারণে কেবল শেখর নন, অন্য কয়েকজন বৈষ্ণব কবিও অন্তরঙ্গ সখাদের এই লীলাপর্য্যায় হইতে সম্পূর্ণ দূরে রাখিতে পারেন নাই। সুবল বড় অন্তরঙ্গ। সুবলকে লইয়া কৃষ্ণ অন্য সকলের নিকট হইতে প্রায়ই নিভৃতে গমন করেন। "শিশু পশু নিয়োজিয়া সুবল মঙ্গলে লৈয়া বাহির হইল নটরায়"—একথা কেবল শেখর বলেন না, গোবিন্দদাসেরও অনুরূপ কথা—"আনহি ছল করি, সুবল করে ধরি, গমন করল বনমাহি।" সুবলকে লইয়া কেবল সরিয়া যাওয়া নয়, ভাব-আস্বাদনও আছে। শেখরের সুবল দুগ্ধদোহনরত কানুকে বিরলে পাইয়া প্রশ্ন করেন :

পুছত সুবল হেরিয়া মুখ।
কি ভেল আজুক রজনী সুখ॥

এবং জনৈক অজ্ঞাতনামা কবির সুবলকে কৃষ্ণ "সুবল মিতা হে, কি কব সে সব রঙ্গ" বলিয়া গত রজনীর মিলনের বিস্তৃত বিবরণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন। গোষ্ঠপর্য্যায়ে কৃষ্ণের চিত্তচাঞ্চল্যের আরো দু' একটি উল্লেখ—কৃষ্ণ দুগ্ধ-দোহন করিতেছেন, এমন সময়:

রাইরূপ দেখি বিভোর হইয়া।
দোহনের ছাঁদ পড়ে আউলাঞা॥

আর একবার:

খেলা রসে ছিল কানাই শ্রীদামের সনে।
হেনকালে রাধারে পড়িয়া গেল মনে॥
আপনার ধেনুগণ সঙ্গিগণে দিয়া।
রাধা বলি বাজায় বাঁশি ত্রিভঙ্গ হৈয়া॥

উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে দেখা যায়, সখ্য রসের সহিত কোন কোন স্থলে মধুর রসের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই মিশ্রণ সর্ব্বাংশে অভিপ্রেত নয়। গোষ্ঠ-পর্য্যায়ে রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ ও মিলন সংক্রান্ত ব্যাপারের একটা অবকাশ আছে বটে, কিন্তু বৈষ্ণব কবিরা এই দুইটি রসকে পৃথক রাখিতে চেষ্টাও করিয়াছেন। কারণ সমকালে ঘটিলেও সখ্য ও মধুর—এই দুই লীলালোক সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি একেবারে অন্তরঙ্গ, অপরটি বহুলাংশে বহিরঙ্গ। সখ্যের কৃষ্ণ ও মধুরের কৃষ্ণে দুস্তর ব্যবধান। বয়সে কিশোর হইয়াও সখ্যে কৃষ্ণ বালকাধিক এবং মধুরে পূর্ণ নায়ক।

বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যে তাই সাধারণতঃ এই দুই রসের সংমিশ্রণ দেখা যায় না। শেখরই উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। শেখরের যে বাস্তবতা ও মানবিকতার প্রশংসা করিয়াছি, তাহাই এই ভাব-বিপর্য্যয়ের জন্য দায়ী মনে হয়। গোষ্ঠে যদি রাধাকৃষ্ণ পরস্পর-দর্শনে আকুল হন, তবে উপস্থিত সকলকে, অন্ততঃ ঘনিষ্ঠদের, সে চাঞ্চল্যে অনবহিত রাখা যায় না। শেখর তথ্যের বাস্তবতা ও সত্যের বাস্তবতায় গোল বাধাইয়াছেন।

গোলযোগ সর্ব্বাধিক বাৎসল্যে। সেখানে বাস্তবিক রসাভাস। বাৎসল্যে মধুর রসের মিশাল একেবারেই চলে না। সেরূপ করিলে বাৎসল্যের স্নিগ্ধতা নিরতিশয় কটু হইয়া পড়ে। সেই তিক্ততা শেখরের বাৎসল্যের পদে আছে।

শেখর-রচিত বাৎসল্যের পালাজাতীয় ধারাবাহিক কয়েকটি পদে যশোদা কর্ত্তৃক কৃষ্ণসহ রাখাল বালকদের ভোজন করাইবার একটি বিবরণ পাই। যশোদা রাধিকাকে

পতিগৃহ হইতে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন রন্ধনে সহায়তার জন্য, কিন্তু শুধুই রন্ধনে সহায়তা? কাব্যরূপে উৎকৃষ্ট না হইলেও আমরা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব। সখাসঙ্গে ভোজনে বসিয়া কৃষ্ণ রাধাকে দেখামাত্র অচেতন; তখন :

অরুচি দেখিয়া আকুল হইয়া
কহয়ে নন্দের রাণী।
রাধা রসবতী কর্পূর মালতী
তোমারি লাগিয়া আনি॥
তুমি না খাইবে রাই না আসিবে
স্বরূপ কহিনু তোরে।

এবং :

তোমার কারণ এসব পকান্ন
পাঠায় রাজার ঝি।……
তোমার ভোজন শুনিয়া তখন
রাধিকা পাওব সুখ॥

কৃষ্ণের উপর রাধিকার প্রভাবের কথা যশোদা বেশ জানেন দেখিতেছি, অথচ উভয়ের এই আকর্ষণ অবৈধ, ইহা লইয়া পাড়া-প্রতিবেশী কানাকানি করে, সে বিষয়েও তিনি সচেতন। যথা : রাধিকাকে সাজাইবার পর যশোদার উক্তি :

আমার জীবন তোমরা দুজন
দুখানি আঁখির তারা।
ব্রজরাজ মন জানিবা এমন
সে জন আমারি পারা॥
এ ঘর করণ তোদের কারণ
শুনহ রাজার ঝি।
ধাতার মাথায় পড়ুক বজর
আর না বলিব কি॥
আর কিবা কহ তোমা হেন বহু
নাহিক আমার ঘরে।……

গদ গদ স্বরে রাণী কহয়ে বিষাদ বাণী
ধরিয়া রাধার দুটি করে।

ক্বত্তিকা সমান হেন আমারে জানিবা তেন
সে ঘর এ ঘর সব তোঁরে ॥
কি আর করিব সাধ সকলে পড়িবে বাদ
দিনেক রাখিতৈ নারি তোমা।
এমনি বিষম লোক জীয়ন্তে পাড়য়ে পোক
তিলেক নাহিক করে ক্ষমা ॥

রাধাকে পুত্রবধূরূপে না পাইয়া তাঁহার প্রচণ্ড দুঃখ, ততোধিক দুঃখ বোধহয় পুত্রের যন্ত্রণায়। পুত্রের সেই বঞ্চিত জীবনের দীর্ঘশ্বাস থামাইতে কি তিনি মাঝে মাঝে রাধিকাকে ডাকিয়া আনেন? মাতাকে প্রেমের দূতী বলা অতি কদর্য্য, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে কি সেই দূতীর মানসিকতা যশোদার মধ্যে সক্রিয় নাই—বিশেষতঃ উদ্ধৃত পদগুলিতে? ইহা চরমে উঠিয়াছে, যখন দেখি যশোদা কৃষ্ণের সম্ভোগ চিহ্নগুলিকে ভুল অর্থে ব্যাখ্যা করিতেছেন। যশোদা কি এতই মুগ্ধা—অন্ততঃ পূর্ব্বে তাঁহার যে মনোভাবের পরিচয় পাইয়াছি, সেই পটভূমিকায়? এত অল্প বয়সে সম্ভবতঃ কৃষ্ণের পরিপক্কতা বুঝিতে যশোদা অক্ষম—কবি এইরূপ মনোভাব জাগাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু সেই সরলা বিভোরা মাতাকে যশোদার মধ্যে শেখর ফুটাইতে পারেন নাই বলিয়া, তাঁহার ঐ ব্যাখ্যা কপটতা মনে হয়।

শেখরের কাব্য সম্বন্ধে যে আলোচনা হইল তাহাই যথেষ্ট মনে হয়। অপেক্ষাকৃত অপরিচিত কবি বলিয়া তাঁহার কাব্যের বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিতে হইয়াছে। তাঁহার সামর্থ্যের অবকাশ এবং অভাব উভয়ই দেখিয়াছি। এই পরিচয় হইতে প্রতীয়মান হয়, বৈষ্ণব পদজগতে তিনি সাহসিক কবি। তাঁহার বিদ্যা এবং বৈদগ্ধ্য যেমন প্রচলিত কাব্যরীতির রসসৌন্দর্য্য যথাসম্ভব নিষ্কাশন করিতে উৎসাহিত করিয়াছে, তেমনি এমন একটি স্বাধীন চিত্ততা দিয়াছে, যাহা প্রথানুগত্যের মত প্রথাপরিহারেও বিশ্বাস করে। প্রথা পরিহার করিলে কাব্য উৎকর্ষ লাভ করে আবার করেও না। শেখরে উভয় অবস্থাই দৃষ্টিগোচর হয়। আরো একটি পরিচয় লাভ করি,—শেখর বৈষ্ণব কবি হইলেও ভক্ত কবি নহেন। ভক্তির ব্যাকুল দৃষ্টিক্ষেপ না করিয়া জীবনরসিকের রস-পিপাসা ও কৌতূহল লইয়া রাধাকৃষ্ণলীলাকে তিনি নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। শেখরের রাধাকৃষ্ণ মুখ্যতঃ মানবমানবী। সংশয় না রাখিয়াই বলা চলে "শুধু বৈকুণ্ঠের তরে" শেখরের সঙ্গীত নহে, তাহাতে মানব-সংসারের রীতিমত অংশভাগ আছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরে এক অভূতপূর্ব্ব চিত্তজাগরণের স্রোত বাংলা দেশকে প্লাবিত করিয়াছিল। কাব্যে সঙ্গীতে সাধনে জীবনে সেই প্রাণোন্মাদনা যে রূপ এবং স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাকে আমরা এক যুগের সম্পদ-শ্রেষ্ঠ বলিতে পারি।

ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যে অ-পূর্ব্ব জীবনী সাহিত্যও শ্রীচৈতন্যের জীবনালোকে আত্মলাভ করে। তাঁহার জীবন ও বাণী উপস্থাপিত করিতে বাংলাভাষায় যে দুটি গ্রন্থ সর্ব্বাধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছে—চৈতন্য ভাগবত এবং চৈতন্য চরিতামৃত নামীয় সেই মহাগ্রন্থদুটিকে আজিও আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকি। 'এক বৃন্তে দুটি ফুলের' মত ঐ চৈতন্য-সার কাব্য দুটিকে একত্র চিন্তা করিতে অভ্যস্ত ছিলাম। দুইটি গ্রন্থই পরম ভক্ত, পরম প্রেমিক দুই কবি-সাধকের রচিত; দুইটি গ্রন্থেরই উপজীব্য পুরুষোত্তম শ্রীচৈতন্য। এবং এই গ্রন্থদ্বয় সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে—কি নবদ্বীপে, কি বৃন্দাবনে—যুগপৎ আস্বাদিত ও অর্চ্চিত হইয়া থাকে; সুতরাং ইহারা যে একই ভাবাবেগ—প্রাণ-প্রবর্ত্তনার সৃষ্টি তাহাতে সন্দেহ ছিল না।

ছিল না কিন্তু বর্ত্তমানে থাকিতেছে। আধুনিক পণ্ডিতগণের কেহ কেহ বলিতেছেন, ঐ দুই গ্রন্থে নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের ঐতিহ্য অনুসরণ করিবার জন্য পরস্পর বিরোধ আসিয়াছে এবং চৈতন্য চরিতামৃতে অঙ্কিত শ্রীচৈতন্য মোটেই সত্যচরিত্র নন, তিনি বৃন্দাবনের গোস্বামী ও কবিরাজ গোস্বামীর কারসাজির সৃষ্টি। মতামত হিসাবে এগুলি রীতিমত চমকপ্রদ। আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি মত বিষয়টির পর্য্যালোচনা করিব।

দ্বিতীয় মতটি অর্থাৎ চৈতন্য-চরিতামৃতে অঙ্কিত চৈতন্য সত্যচরিত্র নহেন, এতই অ-যুক্তিসহ যে, এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণপ্রয়োগের প্রয়োজন আছে মনে করি না। বৃন্দাবনদাসের কাব্যে চৈতন্যের একটা স্থানিক রূপ, চৈতন্য-জীবনের একাংশকে উপস্থাপিত করিবার প্রয়াস। বৃন্দাবনদাস দেশকালের দ্বারা শ্রীচৈতন্যের যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন—তাহাকেই তাঁহার কাব্যে রূপদান করিয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস চৈতন্যকে বৃহত্তর—উদারতর দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যের

প্রায় সমসাময়িক। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতা তাঁহার পক্ষে প্রায় অপরিহার্য্য। পক্ষান্তরে কৃষ্ণদাস অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালের। এবং তিনি শ্রীচৈতন্যের সমগ্র জীবন-বাণী ও জীবন-রূপ উপস্থাপিত করিতেছেন। তাই খণ্ড দৃষ্টিতে যে রূপ ধরা পড়ে সমগ্রের আলোকে তাহাকে স্থাপন করিলে নূতনতর তাৎপর্য্য আবিষ্কৃত হইয়া স্বতন্ত্র কিছু ভাবোপলব্ধি অসম্ভব হয় না। এখন প্রশ্ন, চরিতামৃতে অঙ্কিত এই চৈতন্য-মূর্ত্তি বাস্তব মূর্ত্তি কিনা? উত্তরে বিকল্প প্রশ্ন উঠান যায়, অবাস্তব কিনা? অবাস্তব বলিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে কি? আমাদের যতদূর মনে হয়, অবাস্তবতার একটি প্রমাণ দেওয়া হয়, অলৌকিকতা। আধুনিক যুক্তিবাদী মন এতই লোক-রসিক যে তাহার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় সহ্য করিতে প্রস্তুত নয়। তাহা না হয় মানিলাম, কিন্তু ইঁহারাই কি করিয়া অলৌকিকতা বর্জ্জন করিয়া চৈতন্য-ভাগবত হইতে অকৃত্রিম চৈতন্যোদ্ধারের চেষ্টা করেন? বস্তুটা দাঁড়াইতেছে, যাহা আমার সিদ্ধান্তের অনুকূল, তাহাকে বাছিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে আপত্তি নাই,—সেখানে চৈতন্য ভাগবতের অলৌকিকতা সত্ত্বেও ঐ স্থান হইতে শ্রীচৈতন্যের জীবন-সম্পর্কে ধারণা সংগঠনে বাধা জন্মায় না, অথচ চৈতন্য-চরিতামৃতে ঐ অলৌকিকতাই যত ভয়াবহ। অবশ্য এই অলৌকিকতার সত্যাসত্য বিষয়ে তর্ক উঠান চলিত, এবং যে-দেশে নিতান্ত সাধারণ হঠযোগীও নানা প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানবুদ্ধিকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়, সে দেশে কোন ঈশ্বরকল্প মহাপুরুষের পক্ষে আপাত প্রতীয়মান নিয়মশৃঙ্খলার ব্যতিক্রম করা অদ্ভুত কিছু নয়, ইহা বলা যায় না তাহা নয়। তথাপি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা সীমাবদ্ধ যুক্তি-বিজ্ঞান এবং ভূত-বিজ্ঞানের সম্মান করিয়া অলৌকিকতাকে অস্বীকার করিলাম। তাহাতেও চৈতন্যচরিতামৃত হইতে চৈতন্যাবিষ্কারে বাধা জন্মায় কেন বুঝি না।

সুতরাং আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য, চরিতামৃতের মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কোন ব্যক্তি বা সঙ্ঘ-মনের সৃষ্টি নহেন। তিনি স্বয়ং-সৃষ্ট। যে বিশাল বিচিত্র জীবন তিনি মর্ত্ত্যবাসীর সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন, চরিতামৃতকার অথবা বৃন্দাবনের গোস্বামি-গণ তাহাকেই—অথবা তাহার অংশকে প্রত্যক্ষ করিয়া—যথাসাধ্য রূপদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে এমন নূতন কিছু আরোপ করেন নাই, যাহা তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল না। এ কোন ভক্তের স্তুতিবাদ নহে, ইহা যুক্তিসিদ্ধ উক্তি। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যকে যে ভাবে ও রূপে দেখিয়াছেন তাহা মিথ্যা নয়—কিন্তু সম্পূর্ণ সত্যও নয়। তাঁহার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ এবং চিত্র খণ্ডিত। তিনি শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রথম অংশকে অর্থাৎ সন্ন্যাসপূর্ব্ব জীবনকেই মুখ্যত উপজীব্য

করিয়াছেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের পরও তাঁহার কাব্যে চৈতন্য-চিত্র সামান্য কিছু আছে কিন্তু মহাপ্রভুর শেষজীবনের কৃষ্ণবিরহিত সেই অপূর্ব্ব ভাবোন্মত্ত অবস্থা—তাহার উল্লেখ বা বিবৃতি তাঁহার কাব্যে নাই। অথচ মহাপ্রভুর জীবনের ঐ অবস্থাকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। উহা কোন বিচ্ছিন্ন মুহূর্ত্তের সহসাগত অনুভূতি ঝলকমাত্র নহে, মহাপ্রভু বৎসরের পর বৎসর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় নীলাচলে কাটাইয়াছেন। ইহা পূর্ণতঃ ঐতিহাসিক সত্য। তবে পণ্ডিতগণ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে দৃষ্টিতে ঐ অবস্থা বিশেষকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার যাথার্থ্যে আপত্তি তুলিতে পারেন। সে সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য, আধ্যাত্মিক ভাবপর্য্যায় সম্পর্কে অস্ত্যর্থক বা নাস্ত্যর্থক কোন উক্তি সম্পূর্ণ সঙ্গত হইবে না। আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক অনুভূতি-সম্পন্ন মহাপুরুষের অসদ্ভাব নাই; তাঁহারা ধর্ম্মকে 'রিলিজিয়নত্ব' হইতে উদ্ধার করিয়া বাস্তব ব্যবহার-শাস্ত্রের প্রত্যক্ষতা দান করিয়াছেন। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র অনেকাংশে অনুষ্ঠান-শাস্ত্র। কোন্ কোন্ সাধনপর্য্যায়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলে কোন্ কোন্ উপলব্ধির আবির্ভাব জীবনে সমাসন্ন হইবে তাহা স্পষ্ট নির্দ্দেশিত আছে। এবং সেই ক্ষুরধার পথে ধাবমান বহুতর অধ্যাত্ম পুরুষের সাক্ষ্য ঐ 'নির্দ্দেশে'র আধ্যাত্মিক বাস্তবতা প্রমাণ করিয়া গিয়াছে। অধ্যাত্ম সাধনার পথে অগ্রসর না হইয়া সে বিষয়ে অভিজ্ঞতার অভিমান থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। প্রত্যেক বস্তুর অধিকারী অনধিকারী ভেদ আছে। যাহা বুঝি না, উপলব্ধি করি না, অথচ অন্যে উপলব্ধি করিয়া যে বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, সে সম্পর্কে স্খলৎ-বাক্ হওয়া নিরতিশয় অনুচিত। বিজ্ঞানের দুরূহ তথ্য বা তত্ত্ব সম্বন্ধে অবিশেষজ্ঞ হইয়া কেহ দন্তস্ফুট করিতে সাহস করে না, অথচ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান বিষয়ে পরম গাম্ভীর্য্যসহ লঘু উক্তি করিতে বাধে না। সর্ব্ববিদ্যা পারঙ্গম না হইয়া আমরা নিবৃত্ত হই না; ঐ বিদ্যার ক্ষেত্রে অধ্যাত্মতত্ত্বকেও আমরা একটা 'সাবজেক্ট' করিয়া লইয়াছি।

সর্ব্বশেষে এতৎ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, যে চৈতন্যকে বাঙালী এবং ভারতবাসী এই দীর্ঘ কয়েকশত বৎসর ধরিয়া জানিয়া আসিতেছে, যিনি ভক্তের হৃদয়ে, অনুভবশালীর প্রাণস্পন্দনে, বিশ্বাসীর বিশ্বাসে এবং অগণিত প্রাকৃত মানুষের আন্তরিক ভক্তি ও প্রীতির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন, তিনি কিছু বৃন্দাবনের গোস্বামী ও কবিরাজ গোস্বামীর সৃষ্টি নন। অতবড় গৌরব—গোস্বামিগণের প্রতি সর্ব্ববিধ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও—তাঁহাদের দান করিতে প্রস্তুত নই। সেই চৈতন্য-রহস্যের সামান্য মাত্র উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা চৈতন্য-চিত্রণে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রীতি ও ভক্তি তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি দিয়াছিল। আমরা বলিব, যে চৈতন্যকে

তাঁহারা আঁকিয়াছেন, তাহার মধ্যে সীমাবদ্ধতা হয়ত আছে কিন্তু অতিরঞ্জন নাই। আর একটি কথা মনে জাগে, এই দীর্ঘ দিন ধরিয়া শ্রীচৈতন্যকে যে ভাব ও রূপে সাধারণ মানুষ এবং বিদগ্ধজন গ্রহণ করিয়া আসিতেছে, তিনি হইলেন মিথ্যা? তাঁহার মিথ্যাত্ব এতদিন কাহারও চোখে পড়িল না? মিথ্যার কি এত শক্তি হয়?

এইবার আমরা দ্বিতীয় প্রসঙ্গের আলোচনায় আসিয়া পড়িতেছি; নবদ্বীপের বৈষ্ণবধর্ম্মের ঐতিহ্য, ভজনাদর্শ, শ্রীচৈতন্য-বিষয়ক প্রতীতি নাকি বৃন্দাবনের ঐতিহ্য ভজনাদর্শ ও চৈতন্যবোধ হইতে পৃথব। নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীচৈতন্য আরাধ্য, উপেয়। আর বৃন্দাবনের আদর্শে তিনি উপায়। অবশ্য বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ উভয়ত্র তাঁহার ঈশ্বরত্ব স্বীকৃত। তথাপি নবদ্বীপে তিনি মূলতঃ কৃষ্ণভাবে পূজিত হইতেন আর "বৃন্দাবনের ভক্তেরা তাঁহাকে শ্রীরাধার ভাব আস্বাদনের জন্য অবতীর্ণ কৃষ্ণরূপে মানিতেন"; এবং "নরহরি শিবানন্দ বাসুঘোষ প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহার কৃষ্ণ-ভাবকে অবলম্বন করিয়া ও নিজেরা গৌরনাগরীভাবে আবিষ্ট হইয়া তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেন। আর বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ তাঁহার রাধাভাবকে অবলম্বন করিয়া ও আপনাদিগকে মঞ্জরিভাবে ভাবিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতেন।"

এই প্রকার বিপ্লবী সিদ্ধান্তকে রক্ষণশীল মন লইয়া সত্বর স্বীকার করিতে বাধিবে। আমরা চৈতন্য-ভাগবতকে নবদ্বীপের আদর্শ ও চরিতামৃতকে বৃন্দাবনী আদর্শের প্রতিভূ ধরিয়া এ বিষয়ে সামান্য বক্তব্য উপস্থিত করিব। মনোমত হইলে নিজের পক্ষে অন্য চিন্তাশীল ব্যক্তির যুক্তিও গ্রহণ করিব।

অপর কোন প্রমাণ না দিয়াও বলা যায়, যাঁহারা নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের আদর্শের মধ্যে ভেদ কল্পনা করিতেছেন, তাঁহাদের যুক্তি তাঁহারা নিজেরাই খণ্ডন করিয়াছেন। প্রতি মন্তব্যের পর ঢোক গিলিয়া তাঁহারা যে পরিমাণে 'যে' ও 'যদি' বলিয়াছেন (গৌড়ভক্তেরা যে শ্রীচৈতন্যের রাধাভাবের বিরহ স্বীকার করিতেন না, তাহা নয়...... নীলাচলে শ্রীচৈতন্য কখনো কৃষ্ণভাবে কখনো রাধাভাবে পূজিত হইতেন ইত্যাদি ইত্যাদি), তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত স্বকীয় সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। এখন ইহার উপর আমরা যদি দেখিতে পাই, নবদ্বীপেও শ্রীচৈতন্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ পূজিত হইতেছেন এবং বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্য উপায়মাত্র নহেন, উপেয়ও, তাহা হইলে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হয়।

প্রথম, নবদ্বীপে চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগে কৃষ্ণারাধনা বৈষ্ণবদের মধ্যে চলিত ছিল কিনা? চৈতন্য-ভাগবতে আছে, গয়া হইতে ফিরিবার পর শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-লীলার আবেশে দিন কাটাইতেন। গয়াতীর্থে ঈশ্বরপুরীর

সহিত সাক্ষাৎ ও বার্ত্তালাপের পর শ্রীগৌরাঙ্গের এক অপূর্ব্ব ভাবান্তর উপস্থিত হয়। ঈশ্বরপুরী চলিয়া গেলে তিনি অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিলেন :

"কোথা মোর বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া আমারে।"

(চৈ. ভা. আদি)

অতঃপর নবদ্বীপে ফিরিয়া তাঁহার মুখে কৃষ্ণ ছাড়া অন্য বাণী ছিল না। 'বহির্গৌর' হইলে কি হয়, মানুষটি তখন 'অন্তঃকৃষ্ণ' :

কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্র-মর্ম্ম নাহি জানে॥......
চণ্ডাল চণ্ডাল নয় যদি কৃষ্ণ বোলে।......
দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণ নাম।
সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণ-ধাম॥

(চৈ. ভা. মধ্য)

অন্যত্র : যত ধ্বনি শ্রবণে সকল কৃষ্ণ নাম।
সকল ভুবন দেখোঁ গোবিন্দের ধাম॥

(ঐ—মধ্য)

নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে মহাপ্রভু আদেশ দিলেন :

সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
ইহা বহি আর না বলাবে না বলিবা।
দিন অবসানে আসি আমারে বলিবা॥

(ঐ - মধ্য)

শ্রীচৈতন্য মুখনিঃসৃত এই সুস্পষ্ট অনুজ্ঞার পরেও যদি একথা বিশ্বাস করিতে বলা হয়, নবদ্বীপে কেবল শ্রীচৈতন্যই উপেয়, তাহা হইলে আমরা নাচার। যে কৃষ্ণার্ত্তি চৈতন্য-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহাকে বর্জ্জন করিলে কৃষ্ণকে তো নয়ই, চৈতন্যকেও পাওয়া সম্ভব নয়, এটুকু বোধবৃত্তি নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণের ছিল। ইহার প্রমাণ নবদ্বীপের ভক্তগণের এতৎবিষয়ক আচরণ। নিত্যানন্দপ্রভু গৌরাঙ্গ-ভজনের উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু দস্যু তস্করদের কৃপাবিতরণে উদ্ধার করিবার পর তিনি কৃষ্ণমন্ত্রই দিতেন :

জন্মে জন্মে কৃষ্ণের সেবক তুমি দঢ়।
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লও হরিনাম॥

(চৈ. ভা.)

নিত্যানন্দ স্বয়ং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণচৈতন্য উভয়ের পূজা করিতেন। অদ্বৈত মদনগোপালের সেবা করিতেন। গদাধর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা পাইয়াছিলেন এবং চৈতন্য ভাগবতে আছে মুকুন্দ শ্রীবাসাদি পূর্ব্ব হইতে শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনা করিতেন, পরে কৃষ্ণ-অন্ত-প্রাণ মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আসিয়া কৃষ্ণ-ত্যাগের কোন কারণ উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ এখন পর্য্যন্ত গুরু-পরম্পরায় প্রচলিত রীতি অনুসারে ব্রজলীলা ও গৌরলীলার আস্বাদন করেন।

নবদ্বীপের পদকর্ত্তারা—নরহরি, বংশীবদন, শিবানন্দ, পরমানন্দ প্রভৃতি মূলতঃ কৃষ্ণলীলাত্মক পদই রচনা করিয়াছেন। কেবল প্রারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা যুক্ত আছে।

চৈতন্য ভাগবতাদিতে চৈতন্যারাধনা একমাত্র উপজীব্য বলিয়া তাহাকে বৃন্দাবনের কৃষ্ণসাধনা হইতে পৃথক করিবার যে প্রচেষ্টা, তাহার বিরুদ্ধে একদিকের প্রমাণ উপস্থিত করিলাম। ইহার বিপরীত প্রান্তটি পরীক্ষা করা যাক। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের আদর্শে—চৈতন্য চরিতামৃতকে যাহার প্রতিভূ-গ্রন্থ বলিতে পারি—শ্রীচৈতন্য উপায়মাত্র কিনা?

চৈতন্য চরিতামৃতের প্রারম্ভে দীর্ঘ স্থান ধরিয়া শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব প্রমাণিত করা হইয়াছে এবং তিনি যে নিছক অবতারমাত্র নন, স্বয়ং অবতারী শ্রীকৃষ্ণই, তাহাও নির্দ্দেশিত হইয়াছে। চৈতন্য চরিতামৃতের বহু স্থানেই "ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র" বলিয়া শ্রীচৈতন্যের স্তুতিপাঠ আছে। সুতরাং সহজ বুদ্ধিতে ইহাই স্বাভাবিক ঠেকে যে "পরম স্বতন্ত্র ঈশ্বর" ভজনীয় হইবেন। বাস্তবিকই চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীচৈতন্যও উপেয়, উপায়মাত্র নহেন। কবিরাজ গোস্বামী বহুস্থানে গৌরাঙ্গ-ভজনের কথা বলিয়াছেন এবং আদিলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে তিনি গৌরাঙ্গের ভজনীয়ত্ব বা সাধ্যত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন:

অতএব পুনঃ কহোঁ উর্দ্ধবাহু হৈয়া।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥

কিন্তু কুতার্কিক প্রাণী চিরকাল অবিরল। অতএব কবিরাজ গোস্বামীকে বলিতে হইতেছে:

যদি বা তার্কিক কহে তর্ক সে প্রমাণ।
তর্ক শাস্ত্রে সিদ্ধ যেই সেই সেব্যমান ॥

এই কথাটি বৃন্দাবনীয় ভজনাদর্শের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া খ্যাত শ্রীনরোত্তমের একটি উক্তিতে সমর্থিত :

"সাধনে ভাবিবে যাহা সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা।"

সুতরাং এখানে মহাপ্রভু কেবল উপায় থাকিতেছেন না, তিনি উপেয়ও। আর আসলে এই বিশেষ ক্ষেত্রে উপায় ও উপেয়ে যে কী পার্থক্য তাহা বোধগম্য হয় না। কারণ শ্রীচৈতন্যকে উপায় হিসাবে গ্রহণ করিলে—গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে—কৃষ্ণ-সাধনার একটিমাত্র পথ থাকে—রাধাভাবে সাধনা। কিন্তু মহাপ্রভু ছাড়া অন্য কাহারও পক্ষে যে রাধাভাবে কৃষ্ণারাধনা সম্ভব, তাহা গোস্বামিগণ বিশ্বাস করিতেন না। অতএব তাঁহাদের নিকট শ্রীচৈতন্য নিছক উপায় হন কিরূপে? উপায় অর্থে যদি অনুপ্রেরণা ধরা যায়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণপূজায় প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন মানিতে হইবে। কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামিবৃন্দ শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তত্ত্বে বিশ্বাস করিতেন। অতএব তাঁহাদের পক্ষে নিছক অনুপ্রেরণাদাতা বলিয়া মহাপ্রভুকে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তাঁহারা যে তাহা করিতেনও না, চৈতন্যচরিতামৃতে তাহার উল্লেখ আছে। চরিতামৃত হইতে জানা যায়, রঘুনাথদাস প্রত্যহ "প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন" করিতেন; এবং রূপসনাতনাদির দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের অন্তর্গত ছিল চৈতন্যকথা শ্রবণ ও চৈতন্য-চিন্তন—প্রত্যহ "চৈতন্যকথা শুনে করে চৈতন্য-চিন্তন।" ভক্তিরত্নাকরে আছে, বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ শ্রীচৈতন্যের অষ্টকালীন নিত্যলীলার চিন্তাও করিতেন :

চৈতন্যচন্দ্রের নিত্যলীলা রসায়ন।
নিশান্ত নিশা পর্য্যন্ত চিন্তে বিজ্ঞজন ॥

নরোত্তমের প্রার্থনা পদে আছে—"গোরা পহুঁ না ভজিয়াঁ মৈনু"; "গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধনসম্পদ, সেই জানে ভকতিরস সার।"

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের আদি দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা রূপ ও সনাতনের এবং রঘুনাথের "কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে"; "গতিং দ্রষ্টা যস্য প্রমদ গজবর্য্যোঽখিলজনা" প্রভৃতি বহু স্তবে স্তোত্রে মহাপ্রভুর উপাস্যত্ব স্বীকার করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ অবতার বলিয়া স্বীকার করিলে উপাস্যত্ব প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হইয়া পড়ে। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ মনে করিতেন, ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলা উভয়ের মিলিত আস্বাদনজনিত মাধুর্য্যের তুলনা নাই। চৈতন্য চরিতামৃতে আছে :

চৈতন্য লীলামৃতপুর কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর
দোঁহে মেলি হয় সুমাধুর্য্য।
সাধু গুরু প্রসাদে তাহা যেই আস্বাদে
সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য॥

নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের ভজনাদর্শে ভেদ-কল্পনার মূলে যে যথেষ্ট পরিমাণ সত্য নাই, তাহা চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃত অবলম্বনে দেখাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। এখন, এই দুইটি জীবনী-কাব্যে কি ভাবগত পার্থক্য কিছুই নাই? আমাদের বিশ্বাস তাহাও সত্য নয়। পার্থক্য আছে, কিন্তু সেই পার্থক্য গ্রন্থদুটিকে পরস্পর-বিরোধী করিয়া তোলে নাই। তাহা অসম্পূর্ণ ও সম্পূর্ণের পার্থক্য, অপরিণতি ও পরিণতির প্রভেদ। অর্থাৎ একটি অপরটির পরিপূরক। এই মন্তব্যটি কয়েকদিক হইতে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিব। প্রথমতঃ তথ্যের কথা ধরা যাক।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত একটি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ। ইহাতে চৈতন্য-জীবনীর প্রথমাংশের সুবিস্তৃত, মধ্যাংশের নাতি-বিস্তারিত এবং শেষাংশের উল্লেখমাত্র রহিয়াছে। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ এই গ্রন্থ প্রত্যহ আস্বাদন করিতেন। আস্বাদন করিতেন অথচ অসম্পূর্ণতার একটা অতৃপ্তিও ছিল। চৈতন্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ, সেই দিব্যোন্মাদের কোন বর্ণনা ইহাতে নাই; তদুপরি চৈতন্য-জীবনকে দার্শনিক দৃষ্টিতে অপরোক্ষ করিবার প্রযত্নও বর্ত্তমান নাই। তাঁহারা চৈতন্য ভাগবতের তথ্যগত ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণদাস কবিরাজের উপর পূর্ণায়ত জীবনী রচনার ভার ন্যস্ত হইল। ঐ উদ্দিষ্ট গ্রন্থে কেবল যে ত্রুটি-বিচ্যুতি গুলি সংশোধিত হইবে তাহা নয়, শ্রীচৈতন্যের লোকোত্তর জীবনের দার্শনিক ব্যাখ্যা এবং বিরহোন্মাদ দিব্যাবস্থার পূর্ণ বিবরণও থাকিবে। এই মহতী ব্রতে নিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ কিন্তু পূর্ব্বসূরীর কৃত-কর্ম্মকে অবজ্ঞা করিলেন না। সবিনয়ে বৃন্দাবনদাসের ঋণ স্বীকার করিয়া, প্রকৃত বৈষ্ণবের মত, "নিজের মানত্যাগ করিয়া অপরের মান বাড়াইয়া" নিজ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি আপন কাব্যকে বৃন্দাবনদাসের কাব্যের পরিপূরক জ্ঞান করিতেন; ইহার সকলের বড় প্রমাণ, বৃন্দাবনদাসের বিস্তৃতি ও শ্রেষ্ঠত্ব যেখানে, সেখানে তিনি সেই দিকেই অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া প্রসঙ্গান্তরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনদাসের অকৃত কার্য্যই তাঁহার আরব্ধ। তাই আদিলীলা অতিসংক্ষেপে সূত্রাকারে রচিত। ফলতঃ শ্রীচৈতন্যের জীবন সমগ্রভাবে জানিতে হইলে কেবল চরিতামৃতে চলিবে না, অংশবিশেষের জন্য চৈতন্যভাগবতকেও আমন্ত্রণ করিতে হইবে, এবং কাব্যে আদিলীলাকে সূত্রমাত্র

রাখিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ উহা আবশ্যিক করিয়া গিয়াছেন। তবে বৃন্দাবনের গ্রন্থের পরিপূরক যখন, তখন অসমাপ্তি বা অসম্পূর্ণতার ক্ষেত্রে কৃষ্ণদাসকে লেখনী ধরিতে হয়। আদিলীলার কাজী দলন ও দিগ্বিজয়ীর পরাভবের বিস্তৃত বর্ণনা এবং সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভুর রাঢ়দেশ ভ্রমণ ও শান্তিপুর আগমন বিষয়ে বৃন্দাবনদাসের বিবরণের সহিত ইচ্ছাকৃত অনৈক্য বজায় রাখার মধ্যে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্যলীলারও বহুস্থলে কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার উপর বরাত দিয়া পাশ কাটাইয়া অপর গুরুতর বিষয়ে মনোযোগ নিবিষ্ট করিয়াছেন। শান্তিপুর হইতে মহাপ্রভুর নীলাচল গমনের বিবরণ বৃন্দাবন বিস্তৃতভাবে দিয়াছেন বলিয়া কৃষ্ণদাস তাহা বর্ণনা করেন নাই।

তদুপরি ছিল বৃন্দাবনদাসের উপর কৃষ্ণদাসের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি। "ব্যাস বৃন্দাবন" সম্বন্ধে কিছু বলিতে গিয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রে কবিরাজ গোস্বামী ভক্তিভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছেন। চরিতামৃতে আদ্যন্ত-বিস্তৃত সম্ভ্রমোক্তির দুই একটি অংশ :

মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥
বৃন্দাবনদাস পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি যেহোঁ তরিল সংসার ॥

অন্যত্র

বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥
চৈতন্য লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ ॥

এমন শ্রদ্ধা যাঁহার, তিনি কখনই সম্পূর্ণ বিপরীত কোনো ভজনাদর্শ বা ঐতিহ্য তাঁহার কাব্যে উপস্থিত করিতে পারেন না। তিনি করুন বা না করুন আমাদের কল্পনা করিতে বাধেনা। তবে কল্পনা ও সত্যে প্রভেদ আছে, ইহাই আশার কথা।

এ পর্য্যন্ত তথ্যবিচার চলিতেছিল। তথ্য ব্যতীত ভাবের দিক ধরিলেও আত্যন্তিক ভেদের কল্পনা ভ্রমাত্মক। শ্রীচৈতন্যের অনির্ব্বচনীয় অনিরূপণীয় ব্যক্তিত্ব। ইহার একান্ত ঘরোয়া রূপ ফুটিয়াছে বৃন্দাবনদাসের কাব্যে। আর ঘরে-বাহিরে একত্র করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন কবিরাজ গোস্বামী। ফলতঃ তাঁহার কাব্যে শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বভারতীয় রূপের আভাস আছে। শ্রীচৈতন্যকে ঐ দুইরূপ—গৃহগত এবং বিশ্বগত—ইহার কোনটি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। চৈতন্য-বনস্পতি বাংলাদেশের সরস স্বতন্ত্র মৃত্তিকা হইতে প্রাণরস সংগ্রহ করিয়াছিল কিন্তু

ঐ "বৃহদারণ্য বনস্পতির" পত্র-প্রচ্ছায় বহু-বিস্তৃত, শাখাশ্রেণী দূর-প্রসারী। নদীয়া-দুলাল গোরামণিকে বৃহত্তর ভারতের বক্ষে স্থাপন করিয়া দর্শন করিতে হইলে তাঁহার স্থানিক রূপের—তৎসম্পর্কে সীমাবদ্ধ সংস্কার-দৃষ্টির—আবরণ অনেকখানি ছিন্ন করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাই বলিয়া স্বরূপ-সত্তায় ঐ দুই চৈতন্যে কোন প্রভেদ থাকে না। বৃন্দাবনদাসের গৌরাঙ্গ পরিণত হইয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রূপ ধারণ করিয়াছিল। একই দেহরূপের বাল্য-কৈশোর এবং যৌবন-প্রৌঢ়ত্বে যে প্রভেদ বৃন্দাবন ও কৃষ্ণদাসের কাব্যেও সেই ভেদ।

ইহা ছাড়া আর একটি বিষয় বিচার্য্য। বৃন্দাবনদাসের কাব্যে চৈতন্য সম্পর্কিত মনোভাব একটা ভাবাবেগ-নির্ভর। সেখানে ভক্তপ্রাণের আকূতি প্রবল। তাহার মধ্যে কোন সচেতন দর্শন বা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নাই। বৃন্দাবনদাস সহজ ভক্তির আলোকে দেখিয়াছেন বলিয়া স্বভাবতঃই তাঁহার কাব্যে অলৌকিকতার অবসর আসিয়াছে। ঐ অলৌকিকতা নির্ব্বিচার—অনেকাংশে ভক্ত-হৃদয়ের কল্পনা-স্বষ্ট। কিন্তু কৃষ্ণদাসের কাব্যে চৈতন্য-জীবন ও বাণীর একটা দার্শনিক রূপ আবিষ্কারের চেষ্টা আছে। যে মহাজীবন লক্ষ জীবনের দীপাবলীতে আলোকোৎসব করিয়া গেল, তাহাকে কেবল উৎসবরাত্রির উত্তেজনার মধ্যে গ্রহণ না করিয়া যুক্তির আলোকে, বিচারের মাপকাঠিতে যাচাই করিবার একটা চেষ্টা কবিরাজ গোস্বামীর মধ্যে প্রত্যক্ষ। ইহা না করিলে রস তারল্য আর ভাবগদ্‌গদ অশ্রুধারার মধ্যে চৈতন্য-ব্যক্তিত্বকে কোনদিন খুঁজিয়া পাইতাম না। তিনি প্রাকৃতভাষায় চৈতন্য-রস-সাগরের অংশবিশেষকে অন্ততঃ বলয়িত করিতে পারিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তবে তাঁহার বিচার কোনমতে আবেগের পরিপন্থী নয়। কবিরাজ গোস্বামীও আবেগমুখী, তবে সেই আবেগকে কূলহারা না করিয়া তটের কঠিন বাঁধনের মধ্য দিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট মোহানার দিকে আগাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। বৃন্দাবনদাসের কাব্য ব্যক্তিগত অনুভূতিকে (তাহা অন্যের অনুভূতিও হইতে পারে) রূপদান করিয়াছে বলিয়া উহার মধ্যে তত্ত্ব-চিন্তার অবসর নাই। কিন্তু কৃষ্ণদাসের কাব্য মহাকাব্যের মত। তাহাতে কত চিন্তা, কত ধারণা, কত বোধ, কত বেদ আসিয়া পড়িয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী সেগুলিকে সম্মিলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই মিলন-সাধনায় তত্ত্ব-দৃষ্টি অপরিহার্য্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্যে সেই তত্ত্বের যথাযোগ্য স্বীকৃতি আছে। বৃন্দাবনদাসের কাব্যে তত্ত্ব নাই, সুতরাং কৃষ্ণদাস কবিরাজের তত্ত্বের সহিত তাহার বিরোধও অবান্তর।

কৃষ্ণদাসের কাব্যে শ্রীচৈতন্য

প্রাণ জাগিলেই গান জাগে। মধ্যযুগে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপ্ত করিয়া যেন একটা সঙ্গীতের আসর বসিয়াছিল। ঘরকে বাহির এবং বাহিরকে ঘর করিয়া বাংলাদেশের সুরোন্মত্ত মানুষগুলি বিশ্বজীবনের মহাপ্রাঙ্গণতলে সেই সুর-সভায় আসিয়া মিলিত হইল। উপরে অনন্ত নীলাকাশ—নীলকৃষ্ণ; তাহার উপর রাধাচন্দ্রাবলী—ভুল হইল, চৈতন্যচন্দ্রোদয় হইয়াছে। বাঙালীর ভাবের উচ্ছ্বাস, রসের উল্লাস, আনন্দের উৎসার বাধা মানে নাই। প্রাণ যে জাগিয়াছে - মহাপ্রাণ, মহাগান তো জাগিবেই।

শ্রীচৈতন্যই সেই প্রাণ—বৈষ্ণব সাহিত্যই সেই গান। মহাজীবনের মহাসঙ্গীতে বাংলার একযুগের সাহিত্য মন্দ্র-মুখর।

যে জীবনের আহ্বান বাহিয়া অসংখ্য মানুষের প্রাণাবেগ পরম প্রাপ্তির দিকে ছুটিয়াছিল, সেই মানুষটিকে সেদিন চিনিয়াছিলাম, আজিকে চিনি, অথবা ভবিষ্যতে চিনিব—ইহা অল্পবুদ্ধির অহঙ্কার। রায় রামানন্দ—মহারহস্যে রসিয়া যিনি চৈতন্যের সহিত অন্তরঙ্গ ভাব আস্বাদন করিতেন, তিনিও মেঘমাত্র—ঐ অন্তঃকৃষ্ণ গৌরসাগর হইতে সুধাবারি অঙ্গীকার করিয়া সেই সুধাঙ্গকে পুনরায় চৈতন্যের আলিঙ্গনে ছাড়িয়া দেন। সে গহন-গম্ভীর রহস্যের সন্ধান অন্যে কেমনে পাইবে? তথাপি এই পার্থিব দেহপ্রাণের একটা আকুতি ও উৎকণ্ঠা—একটা সীমাবদ্ধ বোধবুদ্ধি রহিয়াছে। তাহারই মাপকাঠিতে—অধরা যতটুকু ধরা দেয়—তাহাই মাপিয়া চলিব। "কে তোমারে জানতে পারে তুমি না জানালে পরে" সত্য,—তথাপি "শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি বাসিতে পারি যে ভাল।" সাধারণ মানুষ দীঘির সব সংবাদ রাখে কি করিয়া; ঘটিটুকু ঘড়াটুকু জলের দরকার, তাহা জুটিলেই যথেষ্ট।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ভক্ত হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা, আর সেখানে ভক্তাধীশও মাঝে মাঝে আসর জাঁকাইয়া বসেন। মানুষেই তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাই জগতের আদিকাব্য নরকুলচন্দ্রমার কাহিনীতে সুরু;—তাহা মানুষের জীবনায়নের ইতিবৃত্ত—তাহা রামায়ণ। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মও মনুষ্যত্বকে প্রজ্ঞার অন্তিম আলোকে অপরোক্ষ করিয়া ঘোষণা করিয়া গেলেন—ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ। মানুষের প্রাণ-মুকুরে অনন্তের জ্যোতিঃপাত হয়, তাই মুকুরটিকে স্বচ্ছ রাখিতে প্রচেষ্টার অন্ত নাই। অধ্যাত্মসাধনা সেই স্বচ্ছতার সাধনা—তিমির-বিদারণের সাধনা। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে, এই ব্যক্তিমুকুর উজ্জ্বল রাখিতে উদ্দীপনা জাগে স্বতঃস্বচ্ছ

প্রাণমুকুর দর্শনে। সেই অনন্ত-বিশ্ব-গ্রাহী প্রাণমুকুরের স্তুতিগানই মহামানবতার কাব্যরচনা। দেবতা এবং উপদেবতার গাথা-বাহী মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে মনুষ্যত্বের অন্যতম অর্হণাকাব্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত—তাহা শ্রেষ্ঠকাব্যও বটে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মনুষ্যত্বের কোন্ রূপ দেখিয়াছেন, তাঁহার চৈতন্য-চরিতে পরম মানবের মূর্তি-মনোহর কোন্ প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছে—এক কথায় বলিতে গেলে তাহা লৌকিক এবং অলৌকিক। মহাজীবনই তাই ; তাহা যুগপৎ মুক্ত এবং আবিষ্ট। চৈতন্য-চরিত্র সম্পর্কে স্বরূপ দামোদরের একটি অতি গভীর উক্তি চরিতামৃতে গ্রথিত আছে :

যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেম-পরতন্ত্র ॥

—ঐ পরমে মুক্ত, প্রেমে বদ্ধ। শ্রীচৈতন্যের প্রেমটুকুতে বর্ত্তমানে আমাদের প্রয়োজন —অতিপ্রাকৃতকে আনিব না। আচার্য্য দীনেশচন্দ্র বলিতেন—"তাঁহার নয়নাশ্রুর ন্যায় কিছুই অলৌকিক নয়।"

চৈতন্য চরিতামৃতকে কখনো কখনো আমার মহাকাব্য মনে হয়। এক হিসাবে ইহা সত্যই মহাকাব্য—মহাজীবন-কাব্য অথবা জীবন-মহাকাব্য। অন্যদিক ধরিলেও মহাকাব্য যেমন করিয়া সমস্ত যুগচিন্তা ও যুগ-ভাবনাকে আত্মসাৎ করিয়া বাণীদেহ ধারণ করে,—চরিতামৃতের মধ্যে শ্রীচৈতন্য এবং তৎসঙ্গে গৌড়ীয় ধর্ম্ম ও দর্শনবিষয়ক যুগচিত্তের সকল ভক্তি ও অনুরাগ—সকল স্মরণ ও মনন, সর্ব্ববিধ প্রজ্ঞা ও মনীষা যেন পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। কত বিভিন্ন গ্রন্থের বিপুল বিস্তৃত অংশ ইহার অবয়ব গঠন ও বলাধান করিয়াছে। বৃন্দাবনদাসের কাব্যও সুন্দর। তথাপি তিনি—তাঁহার কাব্যে অশেষবিধ অলৌকিকতার অবসর সত্ত্বেও—চৈতন্যের একটা স্থানিক রূপ অবলোকন করিয়াছেন। আর কৃষ্ণদাসের মহাকাব্যসদৃশ কাব্যে শ্রীচৈতন্য মহাভারতের মহাপ্রভু। তাই তত্ত্ব এবং তথ্য, জটিল দার্শনিকতা ও স্বতঃউজ্জ্বল জীবন ঐরূপ একসত্তায় সেখানে মিলিত হইতে পারিয়াছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের মহাকাব্যের প্রাণপুরুষ যিনি, তাঁহার সাধনার মূলে আছে প্রেম, যে প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ। এই প্রেমের দ্বিধাগতি, কৃষ্ণমুখী ও মানবমুখী। রাধার প্রেম কেবল কৃষ্ণই পাইয়াছিলেন; রাধাভাবিত চৈতন্যের প্রেমে কেবল কৃষ্ণ নয়, কৃষ্ণময় এই বিশ্বসংসারের একটা অংশ ছিল। তাই শ্রীচৈতন্যের যে রূপ সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ করে তাহার দুইটি দিক আছে ; এক তাঁহার আধ্যাত্মিক আকুলতা, দুই, দুর্গত মানবের জন্য সুগভীর উৎকণ্ঠা। তিনি রাধাভাব আস্বাদনের জন্য দেহধারণ করিয়াছেন কিনা, অথবা তিনি রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ কিনা,—এই সকল জটিল

দার্শনিক প্রশ্ন হইতে জনসাধারণ চিরদিন দূরে ছিল। তাহারা তত্ত্ব চায় না, শান্তি চায়। বিদ্যাগৌরব অপেক্ষা প্রাণানন্দই তাহাদের কাম্য বস্তু। সুতরাং অপূর্ব্ব দ্যুতিমান সিংহগ্রীব দীর্ঘদেহ অথচ করুণায়তলোচন এক পুরুষ আসিয়া যখন তাহাদের ডাকিয়া কহিলেন, তৃষ্ণার শান্তি আছে, জ্বালার বিরতি মেলে, উৎকণ্ঠ বেদনা মিলাইয়া যায়, কিছু না, কৃষ্ণ নাম নাও, কৃষ্ণ নাম গাও, জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ কোন ভেদ সত্য নয়—সত্য শুধু প্রেম, সত্য শুধু ঐ প্রেম-ব্যাকুলতা—সেদিন আর্ত্ত অসহায় মানুষের দল মুগ্ধচিত্তে সেকথা শুনিয়াছিল, শুনিয়া আত্মহারা হইয়াছিল, আত্মহারা হইয়া আত্মদান করিতে বিলম্ব করে নাই। যে আশ্বাস মূর্ত্তিমান হইয়া গৃহদ্বারে সমাগত, তাহাকে ফিরাইবে কে? সেই আশ্বাসমূর্ত্তির বোধন মন্ত্রোচ্চারিত বাংলাদেশের পূজাঙ্গনে সেদিন বড় মহোৎসব পড়িয়া গিয়াছিল।

তিনি কাহারও লৌকিক অভাব পূরণ করেন নাই, মানুষের আধিভৌতিক প্রয়োজনের এক কণাও তাঁহার দ্বারা মিটে নাই। কিন্তু মানবজীবনের পরমা শান্তি যাহা, তাহাই দান করিয়া গিয়াছেন। যে কথা বলিয়াছি—রাধার প্রেম কৃষ্ণই কেবল পাইয়াছিলেন, এই রাধাভাবিত মানুষটির প্রেম জগৎ লুটিয়া লইল।

শ্রীচৈতন্যের মধ্যে সেই যুগের এক বিপ্লবী মানবাত্মার দুর্জ্জয় আত্মঘোষণার স্বর শুনিয়াছি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার কাব্যে সেই স্বরটিকে যথোপযুক্ত বাজাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন। বিচার ও বিতর্ক, অপ্রেম ও বঞ্চনা, লোভ ও নিষ্ঠুরতা, পাণ্ডিত্য ও প্রাণহীনতায় মলিন এক যুগে দাঁড়াইয়া যিনি মানুষকে অবিকৃত সত্তায় আবিষ্কৃত করিয়া ঘন-গম্ভীর কণ্ঠে বলিতে পারেন—'চণ্ডালোহপি, দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ, হরিভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোহপি শ্বপচাধমঃ—তিনি ব্যতিক্রম মানব। অবশ্য হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ সরাইয়া সত্যকে যিনি দর্শন করিতে চান, তিনি যে মানব প্রাণসূর্য্যের উপর হইতে আচার-সংস্কারের মেঘচ্ছায়া ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। নিখিল প্রাণ-গঙ্গাকে তিনি অনন্ত কৃষ্ণ-সাগরের পানে কীর্ত্তন-কণ্ঠে আহ্বান করিয়া ছুটিয়াছিলেন—তাঁহার নিকট প্রাণবারির জাতিবিচার থাকে না। পথ চলিতে যাহার হৃদয়ে সমুদ্রের কলগান মন্দ্রিত সেই যথার্থ মানুষ—অব্রাহ্মণ হইলেও দ্বিজোত্তম-সত্যকুলজাত। সেই সেই যুগকে শ্রীচৈতন্য 'সবচেয়ে' দিয়াছেন, 'সবার অধিক' পাইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যের এই 'ভেদভুলানো', 'প্রাণজাগানো', এই 'পতিতপাবন প্রেমলাবণি' ব্যক্তিত্ব কবিরাজ গোস্বামী অতি অপূর্ব্বভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সুদীর্ঘ কাব্য হইতে—দার্শনিক আলোচনার বিস্তৃতি সত্বেও—চৈতন্য-চরিত্রের একটা উজ্জ্বল

পূর্ণায়ত রূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের অলোকসামান্য দেহরূপই প্রাকৃত-জনের প্রাণ প্রথম হরণ করিয়াছিল। নানাভাবে কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার কাব্যে সেই রূপসৌন্দর্য্য প্রতিবিম্বিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তেমন দুই একটি প্রচেষ্টা:

শত সূর্য্য সম কান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমললোচন॥

বা:

তপ্ত হেম কান্তিসম প্রকাণ্ড শরীর।
নব মেঘ জিনি কণ্ঠ ধ্বনি যে গম্ভীর॥

বা:

সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার।

এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে মাধুর্য্য অপেক্ষা পৌরুষ-বীর্য্যই অধিক। দেহে কিংবা মনে দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় নাই। এই রূপ হইতে অতঃপর জন্মে রাগ, তারপর রস:

বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্টে চায়।
করিয়া কল্মষনাশ প্রেমেতে ভাসায়॥

* * *

সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে॥

* * *

উথলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী বৃদ্ধ যুবা আদি সবারে ডুবায়॥
সুজন দুর্জ্জন আদি জড় অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের মন॥

* * *

পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী নাহি লয় মূল॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্রে কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে॥

শ্রীচৈতন্যের এই পাবনী ব্যক্তিত্ব ফুটাইতে কৃষ্ণদাসের চৈতন্যজীবনীর অংশ-নির্ব্বাচন বড়ই উপযোগী হইয়াছে। তিনি—যে কারণেই হউক—মধ্য ও অন্ত্যলীলা বিস্তৃতভাবে

বর্ণনা করিয়াছেন। আর এই মধ্যলীলা এবং কিয়দংশে অন্ত্যলীলার মধ্যেই মহাপ্রভুর মানবপ্রেমী চরিত্র সর্ব্বাধিক প্রকাশিত। এইখানেই কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণপ্রেম এবং সেইসঙ্গে মানবসাধারণের প্রতি অখণ্ড করুণায় হৃদয় ভরিয়া শ্রীচৈতন্য ভারতের দিগ্বিদিকে ছুটিয়া ফিরিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই প্রেমনদীর গতিপথটি তীর্থযাত্রীর সম্ভ্রম শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি – তদুপরি নির্ম্মল কবিদৃষ্টি সহায়ে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। অনুচিত ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য কেমন করিয়া সামাজিক বাধাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেন তাহার অজস্র দৃষ্টান্ত তাঁহার কাব্যে মিলিবে। তিনি বলিতেছেন :

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো।
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।

—আমি কেবল শ্রীকৃষ্ণের 'পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ'। বৃন্দাবনের পথে সমাজ-পরিত্যক্ত "সনোড়িয়া" ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণে তিনি দ্বিধা করেন নাই। এমনই ছিল তাঁহার অহেতুক প্রীতি, দক্ষিণাপথে কুষ্ঠরোগীকে আলিঙ্গন করিতেছেন, নীলাচলে পুনঃপুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও সনাতনের ক্ষত-রস-সিক্ত দেহ বুকে চাপিয়া ধরিয়া উল্লসিত হইতেছেন।

কেবল দীনদুঃখী নয়, যাহারা সমাজের শীর্ষে, যাহারা জ্ঞানী গুণী 'পণ্ডিত', তাহাদের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের রূপান্তর সাধনেও শ্রীচৈতন্য সহায়তা করিয়াছেন। কখনো তিনি পাণ্ডিত্যের দ্বারা পাণ্ডিত্যকে বিধ্বস্ত করিয়া প্রাণের জয়ঘোষণা করিয়াছেন, কখনো বিষয়াবর্ত্তের ভিতর হইতে মুমুক্ষু আত্মাকে সবলে ছিন্ন করিয়া উর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছেন। সার্ব্বভৌম প্রকাশানন্দ তাঁহার মনীষাদীপ্তিতে বিপর্য্যস্ত; রামানন্দ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ তাঁহার সর্ব্বগ্রাসী আকর্ষণে বিষয়-বিরাগী। সেই যুগে এক মহানায়কের ভূমিকা ছিল তাঁহার। সনাতন রথচক্রে পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে চাহিয়াছিলেন—রোগক্ষত দেহ আর সহিতেছিল না। তখন –

প্রভু কহে, "তোমার দেহ তোমার নিজ মন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে ॥
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন ॥

মহানায়কের কণ্ঠস্বর বটে। সমস্ত জীবের আনুগত্য স্বীকার করিবার প্রাণময় শক্তি তাঁহার আছে।

এই প্রচণ্ডশক্তির আর একটি স্ফুলিঙ্গ কৃষ্ণদাসের কাব্যে আছে। দক্ষিণাপথে মহাপ্রভুর ভ্রমণ-সঙ্গী বিপ্রটির নারীলোভ ঘটিয়াছিল। তত্রত্য রোষক্ষিপ্ত জনগণের প্রতিরোধের মধ্য হইতে মহাপ্রভু "কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিল গমন"।

এই মানুষটি প্রেম দিয়াছে সত্য, কিন্তু ইঁহার চরিত্র কোনদিন তরল ছিল না। যে সূর্য্য আলো দেয় সে দহনও করে, যে মেঘ স্নিগ্ধ করে বজ্র নামিয়া আসে তাহার ভিতর হইতে। দুরবগাহ চরিত্রের সম্মুখে বিস্ময়াহত প্রাচীন কবিকণ্ঠের উচ্ছ্বাস-ভাষ সত্যকে বিন্দুমাত্র অতিক্রম করে নাই। লোকোত্তর চরিত্র 'বজ্রাদপি কঠোরাণি' অথচ 'মৃদূনি কুসুমাদপি'। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর প্রেম-বিগলিত লাবণ্য-কোমল চরিত্রের অন্তরালে সমুন্নত মহত্ত্বকে নিরীক্ষণ করিয়া ভাষা খুঁজিয়া পান নাই, অর্দ্ধচেতন ভাবে বহুশ্রুত ঐ পঙ্‌ক্তিটির পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন—"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।" সার্ব্বভৌমের সহিত প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভু দিবারাত্রি যাপন করিয়াছেন। বিচ্ছেদের সময় আসিল। শ্রীচৈতন্য সুদূর দুর্গম দাক্ষিণাত্যে মাত্র একজন সঙ্গীসহ যাত্রা করিবেন। অনুনয়, আকুলতা, আর্ত্তনাদ—অভিসারী আত্মার যাত্রাপথে পশ্চাতের কোন বন্ধনই সত্য নয়:

এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন।
মূর্চ্ছিত হইয়া তাহা পড়িল সার্ব্বভৌম॥
তাঁরে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন।
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত মন॥
মহানুভবের স্বভাব এই মত হয়।
পুষ্পসম কোমল কঠিন বজ্রময়॥

যেখানে তিনি গিয়াছেন, মানুষ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে; ছাড়িয়া যাইবেন—ঝঞ্ঝাছিন্ন তরুর মত পথোপরি লুটাইয়া পথ আটকাইতে চাহিয়াছে।

কাজীদলন শ্রীচৈতন্যের তেজৈশ্বর্য্যের অপূর্ব্ব এক দৃষ্টান্ত। সেদিন তিনি ভয় করেন নাই; ভীতির সমারোহ সাজাইয়া যাহারা শ্মশান জাগিতেছিল, তাহারা শ্মশানেশ্বরকে চিনিত না। ছোট হরিদাসের প্রতি চরম শাস্তি প্রদান তাঁহার চরিত্র-কাঠিন্যের আর একটি প্রমাণ। "বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ"—রুদ্র চৈতন্য তাহাকে ক্ষমা করিবে না। সেদিন সমগ্র নীলাচল তাঁহার নিকট করুণ অনুরোধ জানাইয়াছিল, তাঁহারই ভাব-আস্বাদনের সঙ্গী, তাঁহারই দ্বিতীয় স্বরূপ স্বরূপ দামোদর কাতর অনুনয়ে ভাঙিয়া পড়িয়াও ছোট হরিদাসের জন্য বিন্দুমাত্র অনুকম্পা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই—সে জীবন দিয়া আপন দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গেল। কৃষ্ণের প্রিয় যাঁহারা

—ভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন,—তাঁহারা "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ," তথাপি একই সঙ্গে "নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখক্ষমী"। কী ভয়ঙ্কর তাঁহাদের আত্মার নির্জ্জনতা—"শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ।" "ছলচ্ছল টলট্টল কলকল তরঙ্গাকে" শীর্ষে দেখিয়া নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত, অনুত্তরঙ্গ সাগরের তুল্য, জলস্তম্ভিত মেঘের ন্যায় যোগীশ্বরের চরিত্রের ধারণা কে করিবে? মুদিত দুই নয়নোর্দ্ধে তৃতীয় নয়নের অগ্নিজ্বালা 'অসংযত চাপল্যকে ভস্মসাৎ করিয়া পুনরায় আনন্দিত করুণায় স্নিগ্ধ হইয়া আসিলেই সাধারণ প্রাণীর দল ভয়-চকিত বন্দনার উৎসার উপরের দিকে ঠেলিয়া দেয়।

এহেন মানুষের বৈরাগ্যের কঠিনোজ্জ্বল রূপ আমরা কল্পনা করিতে পারি, অথবা তাহা পারি না। কবিরাজ গোস্বামী ঐ রূপ কাব্যে ফুটাইতে চাহিয়াছেন। সমগ্র নবদ্বীপের অশ্রু-শ্বসিত আর্ত্তধ্বনির মধ্যে যিনি নিজ চাঁচর কেশগুচ্ছ মুণ্ডন করিয়া পথে বাহির হইয়াছিলেন, তিনি পরবর্ত্তীকালে সংযম ও নিষ্ঠার কঠিন তারে বাঁধা বৈরাগ্যময় জীবনে বিন্দুমাত্র শিথিলতা আনেন নাই,—এমন কি অর্দ্ধবাহ্য দশাতেও,—তাহাতে আশ্চর্য্য কিছু নাই। প্রকৃতি বিষয়ে তাঁহার অতিশয় সাবধানতা ছিল। সনাতনকে রমণী-সঙ্গ ও রমণী-সঙ্গীর সঙ্গ ত্যাগে উপদেশ দিয়াছেন। আহার্য্য বস্তুর সম্বন্ধে বিশেষ বাঁধাবাঁধি না রাখিলেও রঘুনাথদাসের পথকুড়ানো গলিত কদন্নই তাঁহার প্রিয়বোধ হইয়াছে। যে সনাতন ধনমান, এমনকি রাজসম্মান ত্যাগ করিয়া ভিখারী সাজিয়াছেন, তাঁহার শেষ বিলাসস্মৃতি একটি ভোটকম্বল—অঙ্গ হইতে ঐটি না ছাড়াইলে ত্যাগ যে সম্পূর্ণ হয় না। জগদানন্দের সহিত গাঢ় প্রীতির সম্পর্ক। সে প্রভুর বিরহ-কৃশ অঙ্গরক্ষার জন্য তুলার বালিশ তৈয়ারী করিয়াছিল। তাহার জন্য ধিক্কারের অবধি নাই—"জগদানন্দ চাহে মোরে বিষয় ভুঞ্জাইতে"। এই জগদানন্দকেই ক্ষোভে দুঃখে মহাপ্রভুর জন্য রক্ষিত সুগন্ধি তৈলের হাঁড়ি উঠানে আছড়াইয়া ফেলিতে হইয়াছে। প্রতাপরুদ্র রাজা হইলে কি হয়, পরম ধার্ম্মিক, চৈতন্যের একান্ত ভক্ত। অথচ প্রথম দিকে তাহার সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য বিস্ময়কর কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। জগন্নাথের রথাগ্রে ভাবাবস্থায় পতনোন্মুখ দেহকে প্রতাপরুদ্র ধারণ করাতে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন :

রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার।
ছি ছি বিষয়িস্পর্শ হইল আমার॥

এমন কঠোর সন্ন্যাসী যিনি, যিনি স্ত্রীদর্শনকে "বিষের ভক্ষণ" মনে করিতেন, তাঁহার কি বিপরীত মনোভাব রায় রামানন্দ সম্পর্কে। রামানন্দ রায় নির্জ্জনে সুন্দরী

কিশোরী দুই সেবাদাসীকে নৃত্যগীত শিক্ষা দেন, তাহাদের বেশবাসে সাজাইয়া দেন,—তাহাতে মহাপ্রভুর আপত্তি নাই বরং অদ্ভুত সম্ভ্রমবোধ :

আমি ত সন্ন্যাসী আপনা বিরক্ত করি মানি।
দর্শন দূরে প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥
তবহিঁ বিকার পায় মোর তনু মন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন জন॥

অথচ রামানন্দের :

নির্ব্বিকার দেহমন কাষ্ঠ পাষাণ সম।
আশ্চর্য্য তরুণীস্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥

যিনি অন্তরতম তিনি অন্তরগত হইয়া বিচার করেন ; শক্তিমান শ্রদ্ধাস্পদ ও মহতের প্রতি তাঁহার অটুট বিশ্বাস থাকে।

এই শ্রদ্ধা এবং নম্রতা বিনয়ের রূপ ধরিয়া শ্রীচৈতন্যের মহামহিম ব্যক্তিত্বকে অধিকতর রমণীয় করিয়াছে। জীবনের প্রথম চব্বিশটি বৎসর যাহা কিছু ঔদ্ধত্য অবিনয়ের দিন গিয়াছে, মস্তকমুণ্ডনের সঙ্গে সঙ্গে সে সকলই ত্যাগ করিলেন। সার্ব্বভৌমকে শিক্ষা দিবেন, অথচ তাঁহার সহিত কিরূপ নম্রমধুর কথাবার্ত্তা ; কাশীর প্রকাশানন্দের সঙ্গেও তাই। রামানন্দের সহিত প্রথম মিলনের পূর্ব্বে তাঁহার সুবিনীত কৃতজ্ঞ মূর্ত্তিটি ভুলিবার নয়। তাঁহাকে ঈশ্বর বলিলে বিরক্ত হইতেন ; সার্ব্বভৌমের স্তুতিবাদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই ; তাঁহার পাদোদকের জন্য জনৈক ব্রাহ্মণের অতিরিক্ত উৎসাহ বিরূপ সম্বর্দ্ধনায় প্রশমিত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যের নামে পরবর্ত্তীকালে এক সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম জাগিয়া ওঠে। ইঁহাদের সাম্প্রদায়িকতা অনেক পরিমাণে নিন্দিত হইয়াছে। পরিবেশ বিচারে ঐ সাম্প্রদায়িক আত্মরক্ষাবুদ্ধি অপরিহার্য্য কি না, সে প্রশ্ন বর্ত্তমানে তুলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু একথা সত্য যে, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যিনি কেন্দ্র-পুরুষ, তাঁহার অলোক-আলোক চরিত্র সর্ব্বপ্রকার ভেদবিভেদের উর্দ্ধে। তিনি নিজে কোনোদিন সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেন নাই। সনাতন গোস্বামীর প্রতি তাঁহার দৃঢ় নির্দ্দেশ ছিল—"অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে"। নিন্দা তো দূরের কথা শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে বাহির হইয়া সর্ব্বশ্রেণীর দেবদেবীর প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বহুবার তিনি শিবদর্শন করিয়াছেন,—শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মীনারায়ণ, নৃসিংহ, শ্বেতবরাহ ইত্যাদি ভগবানের নানা অবতারের সম্মুখে প্রণতি জানাইয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার সম্প্রদায়-উর্দ্ধতার চরম প্রমাণ—

"শিয়ালী ভৈরবী দেবী করিল দর্শন"

এবং :

"সিংহারি মঠ আইলা শঙ্করাচার্য্য স্থানে"।

এইজন্যই শ্রীচৈতন্যকে মানুষ ভালবাসিয়াছে—তাঁহার ঐ সংযম ঐ বিনয় ঐ অসাম্প্রদায়িকতা—ইহার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জাগে নাই, তাঁহার বিকচ-পবিত্র চরিত্রটি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের আসনে অবিচল ছিল। তিনি সমাজকে একস্থানে আঘাত করিয়াছেন বটে, সে কিন্তু বিকারের ক্ষেত্রে। মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা-ব্রতে তাঁহার সেই আঘাত,—লোকরক্ষার দণ্ডাঘাত, সমাজের প্রাপ্য ছিল। তথাপি বিনাশ তাঁহার সাধন নয়। যিনি স্বয়ং-পূর্ণ তিনি পূর্ণ করিয়াই যান। পূর্ণতার মূর্ত্তি গড়িতে কিছুটা ভাঙচুর প্রয়োজন হয়। সেটুকু স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। নচেৎ সমাজধর্ম্মের কী গভীর সম্মান ও অপরিসীম মূল্য শ্রীচৈতন্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ লোকমতের মধ্যেও সত্য থাকে, কারণ বিদ্যালব্ধ না হোক পূর্ব্বাগত ন্যায়-অন্যায় ধারণা সংস্কারের মত মানবমনকে আশ্রয় করে এবং সেই বহুর সম্মিলিত বুদ্ধি একটা সামাজিক প্রজ্ঞার রূপ ধারণ করে। ঐ সামাজিক প্রজ্ঞা এক যুগের দান নয়, অতএব যুগবিশেষের উচ্ছৃঙ্খলতায় তাহার মর্য্যাদানাশও অনুচিত। ইতিপূর্ব্বে আমরা প্রতাপরুদ্রের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের সমাজ-সম্মানের পরিচয় পাইয়াছি। সন্ন্যাস-জীবনের মর্য্যাদাকে তিনি সকল সময় রক্ষা করিয়া চলিতেন। এমনকি লোকনিন্দা সম্পর্কেও তাঁহার যথেষ্ট সাবধানতা ছিল। অনেক সময়েই বৈরাগ্য-পালনে তিনি যে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা লোকমতের মুখ চাহিয়া। বৃন্দাবন-যাত্রায় শিষ্য-সঙ্গকে পরিহার করিয়াছেন, তাহাও লোকমতের বিবেচনায়; কারণ "লোকে দেখি কহিবে মোরে এই এক ঢঙ"। ছিদ্রান্বেষী রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুস্থানে সর্ব্বত্রগামী পিঁপড়া দেখিয়াও নিন্দা রটাইল—"সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্ন ভক্ষণ"। সর্ব্বৈব মিথ্যা—তথাপি মহাপ্রভু বেশ কিছুদিন অর্দ্ধাশনে কাটাইলেন। তিনি মিথ্যার সম্মান করিলেন না, সত্যকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া স্থাপন করিলেন। এমন করিয়া লোকমতের সম্মান করিয়াছেন বলিয়া 'লোকও' তাঁহার মান দিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের জীবনের এই লৌকিক দিকটি সাধারণ মানুষের মনকে টানেই টানে। মহিমার অত্যুন্নতির ক্ষেত্রে প্রাকৃত জন বিস্মিত হয় কিন্তু এই দেহপ্রাণের সীমায় তাহাকে ধরিতে পারি না বলিয়া তাহার সহিত ব্যবধান থাকিয়া যায়। মানুষকে যাঁহারা আলোকলোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন, তাঁহারা কেবল বিশ্ববিপুল নন, নীড়-শান্তও। মানুষের দেহরূপ যখন, তখন মানুষের ছোটখাট সুখদুঃখ, বিচার-বিবেক,

রাগ-অনুরাগের প্রতি মমত্ব না থাকিলে চলে কেমন করিয়া? চৈতন্য-জীবনের এই মধুর লৌকিক দিকটিও কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্যে রূপ ধরিয়াছে। চৈতন্যের মুখনিঃসৃত উপদেশগুলি কত সহজ সরল, 'দুর্দান্ত পাণ্ডিত্য' হইতে কতদূর! শিক্ষা শ্লোকাষ্টকে একেবারে প্রাণছোঁয়া সরলতা। সন্ন্যাসী তিনি, তবু আজীবন জননীর প্রতি সন্তানের প্রণতি জানাইয়াছেন। বৈরাগ্যের অহঙ্কারে, পূর্ব্ব-সম্পর্কচ্ছেদের অভিমানে মাতৃহৃদয়ে ব্যথা দেন নাই। কতদিন হইল গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন— ফিরিয়া মাতার সহিত সাক্ষাৎ হইল—"শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হৈয়া"। বারবার বলিতেছেন, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব, তুমি যদি ঘরে থাকিতে বল, তাহাও স্বীকার। চরিতামৃতের বহু স্থানে মাতার জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠার পরিচয় আছে। বহুদূরে থাকিয়া শচীমায়ের শাল্যন্ন ব্যঞ্জন শাক মোচাঘণ্ট পটল নিম্বপাত— সর্ব্বজড়িত 'স্নেহ বিহ্বল' ছলোছলো করুণাটুকু স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়াছেন। এমনকি মায়ের বুকে আঘাত করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য একটা যেন আত্মগ্লানির ভাব তাঁহার মধ্যে জাগরূক ছিল:

তাঁর সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে কৈল আমি নিজ ধর্ম্মনাশ॥
তাঁর প্রেম বশ আমি, তাঁর সেবা ধর্ম্ম।
তাঁহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম॥ ইত্যাদি।

মাতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য প্রতিবৎসর জগদানন্দকে নীলাচল হইতে নবদ্বীপ পাঠাইতেন।

শ্রীচৈতন্যের একান্ত লৌকিক জীবনের যে অংশটি চিত্রিত করা কৃষ্ণদাসের কাব্যের উপজীব্য নয়, সেই সন্ন্যাসপূর্ব্ব জীবনেই বিদ্যা-উদ্ধত, চপল-চঞ্চল, প্রাণোত্তেজিত যুবকটির চরিত্রে ঘরোয়া রূপ সর্ব্বাধিক পরিস্ফুট। কবিরাজ গোস্বামী ঐ রূপ আঁকিতে না চাহিলেও দু'একটি সংক্ষিপ্ত রেখায় জীবনপ্রান্তটুকু আলোকিত করিয়া তুলিয়াছেন। যেমন ধরা যাক লক্ষ্মীদেবীর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের পরিচয় ও প্রণয়। দু'একটি মাত্র অর্থপূর্ণ উক্তি:

একদিন বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী নাম।
দেবতা পূজিতে আইলা করি গঙ্গাস্নান॥
তারে দেখি প্রভুর সাভিলাষ মন।······
দোঁহা দেখি দোঁহার চিত্তে হইল উল্লাস॥ ইত্যাদি।

সাধারণ মানুষের আন্তরিক তৃপ্তি আছে এই শ্রেণীর বর্ণনায়।

কেবল আদিলীলা নয়, কবিরাজ গোস্বামী, তাঁহার নিজস্ব ক্ষেত্রে অর্থাৎ মধ্য-ও

অন্ত্যলীলার অনেকাংশে এই সহৃদয় স্বচ্ছন্দ মানবতার সুরটি ফুটাইতে পারিয়াছেন। শিষ্যবর্গসহ মন্দির-মার্জ্জনের এক অতি অপূর্ব্ব চিত্র আছে চৈতন্য চরিতামৃতে।

শ্রীচৈতন্য জীবনকে অনুভূতি ও উপলব্ধির পথে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবন হইতে সহজের সুরটি মুছিয়া ফেলিবার প্রয়োজন হয় নাই। জগদানন্দের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল বিচিত্র। মহাপ্রভুর উপর জগদানন্দের অধিকারবোধ, অভিমান, বাম্যতা নানা ঘটনায় প্রকাশিত করিয়া চরিতামৃতকার উভয়ের সম্পর্কের সহিত কৃষ্ণ--সত্যভামার সম্পর্কের তুলনা দিয়াছেন। ভক্ত-সঙ্গে আহার্য্য-গ্রহণেও শ্রীচৈতন্যের প্রচুর আনন্দ ছিল।

তাঁহাদের সহিত মহাপ্রভুর জলক্রীড়ার অনেকগুলি বর্ণনা চরিতামৃতে আছে। জলক্রীড়া নহে, জল-রণ সুরু হইল। লড়াইটা জমিল তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের গাম্ভীর্য্য আর গভীরতার যশ সুবিদিত: যথা, অদ্বৈত-নিত্যানন্দ, বিদ্যানিধি-স্বরূপ, শ্রীবাস-গদাধর, সার্ব্বভৌম-রামানন্দ; এবং সর্ব্বোপরি সকৌতুকে বৃদ্ধদের এই বালকোচিত জলযুদ্ধ উপভোগ করিতেছেন নটশেখর রসিকোত্তম কৃষ্ণ-চৈতন্য।

মানুষ চৈতন্যকে এমন করিয়া চরিতামৃতকার আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের ভাবদেহে এইগুলিই রক্তমাংস এবং সর্ব্বজড়িত লাবণ্য। ইহা না থাকিলে দার্শনিক বা ভক্তের নিকট যাহাই হউক, সাধারণ জনগণের নিকট চৈতন্য-চরিত্রের কোন আবেদন থাকিত না। চরিতামৃতকারকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই, স্থানে স্থানে শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক চরিত্রের উপর এমন লৌকিক মাধুর্য্যের ছায়া বিস্তার করিয়াছেন যে, মুহূর্ত্তে মন আনন্দরসে ভিজিয়া যায়। নদীয়া হইতে ভক্তগণ আসিয়াছে, তাঁহাদের অগাধ প্রীতির পরিচয়ে শ্রীচৈতন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, যে মধুর স্নিগ্ধ কৃতজ্ঞতাটুকু জানাইতেছেন তাহার তুলনা আছে না কি?—নিত্যানন্দকে আসিতে কতবার বারণ করিয়াছি, তবু ছুটিয়া আসে, কি বলিব। বৃদ্ধ, পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য্য গোঁসাই এই বয়সেও স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া দুর্গম বিপদসঙ্কুল পথে বাহির হইয়াছেন আমার জন্যই, তাঁহার প্রেমঋণ শুধি কেমন করিয়া? আমি সন্ন্যাসী, আমার ধন নাই, সম্পদ নাই, আমি কাহারো জন্য কোথাও যাই না, তোমরাই ছুটিয়া আস—আমার অপরাধের কি শেষ আছে?

এমন মানুষকে মানুষ ভালবাসিবে না?

শ্রেয় এবং প্রেয় লইয়া মানুষের জীবন। বৈষ্ণব বলেন, মানুষ হইতেছে তটস্থ—সমুদ্রেও নয়, ডাঙাতেও নয়, তটে। সমুদ্র এবং প্রান্তরের মাঝামাঝি তাহার জীবন। যদি সমুদ্র হয় শ্রেয়, প্রান্তর তবে প্রেয়,—মানুষের জীবনে উভয়ের অঙ্গীকার আছে। এক অর্থে সে বদ্ধ, অন্য অর্থে সে মুক্ত। শুধু বৈষ্ণবদর্শনে কেন, সর্ব্বশ্রেণীর মানবদর্শনে

এই দ্বৈতত্ব স্বীকৃত। সৃষ্টিকর্ত্তা যখন মনুষ্যসৃজনে ব্যাপৃত ছিলেন তখন তিনি বাছিয়া বাছিয়া পাঁচটি ভূত গ্রহণ করিলেন—সেই পঞ্চভূত-সমবায়ে মানবদেহ। ক্ষিতি তাহাকে পৃথিবীর সহিত যুক্ত করে, ব্যোম তাহার আকাশ-গোত্রতা আনিয়া দেয়। মাঝের ভূতগুলি করে শূন্য-পূরণ।

এই শ্রেয় এবং প্রেয়ের 'আসমান জমিন ফারাকের' মধ্যে এমন মানুষ আসিয়া দাঁড়ান যাহার পা মাটিতে ছুঁইয়া থাকে বটে, কিন্তু মাথা ঠেকে আকাশে। মানব-জীবনের দিগন্তে দাঁড়াইয়া আকাশপ্রান্তরের মিলনে তিনি মধ্যস্থতা করিয়া যান।

শ্রীচৈতন্য তেমন একজন মানুষ; তাঁহার আকাশছোঁয়া ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিগত আচার আচরণের ক্ষেত্রে ঐ শ্রেয় এবং প্রেয়—বাণী ও জীবনের চরম সামঞ্জস্য আনিয়া দিয়াছে।

তিনি বলিয়াছেন সর্ব্বাল্প, তিনি করিয়াছেন সর্ব্বাধিক। তিনি বাণীমূর্ত্তি অথবা মূর্ত্তিময় বাণী। তাঁহার জীবনটি যেন বিধাতা-রচিত একখানি কাব্য, অথবা এমন বলা যায়, বিধাতা-কাব্যের তিনি একটি ছন্দোময় ভাষ্য।

চৈতন্য-জীবনকে যদি ভাষ্য বলি, তবে বলিতে হয়, এটি অতি স্বল্পাক্ষর ভাষ্য—অতি গূঢ়ার্থপূর্ণ। বিধাতার সৃষ্টির উপর মানুষের অহংবুদ্ধি যে স্বকল্পিত বিস্তৃতির দায় চাপাইয়া দেয় এবং যে বাগ্‌বিস্তৃতি স্বতোবিরোধ অনিবার্য্য করিয়া তোলে, শ্রীচৈতন্য তাহা সযত্নে পরিহার করিয়াছিলেন। তিনি কোনদিন উপদেশের আড়ম্বর করেন নাই, 'আমার জীবনই আমার বাণী' বলিয়া আত্মঘোষণার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। বাণীতে আত্মঘোষণা আর আচারে জীবন-ঘোষণার মধ্যে পার্থক্য আছে। শ্রীচৈতন্য শেষ পথই বাছিয়া লইয়াছিলেন। প্রাকৃতজন বাণী হইতে জীবন, কথা হইতে কাজ, আস্ফালন হইতে আচরণ, শাস্ত্র হইতে সাধনে বিশ্বাস করে বেশী। 'আপনি আচরি ধর্ম্ম' চৈতন্য সেই বিশ্বাসের উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য বলিতেন, বেশী কিছু নয়, কলিতে হরিনাম নাও, তাহাতে মুক্তি—হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। আর বলিতেন, গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিবে, গ্রাম্যকথা না কহিবে; তৃণ হইতে সুনীচ হইবে, তরু হইতে সহিষ্ণু হইবে, অপরকে মানদান করিয়া নিজে মানত্যাগ করিবে। তিনি কেবলই প্রার্থনা করিতেন:

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্‌ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

এবং:

নয়নং গলদশ্রু ধারয়া বদনং গদ্‌গদ রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥

শ্রীচৈতন্যের জীবনের সহিত যাঁহার বিন্দুমাত্র পরিচয় আছে, তিনি বলিবেন, ঐ উপদেশ, ঐ অবস্থা কত সত্য ছিল তাঁহার জীবনে। হরিনাম নাস্ত্য—একথা মহাপ্রভু বলিয়াছেন; কীর্ত্তনোন্মত্ত মহাপ্রভুর পদভারে টলমল নবদ্বীপ নীলাচলের 'টলমল' মানুষগুলির সব কথা কি মিথ্যা? আশ্চর্য্য নয়, উৎকল কবি তাঁহাকে "হরিনামমূর্ত্তি" আখ্যা দিবেন। গ্রাম্যকথা আর গ্রাম্যবার্ত্তা তাঁহার মুখে কেহ শুনিয়াছে এত বড় কলঙ্ক অতি বড় বিদ্বিষ্টও ছিটাইতে পারিবে না। বাঙালীর জীবন-সঙ্গীতকে গ্রাম্য গণ্ডী হইতে মুক্ত করিয়া কোন উচ্চগ্রামে তুলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, আজিকার দিনে তাহা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারি।

তৃণাদপি বিনয়—সাধন পথে এমন অত্যাবশ্যক বস্তু আর নাই। আত্মবিচারণা না থাকিলে আত্মোপলব্ধি ঘটে না। ঐ আত্মানুসন্ধান অনিবার্য্যভাবে নিজ ত্রুটি বিচ্যুতি, স্খলন পতন উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। সাধন-পথিক মানুষ—সহস্র অপূর্ণতার বোঝা বহন করিয়া আত্মগর্ব্ব করিতে পারে? বিনয়ী না হইয়া তাহার উপায় আছে? সন্ন্যাস-জীবনে শ্রীচৈতন্য বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। দৃঢ়কণ্ঠে অবতারত্ব অস্বীকৃতির কথা ছাড়িয়া দিই, পাণ্ডিত্যকেও তিনি বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তথাপি বিচারে যখন নামিতে হইয়াছে, তিনি আপন বিজয় সর্ব্বদিক দিয়া সম্পূর্ণ করিতেন। জ্ঞানের অগ্নি হইয়া প্রতিপক্ষের উপরে নামিয়া মুহূর্ত্তে তিনি ভস্মসাৎ করিয়া দিতেন কিন্তু তারপরেই করুণার মেঘবর্ষণ সুরু হইত।

আর তাঁহার প্রার্থনা—ধন নয়, জন নয়, সুন্দরী নয়, সঙ্গীত নয়—জন্মে জন্মে যেন তোমার পায়ে অহৈতুকী ভক্তি থাকে; আবার হে প্রভু, কবে তোমার নাম গ্রহণ করিলেই নয়ন গলদশ্রু, বচন গদ্গদ, আর দেহ পুলককণ্টকিত হইবে সে কবে? ইহা কি প্রার্থনা, না প্রাপ্তির আনন্দ-স্তব। তিনিই সাধনা তিনিই সিদ্ধি। গম্ভীরায় দীর্ঘ দ্বাদশবৎসর ব্যাপী চৈতন্যের রাধাভাবিত দিব্যোন্মাদ অবস্থা শেষবারের মত প্রমাণ করিয়া দেয় তাঁহার বাণী যাহা, তাঁহার জীবন তাহাই।

সৃষ্টির সাধারণ নিয়মে সূচনা যেখানে সমাপ্তি সেখান হইতে অনেক দূরে। বিবর্ত্তনবাদ বা অভিব্যক্তি তত্ত্বের অর্থই এই। কিন্তু এমনও ঘটে, প্রথম যিনি, তিনিই পূর্ণ; সেই পূর্ণকে দর্শন করিয়া অপূর্ণ পূর্ণাভিসারী হয়। শ্রীচৈতন্যকে যদি প্রথম বৈষ্ণব বলি, পূর্ণ বৈষ্ণব তিনিই। নিত্যবৃন্দাবনের আলোকে তাঁহার জন্ম, তাঁহার বিকাশ। সেই বৃন্দাবন হইতে নির্বাসিত মানবাত্মা গিরি-নদী-অরণ্য-পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ক্রমাগত অভিসার করিয়া ঐ বৃন্দাবনের দিকেই ছুটিয়া চলিয়াছে; সেখানে পূর্ণতম বৈষ্ণব শ্রীচৈতন্য অতন্দ্র করুণায় জাগিয়া আছেন।

নির্ঘণ্ট